



একমাত্র পরিবেশক :

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

পত্রিকা হাউস

কলিকাতা-৩

গোল মার্কেট

নিউ দিল্লী-১



প্রথম প্রকাশ

বৈশাখ ১৩৬৪

প্রকাশিকা

শ্রীমতী সীতা গুপ্তা

গুপ্ত প্রকাশনী

৫৩ বি, বলদিয়া পাড়া রোড

কলিকাতা-৬

●

প্রচ্ছদ পট

শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য্য

●

মুদ্রাকর

শ্রীঅমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোলাপ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১২, হরীতকী বাগান লেন

কলিকাতা-৬

●

বাঁধাইয়াছেন :

ন্যাশনাল কমার্শিয়াল সিণ্ডিকেট

●

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা

বেবা. বাপ্পা, রুবি ও বাসনাকে

'বাঁধ' প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে
প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশকাল :
বৈশাখ ১৩৫৭ হইতে চৈত্র ১৩৫৭

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস :

স্রোত ও আবর্ত্ত

প্রবাহ

বেহাগ

লাল সন্ধ্যা (যন্ত্রস্থ)

গল্প গ্রন্থ :

ফুল ডোরে

পরিচিতি : জীবানন্দ পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার। প্রতুল তাঁহার বাল্যবন্ধু। মঞ্জুষা জীবানন্দের কনিষ্ঠা কন্যা আর মৃন্ময় প্রতুলের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যকাল হইতেই উহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া ছিল। মৃন্ময় কলিকাতায় থাকিয়া এম-এ পড়িতে ছিল। সে কৃতী ছাত্র। পরীক্ষান্তে উভয়ের বিবাহ হইবার কথা ছিল, কিন্তু মৃন্ময়ের সহপাঠী সুনির্ম্মলের বিশ্বাসঘাতকতায় সে ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যায়। তাহার স্কন্ধে এক মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া সুনির্ম্মল সরিয়া পড়িল। মৃন্ময় কোন কিছু অনুমান করিতে না পারিয়াই উঁহাদের ফাঁদে সহজে ধরা দেয়। নিতান্ত মানবতার খাতিরেই লিলিকে সে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া যায়। এই মেয়েটিকে সুনির্ম্মল আইনসম্মত ভাবে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতেই তাহার নেশা কাটিয়া গেল এবং ভগ্নীর সহায়তায় মৃন্ময়কে অপরাধী প্রতিপন্ন করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিল। মৃন্ময় এত খবর জানিত না, কাজেই দ্বিধাহীন চিত্তে সে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সুযোগ-সন্ধানী সুনির্ম্মল সর্ব্বত্র রটাইয়া দিল যে মৃন্ময়ের সহিত লিলি গৃহত্যাগ করিয়াছে। লিলি তখন অন্তঃসত্বা। লিলি কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ জানাইল না। মনুষ্য-সমাজের উপরেই তার কেমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল। খবরটা পল্লবিত হইয়া মঞ্জুষা, তার বাবা এবং প্রতুলের কানেও পৌছাইল। মৃন্ময়কে সকলেই ভুল বুঝিল। ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মঞ্জুষার মাতার মৃত্যু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিল—জীবানন্দ মেয়ের হাত ধরিয়া গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও তিনি এতদিন মৃন্ময়ের মুখ চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার সে আশা ধূলিসাৎ হইতে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কিন্তু মঞ্জুষা যথাসম্ভব ধৈর্য্যের সহিত পিতাকে সঙ্গে করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

লিলির অনুরোধে মৃন্ময় তাহাকে এক পাহাড়িয়া অঞ্চলে লইয়া গেল। সেখানকার ষ্টেটের স্কুলে সে শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া আসিয়াছে। ওখানকার রাজা ও তাঁর পুত্র মহীপাল তাহাদের অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

ইঁহাদের কাছে মৃণ্ময় নিজেকে লিলির ভাই বলিয়া পরিচয় দিল এবং সম্ভ স্বামী হারাইয়া লিলি স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের পথ বাছিয়া লইয়াছে এই কথাটাই প্রচার করিয়া দিল।

দিনকয়েক পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। কেহই তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদরের সহিত স্থান দিল না—এমন কি তাহার মা বাবাও নয়। মা শুধু চোখের জল ফেলেন—বাবা কাজের অছিলায় অন্যত্র প্রস্থান করেন। মৃন্ময় প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর পায় না। শেষ পর্য্যন্ত রাধু বোষ্টমের কাছে সকল সংবাদ অবগত হইয়া নিতান্ত অভিমানবশেই সে গ্রাম ত্যাগ করিল। যাইবার পূর্ব্বে বলিল, 'আমার' মুখে একটা কৈফিয়ৎ শুনবার জন্যও কেউ অপেক্ষা করলে না—আগাগোড়া মিথ্যাকেই তোমরা সত্য ব'লে গ্রহণ করলে!

মৃন্ময় পুনরায় লিলির কাছেই ফিরিয়া গেল।

রাধু বোষ্টম জীবানন্দের প্রজা। পরিচয় তার বোষ্টম রূপে, কিন্তু আসলে সে খাঁটি মানুষ। জাতি, ধর্ম্ম, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলেই তার আপন জন। তাদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার—বিশেষ করিয়া মঞ্জুষা ও মৃন্ময় তার বড় প্রিয়।

মৃন্ময় চলিয়া গেল। রাধু বাধা দিয়াও ফিরাইতে পারিল না, তবে কোথাও যে একটা মস্তবড় ভুল হইয়াছে ইহা সে বিশ্বাস করিল এবং কথাটা মঞ্জুষাকেও চিঠিতে জানাইল, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, সে চিঠি বহু ঠিকানা ঘুরিয়া যখন মঞ্জুষার হাতে পৌঁছিল তখন তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—শুধু কুশণ্ডিকা বাকী।

মৃন্ময়ের উপর নিছক শোধ তুলিবার জন্যই মঞ্জুষা তার বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নান্কুকে বিবাহ করিল।

নান্কু তাদেরই গ্রামের ছেলে। মৃন্ময়ের বন্ধু। এক সময় কারণে-অকারণে বহুবার তাদের গ্রামের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিত। তখন সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। তারপর একদিন শোনা গেল সে গৃহত্যাগ করিয়াছে। জীবনে নান্কু কোনদিনই বন্ধনকে স্বীকার করিত না। ছন্নছাড়া ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ওয়ালটেয়ারে আসিয়া ঠেকিল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আশ্রয় পাইল এক বিদেশীর গৃহে। লীলা রাও এবং তার দাদা তাকে ভালবাসা দিয়া, বিশ্বাস দিয়া, তার জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া দিল। এমনি ভাবেই

দিন চলিতেছিল। সহসা লীলার দাদা বিলাতে চলিয়া গেলেন, আর লীলা যোগদান করিল চিত্রজগতে। নান্টু বাধা দিয়াও তাহাকে ফিরাইতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই ভাসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভাসিতে ঠেকিল আসিয়া মঞ্জুষার দোরগোড়ায়। মঞ্জুষা তাহাকে সমাদরে তুলিয়া আনিল এবং তাহাকে সহায় করিয়া সে মৃন্ময়কে জব্দ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। কুশণ্ডিকার পূর্ব্বে রাধুর একখানি চিঠিতে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ঘটনাটি নান্টুও অবিলম্বে জানিল। মঞ্জুষাকে তীব্র ভাষায় অনুযোগ দিয়া সরাসরি এই বিবাহকে অস্বীকার করিয়া বসিল। কথাটা জীবানন্দও শুনিলেন এবং সেই হইতেই তিনি যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর স্বভাবে ঘটিল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

নান্টুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল না। কাগজে কাগজে সে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল মৃন্ময়কে উদ্দেশ করিয়া, অনুরোধ জানাইল অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

বহু বিলম্বে সেই বিজ্ঞাপনের প্রতি মৃন্ময়ের দৃষ্টি পড়িল। একটা ক্ষীণ আশা তার মনে উদয় হইল। লিলির কাছে সে বিদায় চাহিল—বিগত কয়েক বৎসর একই গৃহে বাস করিয়া উহাদের প্রতি তার রীতিমত ভালবাসা জন্মিয়াছে। বিশেষ করিয়া লিলির পুত্রের প্রতি।…

মৃন্ময় কলিকাতা চলিয়া আসিল, কিন্তু নান্টু তখন শহরের বাহিরে গিয়াছে। মৃন্ময়কে অপেক্ষা করিতে হইল। ইতিমধ্যে লিলির পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ আসিয়া তাহার কাছে পৌছিল।

নান্টু অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে ফিরিয়া আসিল। মৃন্ময়ের আগমন-সংবাদ পাইতেই সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। নান্টু আগাগোড়া সব কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, মৃন্ময়কে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করিবার অনুরোধ জানাইল এবং তার বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।



অতীত এবং বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপনের আগ্রহ লইয়াই মৃন্ময় ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখীন হইতে তার সে কল্পনা শূন্যে মিলাইয়া গেল। যে আলোর শিখা তার চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ জ্বলিয়া

উঠিয়াছিল, তাহা তেমনি আকস্মিক ভাবে নিবিয়া গিয়া মৃন্ময়ের ভবিষ্যতের পথকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

অন্ধের ন্যায় সে হাতড়াইতেছে—কোন্ পথ ধরিয়া সে এখন অগ্রসর হইবে। নাঙ্কু অস্বীকার করিলেও মৃন্ময় একথা ভুলিতে পারে না যে, মঞ্জুষা আজ নাঙ্কুর বিবাহিতা স্ত্রী। আত্মবিস্মৃত হইলে তার চলিবে না, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতেও সে নারাজ। অকারণে অনেক কুৎসিত গ্লানি তার অতীত জীবনের স্তরে স্তরে জমা হইয়া আছে। ইহাদের লৌহবেষ্টনী হইতে আজও সে মুক্ত নয়। সম্ভ্রম তার মসীকলঙ্কিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারে নাই। অন্যায় সন্দেহ এবং মিথ্যা অপরাধের বোঝা অকারণে তার মাথায় তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এদেরই মাঝে আবার সে কোন্ লজ্জায় মঞ্জুষার হাত ধরিয়া গিয়া দাঁড়াইবে—নিজেকে আরও ছোট, আরও ঢের বেশী অপমান করিতে। নাঙ্কু যত সহজে তার অসমাপ্ত কাজের ভার মৃন্ময়কে দিয়াছিল সে তত সহজে সে কাজ সম্পন্ন করিতে পারে নাই। যুক্তি-বিচারটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাই সে মঞ্জুষার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তার পরে দীর্ঘ ছয়টি মাস যে তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা একমাত্র মৃন্ময়ই জানে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অন্তরের দাবি যুক্তির চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে তার পর আর একটি মুহূর্ত্তের জন্যও সে অপেক্ষা করে নাই—ছুটিয়া আসিয়াছে।

নাড়া পাইয়া কত কথাই আজ তার মনে উদয় হইতেছে। একের পর এক—ছন্দে···সুরে। অঙ্গুলি-স্পর্শমাত্রেই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সংসার, সমাজ ও তার অনুশাসন—ইহার কোন কিছুই যেন কোন দিন তার কাজে আসিবে না। মিথ্যা বিধিনিষেধের সহস্র গ্রন্থি সে একের পর এক খুলিয়া ফেলিবে। তার পর···

অকস্মাৎ সে যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। এমনি বিহ্বলতা তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিজেকে সে চোখ রাঙাইয়া সংযত করিতে চেষ্টা করে। জীবনের এই অবেলায় আবার প্রভাতের ভৈরবী কেন!

কেন···এ কথা মৃন্ময় নিজেও জানে না, তথাপি তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে পরস্পরকে নূতন করিয়া বুঝিয়া দেখিবার জন্য। হয় তো আজও সে একেবারে নিঃশেষে ফুরাইয়া যায় নাই।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে খোলা জানালা-পথে দৃষ্টি রাখিয়া বাহিরের ঘরে

অপেক্ষা করিতেছিল, সহসা সাড়া পাইয়া সে সোজা হইয়া বসিল।

—চা কি টেবিলের উপর রেখে যাব দিদিমণি ?

মঞ্জুষা বহু পূর্ব্বেই আসিয়াছে, কিন্তু মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকায় সে তার উপস্থিতির কথা জানিতে দেয় নাই নিঃশব্দে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা ভৃত্যের প্রশ্নে তাহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ তাই রেখে যাও।

মন্থর পদে মঞ্জুষা অগ্রসর হইয়া আসিল। ভৃত্য চায়ের ট্রে টেবিলের উপর নামাইরা রাখিয়া প্রস্থান করিল। কোন প্রকার প্রশ্ন করা দূরে থাকুক, মৃন্ময় একবার মুখ তুলিয়া পর্য্যন্ত চাহিতে পারিল না। মঞ্জুষার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য বড় অদ্ভুত ধরণের একটু হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল এবং আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস মোচন করিয়া চা প্রস্তুত করিতে মন দিল। মৃন্ময় তেমনি নির্ব্বাক।

মঞ্জুষা তার দিকে এক পেয়ালা চা ঠেলিয়া দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, এ সময় তুমি কোন দিনই অন্য কিছু খেতে না তাই আর···মঞ্জুষা থামিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, সেই থেকেই অমন চুপ করে আছ কেন ? কি এত ভাবছ তুমি মিনুদা ?···

মৃন্ময় একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। বারেকের তরে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই পুনরায় নামাইয়া লইল। মঞ্জুষা এমন হইয়া গিয়াছে! এই সামান্য কয়টা বৎসরের ব্যবধানে আজ যেন তাহাকে আর চিনিবার উপায় নাই—পরিবর্ত্তনটা এতই সুস্পষ্ট। মৃন্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বুকের অতি গোপন স্থান হইতে একটা অব্যক্ত ব্যথা গুমরাইয়া উঠিতে লাগিল! কিন্তু মুখে তার একটি কথাও যোগাইল না। শুধু তেমনি নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

মঞ্জুষাকে ঠিক বোঝা গেল না। একের পর এক আঘাত আসিয়া নিজের সম্বন্ধে তাহাকে ঢের বেশী সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সহ্য করিবার এবং দুঃখকে সাহসের সঙ্গে বরণ করিবার ধৈর্য্য সে বিশেষ করিয়াই আয়ত্ত করিয়াছে। হয় তো বা সেইজন্যই তার বিন্দুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, বরং যথাসম্ভব সহজ কণ্ঠেই সে পুনরায় বলিল, আজ কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, আর সেই থেকেই তুমি চুপ করে আছ। তুমি কি মিনুদা!

···সেই কণ্ঠস্বর···তেমনি অনুযোগ দিবার শান্ত নিরীহ ভঙ্গী। বলিবার কত কথাই তো মৃন্ময়ের আছে, কিন্তু তাহার আত্মপ্রকাশের সবগুলি দরজাই

আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতীত তার কাছে মৃত, সহস্র আহ্বানেও সেখান হইতে কোন সাড়া পাইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সেই মৃত অতীতেরই একটা ছায়ারূপ। মৃন্ময়ের চোখে মুখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি সে মুখ খুলিতে পারিল না।

মঞ্জুষার মুখে পুনরায় এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল! সে বলিল, চা খাওয়া আজ কাল ছেড়ে দিয়েছ বুঝি?

এতক্ষণে মৃন্ময় কথা কহিল, ছাড়ব কেন···এই যে···বলিয়াই এক চুমুকে পেয়ালার চা শেষ করিয়া ফেলিল।

মঞ্জুষার দৃষ্টি সেই দিকেই ছিল। বলিল, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বুঝি? হবার কথাও। আর এক পেয়ালা দেব? কেৎলির চা এখনও বেশ গরম আছে।

মৃন্ময় আর একবার মঞ্জুষার মুখের পানে সহজ ভাবে তাকাইবার চেষ্টা করিল। তাকে আজ আর সঠিক বুঝিবার উপায় নাই। মুখে তাহার তপশ্চারিণীর ন্যায় প্রশান্ত উদাস অভিব্যক্তি। কোন দিক দিযা এক বিন্দ্‌ ক্ষতিও যে তাহার জীবনে ঘটিয়াছে তাহার এতটুকু বহিঃপ্রকাশ নাই। অথচ কবে, অতীতের কোন্‌ এক দিনে সে এই সময় চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাওয়া পছন্দ করিত না সে কথাটিও সযত্নে মনে করিয়া রাখিয়াছে।

মৃন্ময়ের জীবনে এই নব-পরিণতির জন্য সে নাস্কুকেই দায়ী করিল। নাস্কুর যাহা বলিবার তাহা বলিয়া, যাহা করিবার তাহা নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে; আর মৃন্ময়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল তার আজন্মের সংস্কার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ এবং তার বহুবিধ অনুশাসন। এই গুলিকে চোখ বুজিয়া এক কথায় যদি অস্বীকার করা চলিত তাহা হইলে আজ হয়ত এমন করিয়া সঙ্কোচে তাহাকে অধোবদন হইয়া থাকিতে হইত না, অন্ততঃ মুখ তুলিয়া সহজ ভাবে দুইটা কথা বলিতে পারিত। কিন্তু সেদিন কোন সহজ পথই তার চোখে পড়ে নাই, তাই নিঃশব্দে পলাইয়া গিয়া সে নিজেকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিল। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া নিজের মনের সঙ্গে চলিয়াছিল তার নিরন্তর সংগ্রাম। সে সংগ্রামের মুখে শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ভাসিয়া গিয়া ভালবাসাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে—তাই সে ছুটিয়া আসিয়াছে অথচ এমনই মজা যে সে কিছুতেই সহজ হইয়া উঠিতে পারিতেছে না।

মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, দরকার নেই বুঝি?

মৃন্ময় এতক্ষণে নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছে, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,

গরম থাকে ত আর এক পেয়ালা দাও।

মঞ্জুষা নিঃশব্দে আর এক বাটি চা আগাইয়া দিল। মৃন্ময় বারকতক চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, তোমাকে আমার গোটাকয়েক কথা বলবার ছিল।

মঞ্জুষা শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, সে আমি জানি—একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, নইলে এতদিন পরে যে তুমি নিতান্ত অকারণে আস নি এ কথা না বুঝবার মত অবোধ আজ আর আমি নেই মিনুদা।

এতক্ষণ পরে মৃন্ময় স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জুষার পানে চাহিল। মঞ্জুষা কি বলিতে চাহে এ কথাটা আজ তার জানিতেই হইবে। কিন্তু তাহার ভাবলেশহীন মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, কিন্তু তুমি কি এখনই চলে যেতে চাও? তোমার যা বলবার তা পরে বললে চলবে না?

মৃন্ময়ের কাছে সব কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। সে বলিল, কি জানি যদি শেষ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলতে না পারি।

মঞ্জুষা বলিল, তা হলে সে সব কথা না হয় নাই বললে মিনুদা। তা ছাড়া —ভৃত্যের উপস্থিতিতে মঞ্জুষা কথার মাঝখানে থামিল। সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, বড়বাবুর দুধটা কি সে লইয়া যাইবে? বেলা তিনটা বাজিয়াছে।

মঞ্জুষা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, না না তুমি যাবে কেন, আমিই যাচ্ছি।

মৃন্ময় কহিল, কাকাবাবুর শরীর খুব খারাপ শুনেছিলাম—

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কবে?···

মৃন্ময় ঈষৎ চমকিত হইল। কোন জবাব দিতে পারিল না। তার অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াই মঞ্জুষা পুনরায় বলিয়া উঠিল, কথাটা তুমি মিথ্যে শোন নি তবে এখন তিনি ভালই আছেন, কিন্তু কোন কারণেই যাতে উত্তেজিত হয়ে না ওঠেন সেদিকে ডাক্তারবাবু বিশেষ নজর রাখতে বলেছেন।

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরে হতাশা ফুটিয়া উঠিল, তা হলে আর কেমন করে দেখা করা সম্ভব হবে! সে যেন অনেকখানি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহা মঞ্জুষার দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু তখনই সে কোন জবাব দিতে পারিল না। অতি অকস্মাৎ তার অতীতের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, কত দিনের কত ছোট বড় ও বহু তুচ্ছ ঘটনার কথা। মঞ্জুষা অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিল। বলিল, দেখা করাটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয় মিনুদা, তবে একটা কথা···যদি কোন কারণে বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তা হলে তাঁর কোন

কথা গায়ে মেখ না।

মৃন্ময় তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

মঞ্জুষা কহিল, তুমি অনর্থক সঙ্কোচ বোধ করছ।

কিন্তু মৃন্ময় ভাবিতেছিল সঙ্কোচ বোধ করিবার সত্যই কি কোন কারণ নাই? যে ঘরের দরজা একদিন অকারণে তার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল আর একদিন নাঙ্কু তাহাকেই আবার নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়াছিল। মৃন্ময় সহজ মনে সে পথে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিল— এমন কি মঞ্জুষার সঙ্গে একবার দেখা করাও আবশ্যক বোধ করে নাই। তার পর দীর্ঘ ছয়টি মাস ধরিয়া সে শুধু পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কোথাও স্থিতিলাভ করিতে পারে নাই। একই চিন্তা তাহাকে অনুক্ষণ পীড়া দিয়াছে।

সত্যই ত মনের জ্বালাই যদি না মিটিল, শান্তি যদি ঘুচিয়া গেল তবে কি হইবে তার সমাজ আর পারিপার্শ্বিকের কথা চিন্তা করিয়া। আজ অকস্মাৎ নাঙ্কুর প্রতি মৃন্ময়ের হৃদয় শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া গেল। কত সহজে সে এত বড় একটা ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া গিয়াছে।

মৃন্ময়ের চিন্তায় বাধা পড়িল মঞ্জুষার আহ্বানে, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, না আমি একলাই যাব।

মৃন্ময় যন্ত্রচালিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচের নিগড় সে নিজে হাতে ভাঙিয়া ফেলিবে···

মঞ্জুষা অগ্রসর হইয়া চলিল। মৃন্ময় তাহাকে অনুসরণ করিল।

চলিতে চলিতে মঞ্জুষা কহিল, কথাটা তোমায় আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল মিনুদা।

মৃন্ময় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, কোন কারণে উত্তেজিত হলে বাবা আজকাল অত্যন্ত বাজে বকেন। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, বুঝতেই পারছ কেন আমাকে আজ একথা বলতে হচ্ছে।···

মঞ্জুষা যন্ত্রচালিতের ন্যায় কথা বলিয়া চলিয়াছে। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে একটিও বেশী নয়। আগ্রহ নাই, বিরক্তি নাই। মৃন্ময় ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেও তার ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পাইল না। তা ছাড়া যে অবস্থার মধ্য দিয়া সে চলিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাতে অধৈর্য্য হইলে যে চলিবে না এ কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি মৃন্ময়ের আছে।

ভৃত্যের হাত হইতে দুধের বাটি গ্রহণ করিয়া মঞ্জুষা আর একবার কথাটা মৃন্ময়কে স্মরণ করাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তার বাবার ঘরে প্রবেশ করিল।

জীবানন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছেন। জাগ্রত কিংবা নিদ্রিত বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্জুষা ডাকিল, তোমার দুধ খাবার যে সময় হয়েছে বাবা।

জীবানন্দ এদিকে মুখ না ফিরাইয়াই উত্তর দিলেন, জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দাও মঞ্জু। এক কথা রোজই তোমায় বলতে হয় কেন। শুধু খাও আর খাও।

মঞ্জুষার মৃদু কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় শোনা গেল, বাবা···জীবনান্দ তেমনি ভাবেই উত্তর দিলেন, সে কি আজও বেঁচে আছে মা—

মঞ্জুষা অনুযোগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, এ সব বাজে কথা বলতে তোমায় কত দিন আমি বারণ করেছি বাবা, কিন্তু এর পরও যদি তুমি আমার কথা না শোন তা হলে একটা অনর্থ বাধাব আমি।

জীবানন্দ উঠিয়া বসিলেন। মৃন্ময়ের পানে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁর মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি নীরস কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু ওকে তুমি আবার বাড়ীতে ঢুকতে দিয়েছ কেন? না, না মঞ্জু, আমি কাউকে চাই না। ওকে চলে যেতে বল! তোমার মা গেছেন, নিমু গেছে, ওকেও যেতে দাও। আমার কাউকে দরকার নেই—কাউকেই আমি চাই না। তিনি বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে দৃষ্টি কি বলিতে চাহে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মঞ্জুষা একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া জীবানন্দের সন্নিকটে আগাইয়া গেল। দুধের বাটি পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া মঞ্জুষা তার বাবার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কাকে তুমি কি বলছ বাবা। একবার ভাল করে চেয়ে দেখত।

জীবানন্দ অধিকতর নির্লিপ্তভাবে বলিলেন, আমাদের কাছে সবাই সমান মা—সবাই সমান। মায়া নেই, দয়া নেই, একেবারে নিরেট পাথর। বলিয়াই তিনি থামিলেন এবং শুধু মঞ্জুষা শুনিতে পায় এইরূপ অনুচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, দুনিয়ায় কাউকে আজ আর বিশ্বাস করি না। শুধু তুই আর আমি—আর কেউ নয়। কিন্তু তুই যেন ওদের মত আমায় ছেড়ে চলে যাস নি মা।

মঞ্জুষার চোখে জল দেখা দিল। তাহা চোখে পড়িতে জীবানন্দ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, এইজন্যেই কোন কথা তোকে বলতে পারি না মঞ্জু!

মঞ্জুষা ডাকিল, বাবা!

জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা···

মঞ্জুষা কহিল, দুধটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাবা।

জীবানন্দ বাধ্য ছেলের মত দুধের বাটিতে চুমুক দিলেন। দুধ খাওয়া হইয়া গেলে মঞ্জুষা মুখ মুছাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমাকে ফেলে আমি কি কোথাও যেতে পারি বাবা—না তা সম্ভব?

মৃন্ময় নিঃশব্দে এই দুই পিতাপুত্রীর কথোপকথন পরম আগ্রহে অথচ ব্যথিত চিত্তে শুনিতেছিল।

জীবানন্দ কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে শূন্যে দৃষ্টি মেলিয়া যেন কোন্ অদৃশ্য সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, সেই জন্যই একে একে সবাই আমার মাকে ছেড়ে চলে গেল। মিনু গেল নান্টুও গেল। নইলে তার বুড়ো অথর্ব্ব বাপের বোঝা বইবে কে! সূক্ষ্ম বিচার। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার···সহসা জীবানন্দের হাতের মুঠি শক্ত হইয়া গেল, চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, এঃ! ভারি আমার বিচারক এসেছেন। কে চেয়েছিল তোমার কাছে বিচার? একটা দুধের বাছাকে তিল তিল করে হত্যা করবার অধিকার তোমায় কে দিয়েছিল?

মঞ্জুষা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, বাবা—

জীবানন্দ যেন আত্মগত ভাবেই বলিয়া চলিলেন, কিন্তু এ আমি কোন-দিন চাইনি।

মঞ্জুষা পুনরায় ডাকিল। জীবানন্দ সাড়া দিলেন।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি কি বোঝ না বাবা যে তোমার এই সব কথায় আমি কত ব্যথা পাই।

জীবানন্দ কেমন যেন আচ্ছন্নের মত বসিয়া আছেন। তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দগুলি যেন দূরাগত ধ্বনির ন্যায় শোনা যাইতেছে। তিনি বলিতেছিলেন, বার বার আমায় তোরা বাধা দিসনে মা। যা সত্য তা আমায় বুঝতে দে, আমায় বলতে দে মঞ্জু। আমারই ভুলের জন্য তোর জীবনটাকে সব দিক দিয়ে মাটি করে দিলাম।

বারংবার একই কথার উল্লেখে মঞ্জুষা রীতিমত বিব্রত বোধ করিতেছিল অথচ কেমন করিয়া যে জীবানন্দের বাক্য-স্রোতে বাধা দিবে তাহা সে সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে সে বলিয়া বসিল, মিনুদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা করে আজ আর কোন লাভ নেই মঞ্জু, কথাটা ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

মৃন্ময় যেন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা ভিতরে বাহিরে চাঞ্চল্য বোধ করিল।

জীবানন্দ আপন খেয়ালেই বলিয়া চলিলেন, ভাগ্যবতী ছিলেন তোর মা, তাই বেশী দিন তাঁকে দুঃখের বোঝা বইতে হ'ল না। ভাল মন্দ সব কিছুর বাইরে চলে গেলেন। একটু থামিয়া একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মানুষের আশা কতই ক্ষণভঙ্গুর মঞ্জু। কত আশা, কত কল্পনা ছিল তাঁর। ছেলের বৌ আনবেন, মেয়ের বিয়ে দেবেন। নাতি নাতনীরা তাঁকে অষ্টপ্রহণ ঘিরে থাকবে···তাঁর মাথার পাকা চুল বেছে দেবে।

জীবানন্দ কেমন অদ্ভুত ভাবে হাসিতে লাগিলেন। যে হাসির সম্মুখে মৃন্ময় যেন মাটির সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। মঞ্জুষা রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কত চেষ্টা করি সে সব কথা ভুলে যেতে, কিন্তু পারছি কোথায়? সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আমায় আরও বেশী করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি এক তিল মিথ্যে বলছি না মঞ্জু। নইলে মৃন্ময় কি জানে না যে আমাদের সঙ্গে ওর আর কোন সম্বন্ধই নেই; তবুও এখানে কিসের জন্যে এসেছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ মৃন্ময় তার বাপ মায়ের খবর রাখে না, রাখবার দরকারও বোধ করে না। মায়া নেই, দয়া নেই, বিচার-বিবেচনা নেই। সব নিমকহারামের দল।

মঞ্জুষাকে অধিকতর বিব্রত মনে হইল। মৃন্ময় নীরব। সে যেন কিছুই ঠিক মত অনুধাবন করিতে পারিতেছে না।

জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, আমি কোন কথা শুনতে চাই না মঞ্জু, ওকে যেতে বলে দাও। আমার দেবার মত কিছু নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব

দেউলে।

মৃন্ময়ের মুখের চেহারা বেদনায় কালো হইয়া উঠিল। তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অতীতের শত স্মৃতি। সে দিন আর জীবনে ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু এই বিপর্য্যয়ের জন্য সে নিজে হয়ত এক বিন্দুও অপরাধী নয়। অথচ প্রতিকারের জন্য যে দিকেই সে হাত বাড়াইতেছে সেই দিক হইতেই পাইতেছে লাঞ্ছনা, অপমান।

মঞ্জুষার আহ্বানে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। মঞ্জুষা বলিতেছিল, এতটা আমি ভাবি নি, তা হলে তোমাকে ডেকে নিয়ে আসতাম না মিনুদা। তুমি বরং এখন যাও; বুঝতেই ত পারছ সব। একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে পুনরায় কহিল, অপেক্ষা করো। একটু পরেই আসছি। তুমি না গেলে বাবা শান্ত হবেন না।

মৃন্ময় নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতে মঞ্জুষা তার বাবার নিকটে আসিয়া বসিল। জীবানন্দ উত্তেজনায় হাঁপাইতে ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে তিনি এমন করিয়া চেঁচা-মেচি করিয়াছেন এই মুহূর্ত্তে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি মঞ্জুষার আনত মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মাঝে মাঝে আমার যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যায় মঞ্জু। মনে হয় আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা মা, আমায় একটা সত্য কথা বলবি?

এই আকস্মিক প্রশ্নে মঞ্জুষা মুখ তুলিয়া চাহিতেই জীবানন্দ বলিলেন, সত্যিই কি আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে? কি বলে তোদের ডাক্তার?

মঞ্জুষা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া প্রতিবাদ জানাইল। বলিল, আসলে এই সব বাজে চিন্তা করাটাই তোমার ব্যাধি বাবা।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কি জানি মঞ্জু কোন কথাটা সত্যি, কিন্তু ভাবছি কেমন করে আমার দ্বারা এটা সম্ভব হ'ল। কত দিন, কত বছর পরে মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা, আর আমি তাকে অনাদরে তাড়িয়ে দিলাম—ওকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না মঞ্জু? একবার দেখ ত মা।

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল, সেইটাই কি খুব ভাল কাজ হবে বাবা?

তা ছাড়া তুমি তো কিছু মিথ্যে বল নি।

জীবানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, সত্য কথাও সব সময় বলা উচিত নয় মঞ্জু, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মঞ্জুষা তার বাবার ব্যথিত মুখের পানে খানিক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কি ভাবিল—প্রকাশ্যে কহিল, বেশ ত বাবা না হয় আমি দেখেই আসছি মিনুদাকে পাওয়া যায় কিনা!

সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটা তীব্র অস্বস্তি এবং অবর্ণনীয় আত্মগ্লানিতে মৃন্ময়ের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। যুক্তি-বিচার দিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে গেলে আজিকার এই লাঞ্ছনাটা হয়ত সবটাই তার একলার প্রাপ্য নয়।

মঞ্জুষাকে আজ আর যেন চেনাই যায় না, এমনি ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে সে চলাফেরা করিতেছে। নিজের চতুর্দ্দিকে সে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। তার বাবা বরং স্পষ্ট, কিন্তু মঞ্জুষা বলে বর্ত্তমানে ইহা নাকি তাঁর একটা ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে।···ওজন করিয়া তিনি কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু অর্থহীন উক্তি একটিও তিনি করেন নাই।···

জীবানন্দের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মৃন্ময় পুনরায় বাহিরের ঘরে বসিল। মঞ্জুষা তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছে। যদিও সে জানে যে, এই বসিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই, তথাপি সে চলিয়া যাইতে পারিল না—মনের অস্থিরতা গোপন করিতে সে সহসা ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। যে অবস্থার সম্মুখীন আজ তাহাকে হইতে হইয়াছে, ইহার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। নিজের পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখটাই এতদিন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সে কেমন যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার চেয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকাও যেন আজ তাহার কাছে সহজ মনে হইল। তাহাতে অন্ততঃ নিজের সঙ্গে ছলনা করিতে হইত না। মৃন্ময়ের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী যেন দুলিতেছে। বাসুকীর ফণায় আর তেমন শক্তি নাই যে এই দুর্ব্বিষহ বোঝা আরও কিছুকাল অনায়াসে বহন করিতে পারে।

মৃন্ময় গবাক্ষপথে বাহিরের আকাশের পানে চাহিল। দ্বিপ্রহরের আকাশে দুই-চারিটা চিলের নিঃশব্দ আনাগোনা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাশের বাড়ীর বেতার-যন্ত্রে একের পর এক গান চলিয়াছে। কোথায় একটা ছোট ছেলে তার স্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

মৃন্ময় কান পাতিয়া শোনে—শোনে আপন জীবনের অতীত এবং বর্ত্তমানের কাহিনী—দূর হইতে ভাসিয়া আসা আনন্দ ও বেদনার প্রকাশের মধ্যে। এই ত জীবন—এই তার সত্যকার রূপ। এক দিনের মধুর কল্পনা আর এক দিনের ঘটনা-সংঘাতে এমনি করিয়াই বুঝি রূপ বদলায়। নিজের অজ্ঞাতে তার একটি নিঃশ্বাস পড়ে—সেই শব্দে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠে। এতক্ষণের তন্ময়তা এক নিমেষে টুটিয়া যায়।··· . . . .

অকস্মাৎ তার লিলির কথা মনে পড়ে। তার জীবনের বিক্ষিপ্ত ধারাকে সে সযত্নে নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল, চতুর্দ্দিক হইতে যখন একটানা ছি ছি তাহাকে পথভ্রান্ত করিয়া দিয়াছিল, তার জীবনের ধারা অনির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহারার মত ঘুরিয়া মরিতেছিল, লিলি তখন তাহাকে স্নেহে সেবায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল···

মৃন্ময়ের নীরব চিন্তায় বাধা পড়িল। মঞ্জুষা ঘরে প্রবেশ করিল কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, অনেকটা দেরী হয়ে গেল। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আর দেরীই যখন হ'ল তখন আরও একটু অপেক্ষা কর আমি তোমার চায়ের কথা বলে আসছি—কিন্তু চায়ের সঙ্গে কি খাবে? গোটাকয়েক সিঙারা আর কিছু নোন্‌তা?

মঞ্জুষার এই স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে মৃন্ময় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মৃদু আপত্তি তুলিয়া সে কহিল, এই সময়—

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে বলিল, এইটেই ত ঐ সব খাবার সময় তোমার। তুমি আমায় কি মনে কর মিনুদা? এত সহজে সব ভুলে গেছি?

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইল না। দ্রুত প্রস্থান করিল! ওর চলাফেরা কথা বলা সবই কেমন অদ্ভুত মনে হয় মৃন্ময়ের। আর এই নির্লিপ্ত অন্তরঙ্গতায় সে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মৃন্ময় ভাবিতে পারিতেছে না, অথচ একটা অতিপরিচিত সুখানুভূতি তাহার মনকে নাড়া দিয়া গেল। এই অভিভূত ভাব কাটাইয়া উঠিতে মনে হইল তার জীবনের বর্ত্তমান অধ্যায়টা

একটা স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্নটা কি সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। আবার তেমনই করিয়া তার চতুর্দ্দিক আনন্দমুখর হইয়া ওঠা কি সম্ভব নয়!

মৃন্ময় আপন মনে হাসিয়া উঠিল। এ হাসির ধরণ আলাদা। এই সব কল্পনা কল্পনামাত্র—তার বর্ত্তমান জীবনে শুধু অর্থহীন নয়, অনাবশ্যক। এই কল্পনার স্বর্গলোকে পৌছানো হয় ত আর কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না।

কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। নান্টু আসিয়া উপস্থিত হইল—মঞ্জুষার সহিত তাহার বিবাহ ঘটিল, কিন্তু সে বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে তাহা পুনরায় বানচাল হইয়া গেল। মঞ্জুষা বিব্রত বোধ করিল, নান্টু হইল বিচলিত। তথাপি নিজের পথকে সে দ্বিধাহীন চিত্তে নির্ব্বাচন করিয়া লইল। দায়, দায়িত্ব তাহারই বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়া নান্টু বিদায় লইল, কিন্তু মৃন্ময় অকুণ্ঠ চিত্তে সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারে নাই, নান্টুর পিছনে পিছনে সেও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তার পর···

হায়রে কোথায় গেল সেদিনের সেই হারানো দিনগুলি, যখন মঞ্জুষার চিন্তায় ছিল কাব্যের স্নিগ্ধমধুর ভাব, কথা ছিল কবিতার মত। আর তাহাকে লইয়াই আজ কত সমস্যা দেখা দিয়াছে, কত আত্মবিশ্লেষণের নীরব প্রয়াস।

মঞ্জুষা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। এক প্লেট গরম সিঙাড়া মৃন্ময়ের দিকে আগাইয়া দিয়া সে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। মৃন্ময় একদৃষ্টে চা তৈরি করা দেখিতে লাগিল।

চায়ের পেয়ালা মৃন্ময়ের সম্মুখে রাখিয়া মঞ্জুষা কহিল, খাও—

মঞ্জুষা যত্ন করিয়া খাওয়াইতেছে। কোন প্রকার অপচয় সে করিতে পারে না। হাত বাড়াইয়া একটা সিঙারা তুলিয়া সে মুখে পুরিল। পর মুহূর্ত্তে কি যেন মনে পড়িতেই সে হাত গুটাইয়া লইল। কোন প্রকারে সিঙারাটা গলাধঃ-করণ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার চা কই?

মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া কহিল, অতিথিকে আগে না খাইয়ে খেতে নেই যে।

অতিথি—তাই বটে! এ বাড়ীতে আজ তাহাকে অতিথির মর্য্যাদা দেওয়া হইতেছে। আর সে মর্য্যাদা দিতে অগ্রণী হইয়াছে স্বয়ং মঞ্জুষা। তার জীবনে ইহার চেয়ে আর বড় পরিহাস কি হইতে পারে! রাগ করিলে সে দিনের মত আজ আর কেহ শান্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রাণের যোগ নাই, আছে অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি সাধারণ ভদ্রতাবোধ। কিন্তু সত্যিই কি তাই! মঞ্জুষার এই কুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশের মধ্যে আর কিছুই কি নাই?

মৃন্ময় যে হাত গুটাইয়া লইয়াছে তাহা মঞ্জুষার দৃষ্টি এড়াইল না। সে বলিল, খাচ্ছ না যে? কি হ'ল তোমার? একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিল, তা ছাড়া চা খাওয়া ত আমি ছেড়েই দিয়েছি। বড্ড ভালবাসতাম কিনা।

মৃন্ময় কথা কহিল না বটে, কিন্তু দু' চোখে তার নীরব জিজ্ঞাসা। মঞ্জুষা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ঝাল, নোন্‌তাও একই কারণে ছাড়তে হয়েছে, তা বলে তুমি খাচ্ছ না কেন? তুমি ত ছেড়ে দাও নি?

মৃন্ময় কহিল, না, ছাড়তে আর পারলাম কোথায়, কিন্তু এখন আর রুচবে না। ক্ষিদে নেই।

মঞ্জুষা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তা হলে বরং না খেলে।···সে ভৃত্যকে ডাকিয়া প্লেটখানি লইয়া যাইতে বলিল।

ভৃত্য প্লেট লইয়া চলিয়া যাইতে মঞ্জুষা শান্তকণ্ঠে পুনরায় বলিল, তুমি রাগ করেছ মিনুদা, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে তুমি নিজেই বুঝবে এই রাগ করা কত নিরর্থক।

মৃন্ময় সহসা বাঁকা উত্তর দিয়া বসিল, তোমার চা-সিঙাড়া ত্যাগ করার মত?

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, নেহাত মিথ্যে বল নি, তবে কথা হচ্ছে এই যে, আমরা মেয়ের জাত, আর দিদিমা, ঠাকুরমাদের আমলের চালচলনগুলো একেবারে ভুলে যেতেও পারি নি, রক্তের মধ্যে কেমন যেন একাকার হয়ে আছে। ইচ্ছে থাকলেও সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারি না। যত গণ্ডগোল সেইখানেই।

মৃন্ময় গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, তোমাকে মিথ্যে বলছি না মিনুদা—আমাদের এই অনাবশ্যক দুর্ব্বলতা জীবনে বহু ক্ষতিই করে থাকে; আর তোমরাও সে সুযোগ বড় কম নাও না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু একই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না মিনুদা, তোমাদেরও হয়ত নূতন করে ভেবে দেখবার দিন আসছে। পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আশপাশের সবকিছুই। নইলে···মঞ্জুষা মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, নইলে তোমার সামনেই কি এমন সহজ ভাবে আজ মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতুম, না এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলা সম্ভব হ'ত!

মৃন্ময় কেমন এক অদ্ভুত কণ্ঠে ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা নির্লিপ্ত কণ্ঠে সাড়া দিল, আমাকে কিছু বলবে তুমি!

এ সুযোগ মৃন্ময় ত্যাগ করিল না। শান্ত মৃদু স্বরে বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ত আমার কোন কথাই শুনছ না।

মঞ্জুষা কহিল, সত্যিই কি তার আর কোন প্রয়োজন আছে মিনুদা!

মৃন্ময় বলিল, কি যে আছে আর কি নেই সে তর্ক তোলা বৃথা, কিন্তু একটা সত্য উপলব্ধি করেই তোমার কাছে আমায় ছুটে আসতে হয়েছে। নান্টুর অনুরোধ পালন করা ছাড়া আমার আর অন্য উপায় নেই।

মঞ্জুষার মুখের ভাব এতক্ষণে কঠিন হইয়া উঠিল, কিন্তু সহজেই সে নিজেকে সংবরণ করিল। বলিল, তোমার নান্টুদা তোমায় একটা কেন দশটা অনুরোধ করতে পারেন। সে অনুরোধ পালন করা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু এ সব কথা আমাকে শুনিয়ে ত কোন লাভ নেই মিনুদা।

মৃন্ময় বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, কিন্তু নান্টুদা যে তোমার সব ভার আমারই উপর দিয়ে গেছেন মঞ্জু।

মঞ্জুষার চোখে মুখে এক বিচিত্র হাসি খেলা করিয়া গেল। সে শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় আশ্চর্য্য করে তুললে মিনুদা। আমার ভার সে তোমাকে দিতে যাবে কিসের জন্যে—আমি ত তার ভার-বোঝা হই নি। তা ছাড়া···মঞ্জুষা থামিল।

মৃন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

মঞ্জুষা পুনরায় বলিতে লাগিল, এত বড় অধিকার তাকে কে দিয়েছিল তা আমার জানা নেই। আমার নিজের কি কোন স্বাধীন সত্তা নেই?

মৃন্ময় দ্বিধাজড়িত স্বরে বলিল, নান্টুদার সঙ্গে তোমার কি বিয়ে হয় নি!

মঞ্জুষা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল, কহিল, তা আর হ'ল কৈ। শেষ পর্য্যন্ত গোল বেধে গেল যে। বিয়েটা নেহাত কপালে নেই কি আর করি বল।

মঞ্জুষাকে মৃন্ময় ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জুষা অনুমান করিয়া লইল এবং সহসা অতিমাত্রায় গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তোমার নান্টুদা তোমাকে মিথ্যে বলেনি মিনুদা, কিন্তু আজ তুমি ফিরে এসেছ বলেই তোমার সেদিনকার চোরের মত পালিয়ে যাওয়াটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। এখন তুমিই বল ত আমি কি করি?

মৃন্ময় নীরব।

মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, সেদিনের সত্যকে আজ আর সত্য বলে ভাবতে পারছি না মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মঞ্জু।

মঞ্জুষা বলিল, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার জন্যই মৃন্ময় মুখ তুলিয়াছিল। তাহাকে থামাইয়া দিয়া মঞ্জুষা পুনশ্চ বলিল, কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। তুমি আবার ফিরে এসেছ—ভালই হয়েছে, নইলে সব কথা তোমার জানা হ'ত না। সেদিন যদি অমন করে ভয়ে পালিয়ে না যেতে তা হলে আজ হয়তো অযথা তোমাকে হয়রান হতে হ'ত না। তুমি শুধু নিজের কথাটাই বড় করে ভেবে দেখেছ, কিন্তু আমারও যে একটা মতামত আছে, অথবা থাকতে পারে সে কথাটা একেবারে ভুলে যাওয়া মোটেই সঙ্গত হয় নি।

মৃন্ময় বলিল, সব কথা না শুনে তোমারও একটা সিদ্ধান্ত করে নেওয়া উচিত হয় নি মঞ্জু।

মঞ্জুষা কহিল, অতীতের কোন বিষয় নিয়েই আমি আর ভাবতে চাই না। আমি বর্ত্তমানের সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। সেখানে আর কারুর প্রবেশাধিকার থাকবে না। ভুল অতীতে আমিও হয়তো করেছি তুমিও করেছ, কিন্তু তাই নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা করে লাভ কিছুই হবে না বরং বর্ত্তমানের প্রয়োজনকেও লঘু করে দেখা হবে।

মঞ্জুষা একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আমি এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের চিন্তায় এ কথা বলছি না। তোমার আমার পথ আজ আলাদা হয়ে গেছে—আমাদের যার যার নিজের পথ ধরেই চলতে হবে।

মঞ্জুষা থামিল। ভিতরে ভিতরে যে তার একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহা যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত সে চাপিয়া রাখিয়াছে। বাহির হইতে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। মৃন্ময়ও ভুল করিল, কিন্তু আত্মবিস্মৃত হইল না, বলিল, আমার ভুলের জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না যে, আগাগোড়াই কি আমি শুধু ভুল করে এসেছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৃন্ময় থামিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বলিল, অযথা প্রশ্ন করে তোমাকে আমি বিরক্ত করতে চাই না, কিন্তু আমার দুই-একটি কথার জবাব পাব কি?

মঞ্জুষা কষ্টে নিজের আবেগকে দমন করিল। বলিল, বলো—

নান্টুদার কোন খবর তুমি রাখ? মৃন্ময় প্রশ্ন করিল। তার ঠিকানাটা আর আমার মা বাবার খবরটাও যদি দিতে পার তা হলে বড় উপকার হয়।

এনে দিচ্ছি বসো—মঞ্জুষা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু খবরটা বহন করিয়া সে আর ফিরিয়া আসিল না। ঠিকানা লেখা কাগজ পাওয়া গেল ভৃত্যের মারফতে।

মৃন্ময় বিস্মিত হইল, আহত হইল। কিন্তু নীরবে ভৃত্যের হাত হইতে কাগজখানা গ্রহণ করিল। আরও কিছুক্ষণ নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমার দিদিমণিকে বলো আমি চলে যাচ্ছি, আর হয়ত কোন দিন তার সঙ্গে দেখা হবে না—বলিয়াই সে খোলা দ্বারপথে দ্রুত বাহিরের পানে অগ্রসর হইয়া গেল। একবার পিছন ফিরিয়াও দেখিল না। তাকাইলে দেখিত ততক্ষণে দরজার সম্মুখে মঞ্জুষাও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তার চোখ দুইটা ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু দেহটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তার এতক্ষণের গাম্ভীর্য্য বুঝি আর থাকে না—এখনি হয়ত সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল। ইহা ছাড়া অন্য কোন পথই মঞ্জুষার চোখে পড়ে নাই, কিন্তু মৃন্ময় চলিয়া যাইতেই বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, কাজটা হয়তো সে ভাল করে নাই। এমন করিয়া মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া সে এতখানি রূঢ় হইতে পারিল!

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে। আর হয়ত কোন দিন তাহার সম্মুখীন হইবে না। মঞ্জুষা শিহরিয়া উঠিল, বিস্মিত হইল আত্মবিশ্লেষণ করিতে বসিয়া। নিজেরই হাতে যেন সে তার মৃত্যুদণ্ড লিখিয়া দিল! জীবনে আজ আর যেন কোন কিছুতেই তাহার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে তাহার চতুর্দ্দিক একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। যে পথে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মৃন্ময় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে সেই দিকেই সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দু'চোখ তাহার জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু সে বিচলিত হইল না, বরং যুক্তি দিয়া সে তাহার আচরণের সমর্থন খুঁজিতে লাগিল। সংসার তাহার জন্য নয়। অদৃষ্টলিপি তাহার অন্য ইঙ্গিত করিতেছে। তাই ত মঞ্জুষার পক্ষে এতখানি রূঢ় হওয়া সম্ভব হইয়াছে। মৃন্ময় তাহার সমগ্র সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়াই এতখানি সাবধানতার

প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। নিজেকে সে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। হয়ত কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাহার ছদ্ম আবরণের ভিতর হইতে অন্তরের সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

মৃন্ময় চলিয়া গিয়াছে ভালই হইয়াছে। অন্ততঃ একটা দুর্ভাবনার হাত হইতে সে একেবারে মুক্তি পাইয়াছে। একে একে সকলেই তাহার পথ হইতে সরিয়া গেল—এবারে সে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে।

নূতন করিয়া যাত্রারম্ভের দিন আবার তাহার জীবনে দেখা দিবে—কিন্তু কোন্ পথে ? মঞ্জুষা ভাবে, ঘরে সব চেয়ে বড় বন্ধন তাহার বাবা। যিনি আজ শিশুর মতই একান্ত ভাবে তার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার ভাল মন্দ সবকিছুর দায়িত্ব-ভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে। বাহিরের জগতের সহিত মঞ্জুষার ঘনিষ্ঠ যোগ নাই অথচ ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াও আজ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্বাস রোধ হইয়া আসে। মাঝে মাঝে তাহার গ্রামে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। যদিও বর্ত্তমানের বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে গিয়া সে বিপন্ন হইতে পারে। তাহা হউক, এই বহুর কোনও একটিকে কেন্দ্র করিয়া যদি সে তাহার কর্ম্ম-শক্তিকে নিয়োজিত করিতে পারে তাহা হইলে দিন কাটানো তাহার পক্ষে আর তত বেশী ক্লান্তিপ্রদ মনে হইবে না। নতুবা নিরন্তর একই চিন্তার মারাত্মক বিষ তাহাকে অচিরাৎ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিবে।

যুক্তি বিচার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সে যাহাই করুক না কেন উহা নিতান্তই বাহিরের বস্তু, অন্তরের সহিত এক বিন্দু যোগ নাই। সেখান হইতে মৃন্ময়কে কোন দিন সে নির্ব্বাসন দিতে পারিবে না।...

নান্কুর জন্য তাহার বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই। ওর মত লোকেরা আর এক জাতের মানুষ। সুখ-দুঃখের বোধশক্তি ওদের আলাদা। নহিলে এই বিবাহের নাগপাশ হইতে এত সহজে নান্কু মুক্তি পাইত না। কিন্তু মৃন্ময় নান্কু নয়, একথাটা সে ভাল করিয়া জানে বলিয়াই দুশ্চিন্তায় মন তাহার ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সংস্কার কাটাইয়া উঠাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তাই ত মৃন্ময়ের সহিত তাহাকে এই অভিনয় করিতে হইল। ভগবান জানেন ইহাতে মঞ্জুষার অন্তরের কতটুকু সায় ছিল। তবুও তাহাকে এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ তাহার চোখে পড়ে নাই। দশ জনের কাছে মৃন্ময়কে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। এতখানি স্বার্থপর সে কেমন করিয়া হইবে। মৃন্ময় তাহার সম্বন্ধে যাহা খুশী ভাবুক, কিন্তু নিজের কাছে ত

তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না।

কিছুপূর্ব্বে সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালানো হয় নাই, জ্বালিবার প্রযোজনবোধও করে নাই। ভৃত্য দুই বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। ডাকে নাই। মঞ্জুষাও টের পায় নাই।

মঞ্জুষা ভাবিতেছিল, এত দিনের আশা-নিরাশা এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আজ পরিসমাপ্তি ঘটিল। এত দিন সে শুধু ভাবিয়াছে, কেমন করিয়া একটা সহজ সমাধানে পৌছান যায়, আর আজ ভাবিতেছে যে, এই পথেই কি সে সমাধান চাহিয়াছিল ?

পুনরায় ভৃত্য আসিয়া দেখা দিল। এবারে সে সাড়া দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। আলোটা জ্বেলে দেব দিদিমণি ?

এই আকস্মিক আহ্বানে মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। একটু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিযা মৃদুকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ দিয়ে যাও—

সুইচ টিপিয়া দিয়া ভৃত্য পুনরায় বলিল; বড়বাবু আপনার খোঁজ করছিলেন। আমি আরও দু'বার এসে ফিরে গেছি।

মঞ্জুষা মনে মনে লজ্জিত হইল, প্রকাশ্যে বলিল, তুমি ডাকনি কেন—কিন্তু বামুনদিদির আজ হ'ল কি! বাবা কি খাবেন না খাবেন একথাটাও কি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করবার তার সময় হ'ল না ? এরা দিন দিন সব হচ্ছে কি ? মঞ্জুষা অকারণে খানিক চেঁচামেচি করিল। ভৃত্য কিছু না বুঝিতে পারিয়া সরিয়া পড়িল।

বামুনদিদি আসিয়া প্রতিবাদ জানাইল। খাদ্যের ফিরিস্তি নাকি সকালেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং মঞ্জুষা নিজেই দিয়াছে।

মঞ্জুষা একটু অপ্রস্তুত হইল, বলিল, তা বলে এবেলা আর একবার জিজ্ঞেস করায় কিছু দোষ ছিল না। ভুল হতে কতক্ষণ—

মঞ্জুষা আর দাঁড়াইল না, গম্ভীর মুখে প্রস্থান করিল। বামুনদিদি বিস্মিত হইল, কিন্তু সে কথা বাড়াইল না। ভাবিল, বড়লোকের মেজাজই আলাদা। অবশ্য প্রকাশ্যে এক প্রকার অপরাধটা স্বীকার করিয়া লইল।

মঞ্জুষা নিজের এই অকারণ রূঢ়তায় মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তদুপরি বামুনদিদির এই নীরব স্বীকৃতিতে তাহা আরও চতুর্গুণ হইয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহার বাবার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জীবানন্দ আত্মস্থভাবে বসিয়াছিলেন, মঞ্জুষা কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমায় তুমি ডাকছিলে বাবা ?

এই আকস্মিক প্রশ্নে তিনি যেন সহসা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন এমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে খানিক কন্যার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কই না—

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু নিবারণ বললে যে—

জীবানন্দ বলিলেন, তা হলে বোধ হয় ডেকেছিলাম মঞ্জু, নইলে নিবারণ তোমা···কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন, মিনু বুঝি এল না মঞ্জু ? নিবারণ বলছিল সে নীচের ঘরে আছে···

মঞ্জুষা কোন জবাব দিল না।

জীবানন্দ পুনরায় বলিলেন, আমি জানি ও আসবে না।···ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছি ত। তা ছাড়া মিনুর উপর খানিকটা অবিচারও আমি করেছি···

মঞ্জুষা প্রতিবাদ জানাইল, তুমি ত কিছু অন্যায় কথা বল নি বাবা—

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, অন্যায় বৈকি মা, কিন্তু তা বলে সে যে আমায় এমন করে অগ্রাহ্যি করে চলে যাবে এ আমি ভাবতে পারি নি···

মঞ্জুষা গম্ভীর হইয়া উঠিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল, মিনুদা হয়তো কখনই তোমায় অগ্রাহ্যি করে চলে যেতে পারত না বাবা, কিন্তু আমিও যে তাকে ভবিষ্যতে আর এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি।

জীবানন্দ বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, মিনুকে এ বাড়ীতে আসতে তুমিও নিষেধ করে দিয়েছ মঞ্জু ! কিন্তু তুমি কেন একাজ করতে গেলে মা ?···

মঞ্জুষা ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, সে অনেক কথা বাবা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।

জীবানন্দ বলিলেন, সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারচি না মঞ্জু। নান্টু চলে গেছে—ও যাবার জন্যেই এসেছিল। কিন্তু মৃন্ময়—

বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, সে যাবার জন্যে আসে নি—আমি তাকে যেতে বাধ্য করেছি। সত্যিই ত···তুমি ত মিথ্যে বল নি বাবা। তাকে আর আমাদের কিসের প্রয়োজন।

কথা কয়টি স্বাভাবিক ভাবে বলিবার চেষ্টা করিলেও মঞ্জুষা তাহা পারিল না। একটা অব্যক্ত বেদনায় তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল।

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন, এ সব রাগের কথা মঞ্জু—এসব অভিমানের কথা। তিনি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তোরা সবাই মিলে যদি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিস তা হলে আমি যাই কোথা মা—

মঞ্জুষা করুণ দৃষ্টিতে তাহার বাবার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি এ সব কি বলছ বাবা—কে তোমায় এ সব কথা বলেছে ?

জীবানন্দ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সব কথাই কি বলে দিতে হয় মঞ্জু, আমি কি কিছুই বুঝি নে। কিন্তু আমায় একটা সত্যি কথা বলবি মা ?

প্রত্যুত্তরে মঞ্জুষা বলিল, আমি ত তোমায় মিথ্যে বলি না বাবা।

জীবানন্দ কহিলেন, মৃন্ময় কি আর কোন দিনই আসবে না ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মঞ্জুষা কহিল, আমার ত তাই মনে হয়। এখানে আসা তার আর উচিত নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এ নিয়ে কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বাবা।

জীবানন্দ অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চোখ চক্ চক্ করিতে লাগিল। তিনি বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, বলতে পার মঞ্জু কেন এমন হ'ল। যা কিছু হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম সবই আমার জীবনে মিথ্যে হয়ে গেল। এ কি আমার বিচারের ভুল, না এইটেই আমার অদৃষ্টলিপি—এ কথার সদুত্তর আমি আজও পেলাম না মা।

মঞ্জুষা নীরব।

জীবানন্দ সস্নেহে কন্যার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সহজেই সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, শুধু একটা কথাই তুমি বড় করে ভাবছ বাবা, নইলে মিনুদার চলে যাওয়া নিয়ে কখনই তুমি এতটা ব্যস্ত হয়ে উঠতে না। একটু ভেবে দেখলেই তুমি আমার কথা স্বীকার করে নেবে।

জীবানন্দ বলিলেন, অস্বীকার কোন কিছুকে করতে পারি না বলেই ত অশান্তি পাচ্ছি মঞ্জু। পাষাণের মত আমার বুকের উপর কি যেন চেপে আছে। একে নামিয়ে ফেলতেও পারি না, বইবার শক্তিও আজ আর আমার

নেই।

মঞ্জুষা এ সব কথার তাৎপর্য্য ভাল করিয়াই উপলব্ধি করে, কিন্তু প্রতিকারের কোন পথই তাহার জানা নাই। নিজের বুদ্ধিবিবেচনায় যাহা সে ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাই প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে, যদিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরাজয়ের গ্লানি তাহাকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। সে নিজেও সুখী হইতে পারে নাই, তার বাবার দুশ্চিন্তার একবিন্দুও লাঘব করিতে পারে নাই। উপরন্তু নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া তার চলার পথকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তবুও—

মঞ্জুষার চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এমন করে ত আর বাঁচিনে মা। হিসেব করে আর বিচার করে জীবনের এতগুলো বছর ত কাটালাম, কিন্তু তাতে কতখানি পেয়েছি, তা ত বুঝতে পারছি না, বরং দেখছি দুঃখের বোঝা দিন দিন আরও ভারী হয়ে উঠছে। আমি আর পারি নে—এবার তোরা আমায় মুক্তি দে মা।

জীবানন্দের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিকে চোখ পড়িতেই মঞ্জুষা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, এসব বাজে কথা তুমি আর কিছুতেই ভাবতে পারবে না বাবা। আমার মুখ চেয়েও তোমাকে অন্তত চুপ করে থাকতে হবে।

জীবানন্দ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তোর মুখের দিকে চাইলেই যে ভাবনাটা আরও বেশী করে দেখা দেয় মঞ্জু, নইলে আমার আর কি—কটা দিনই বা বাঁচব।...

মঞ্জুষার মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি থামিলেন। সে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। মুখের উপর তার দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থির অবিচলিত কণ্ঠে মঞ্জুষা বলিল, একথা আর কতবার বলা যায়। আসলে আমার কথা নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটাই তোমার একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ বললে কোন কথাই তুমি শুনবে না। খামোকা নিজেও কষ্ট পাও আমাকেও দুঃখ দাও। তার চেয়ে সোজা আমাকে হুকুম দিলেই ত পার, কি আমাকে করতে হবে—কি করলে তুমি নিশ্চিন্ত হবে!

মঞ্জুষা থামিল। খানিকক্ষণ জীবানন্দের মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি না। যতটুকু বাইরে থেকে তোমাদের চোখে পড়ে সেইটুকু কি আমার সব। কোন

একজন পুরুষের স্ত্রী হয়ে সংসার করা হ'ল না বলেই কি আমার সব কিছু ব্যর্থ হয়ে গেছে ?

মঞ্জুষা তার বাবার শয্যার একাংশে বসিল, তাঁহার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, এ চিন্তা তোমাকে ত্যাগ করতে হবে বাবা। যা একেবারে মিথ্যা…

জীবানন্দ কথার মাঝখানে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কথাটা তোমার ঠিক বলা হ'ল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। জীবানন্দ বলিলেন, তোমার কথায় তুমি নিজেই জড়িয়ে পড়েছ। আমিও বলি তুমি সত্য কথা বলেছ। যেটুকু বাইরে থেকে বোঝা অথবা শোনা যায় সেইটুকুই সব একথা ভাবতে পারলে ত কোন গোল থাকে না। একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মঞ্জুষা এ কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। হয়ত জবাব দিবার কিছু নাই বলিয়াই। সে শুধু তার বাবার হাতখানি লইয়া নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, এবং নিজের বর্ত্তমান অবস্থাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। তার জীবনের গতি আজ একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় মানুষ বেশী দিন থাকিতে পারে না। থাকা সম্ভবও নয়।

জীবানন্দ পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন, যে কথাটা তুমি আমাকে বোঝাতে চাও তাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু মন বলে, সব মিথ্যে। সেই জন্যেই আমি কোন কিছু বিশ্বাস করতে পারছি না মা। তা ছাড়া আমাকে ত তোমার কোন কথা খুলে বল না মঞ্জু।

মঞ্জুষা তথাপি নিরুত্তর, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। জীবানন্দ থামিতে পারিলেন না—বলিয়া চলিলেন, এবারে আর ভাবব না ঠিক করেছি। এতে কারুরই কোন লাভ হচ্ছে না। যার জন্যে ভাবছি তারও না, আমার নিজেরও না।

পিতার কথায় মঞ্জুষা কিছু আশ্বস্ত হইলেও পুরাপুরি আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, কথাটা যে এর আগে আমি ভাবি নি তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার সব গোলমাল হয়ে যায় মঞ্জু। দিনরাত শুয়ে থেকে থেকে মাথার ভেতরটা যেন দুশ্চিন্তার কারখানা হয়ে গেছে। ধীর স্থিরভাবে

ভাল কোন কিছু চিন্তা করতেও যেন ভুলে গেছি।

মঞ্জুষা সহসা মুখ খুলিল, নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল, দিন কয়েকের জন্য দেশের বাড়ীতে যাবে বাবা?

এই আকস্মিক প্রশ্নে জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি বললে তুমি মা? দেশে যাব?...তিনি চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন, যেতে পারলে ত বেঁচে যেতাম মঞ্জু। কিন্তু তা কি কোন দিন আর সম্ভব হবে?

মঞ্জুষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, কেন সম্ভব হবে না বাবা!

জীবানন্দ বলিলেন, বাধা ত বর্ত্তমানে শুধু একটাই নয় মঞ্জু। যার জন্যে এক দিন বাধ্য হয়ে গ্রাম ছেড়েছিলাম সে কারণ ছাড়াও অবস্থা আজ আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের দিক থেকেও—দেশের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের জন্যও। এর কোনটিকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মা।

মঞ্জুষা জবাব দিল, দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে যদি তুমি পিছিয়ে যাও সে আলাদা কথা, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত কোন কিছু নিয়ে তোমাকে একতিল চিন্তা করতে হবে না। তোমার মঞ্জু সব অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে চলতে শিখেছে। কিন্তু আমি বলি—এসব কথা এখন থাক। পরে বরং ধীরে সুস্থে ভেবে দেখা যাবে। আপাতত দেখে আসছি তোমার খাবার তৈরি হয়েছে কিনা—রাত নিতান্ত কম হয় নি।

মঞ্জুষা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে তার বাবাকে যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করুক না কেন নিজের মনকে আজ আর কিছুতেই আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না। শরীর খারাপ এই অছিলায় সে আজ জলস্পর্শ করিল না। মৃন্ময়ের পরিত্যক্ত সিঙ্গারার প্লেটখানি এখনও খাবার ঘরে পড়িয়া আছে। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া মঞ্জুষার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মনে পড়িল বিগত দিনের নানা ছোটবড় ঘটনার কথা যাহা বর্ত্তমানে তাহার কাছে এক অমূল্য সম্পদ--সযত্নে এবং সঙ্গোপনে মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে। সুযোগ এবং সুবিধা মত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া অনুভব করে তার অস্তিত্বকে। একটা অপূর্ব্ব পুলকানুভূতিতে তার দুই চোখ বুজিয়া আসে।

নান্টুকে সে বিবাহ করিয়াছে। তার জীবনে এ এক চমৎকার প্রহসন। রাধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইবার পর বিবাহটা আনুষ্ঠানিক ভাবে

শেষ হইতে পারে নাই। নাস্কু অনুষ্ঠানটিকে সরাসরি অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার অপরাধ কি? সে বরং তাহার প্রকৃত সত্তাকে অপমৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। তার এই উদারতার কথা মঞ্জুষা আমৃত্যু অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। তার বাবার এত কথা তলাইয়া দেখা সম্ভব নয়। তাঁর চোখে পড়িয়াছে শুধু কতকগুলি অকৃতজ্ঞ মানুষের অনুদার আচরণের কুৎসিত রূপ যাহা তাঁহার প্রকৃতির একেবারে ভিত্তিমূলে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

মঞ্জুষা বাহিরের পথে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রাত বেশী হয় নাই কিন্তু ইহারই মধ্যে লোক চলাচল একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশের পানে মঞ্জুষা দৃষ্টি ফিরাইল। মাত্র একটি তারা তার চোখে পড়িল। একি তার ভবিষ্যৎ নিঃসঙ্গ জীবনের নীরব ইঙ্গিত। এমনি একাকিত্বের দুঃসহ বেদনার বোঝাই কি তাহাকে সারা জীবন বহন করিতে হইবে!

মঞ্জুষার ঠোঁটের কোণে কেমন এক-প্রকারের হাসি দেখা দিল। কত দুর্ব্বল, কত অসহায় মানুষ। নিজের উপর তার কতটুকু বিশ্বাস, কতখানি আস্থা। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে যে কাজ করিয়াছে পরক্ষণেই তাহাই আবার কাঁটা হইয়া তাহাকে বিঁধিতেছে।

পাশের ঘরে নিশ্চয় তার বাবা মন্থরগতিতে পায়চারি করিতেছেন। কিন্তু কেন? মঞ্জুষা নিজেকে প্রশ্ন করে।

লঘুপদে মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দরজা খুলিতেই এক ঝলক বাতাস তাহার দেহ জুড়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে মঞ্জুষা আসিয়া তার বাবার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কিছু চিন্তা করিল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

জীবানন্দের বিস্ময়াহত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে। কে ওখানে?

আমি—মঞ্জুষা সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

জীবানন্দ তেমনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠেই বলিলেন, তুমি মঞ্জু। বড্ড চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ মা!

একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুষা কহিল, আমিও তোমায় সেই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই এসেছিলাম। রাত জেগে একটা কাণ্ড বাধালে তখন একলা যে আমি সামলাতে পারব না বাবা।

বাপ এবং মেয়ের মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। জীবানন্দ টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি এবং দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুষা

কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

জীবানন্দ তার চলার পথের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখেও কোন কথা ফুটিল না শুধু বুক ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।



যাক, এতদিনে অন্ততঃ একটা ভাবনার হাত হইতে মৃন্ময় মুক্তি পাইয়াছে। আর তাহাকে মঞ্জুষার জন্য অনাবশ্যক চিন্তা করিতে হইবে না। শুধু নিজের ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারিলেই চলিবে। অকস্মাৎ তার মনে পড়িল মা বাবার কথা। একবার অন্ততঃ চোখের দেখা দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

গ্রামে পারতপক্ষে সে আর ফিরিতে চাহে না। তার অতীত জীবনের সহস্র মধুর স্মৃতি মঞ্জুষার কথা তাহাকে নিরন্তর স্মরণ করাইয়া দিবে। সেগুলি মানস-পট হইতে মুছিয়া ফেলিবার প্রয়োজন আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে—জাগাইয়া তুলিয়া মনকে সে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে না। অন্ততঃ সেই চেষ্টাই তাহাকে আজ হইতে করিতে হইবে।

মঞ্জুষাকে সে অনুযোগ দেয় না। দেওয়া উচিত নয়। ঘটনা-প্রবাহ তাহাদের আজ যেখানে টানিয়া আনিয়াছে তাহাতে সে হয়ত ঠিকই করিয়াছে। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সে সবকিছু দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট পথকে সে বাছিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। হয়ত একটা দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে আর দশটার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে। তাহার আহ্বানে আজ যদি মঞ্জুষা সাড়া দিত আর এক দিন হয়ত মৃন্ময়ের কাছেই সে ঢের বেশী ছোট হইয়া যাইত। দৈনন্দিন জীবনের নানা ছোটবড় ঘটনা এক একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসিত। যে সংশয় সহস্র যুক্তির কাছেও একদিন নিঃসঙ্কোচে মনের বেড়াজাল ছিন্ন করিতে পারে নাই সুযোগ পাইলেই আবার তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিত। মন আজও সংস্কারমুক্ত হইয়া উঠিতে পারিল কোথায়? তাইতো নাঙ্কু যাহা পারিয়াছে সে তাহা পারে নাই—না একেবারে ছাড়িয়া যাইতে, না পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে।

নাঙ্কু পূর্ণ বিশ্বাসে মঞ্জুষার সমস্ত ভার মৃন্ময়ের উপর ন্যস্ত করিয়া একান্ত

নির্ব্বিকার ভাবে চলিয়া গেল, আর তার কাছে একটা অসম্পূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান এত বড় হইয়া উঠিল যে তার আওতায় আর সব তুচ্ছ হইয়া গেল। মঞ্জুষাকে সে অকুণ্ঠচিত্তে আগের মত কাছে টানিয়া লইতে পারে নাই। হাসিমুখে তার একখানি হাত ধরিয়া বলিতে পারে নাই যে, সত্যের আসন বুকের মধ্যে—ভুলভ্রান্তি বাইরের জিনিষ। তাহা ছাড়া অন্যায় অথবা অবিচার যে-ই করিয়া থাকুক, না জানিয়া করিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া যাহা করিতেছে তাহা এই মুহূর্ত্তে, সুতরাং অপরাধ বা অন্যায় করিলে তাহা এখনই করিবে—পূর্ব্বে করে নাই।

ভুল মৃন্ময় করে নাই এমন কথা সে বলে না, কিন্তু তাহা আত্মবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সেইজন্যই আজ আবার নূতন করিয়া তাহাকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। এই পথের মাঝেই সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিবে। বহু মূল্যবান সময় সে নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু আর নয়। নূতন করিয়া আবার যাত্রা সুরু করিবার দিন তার আসিয়াছে। মঞ্জু তার চলার পথ হইতে সরিয়া গিয়া আরও সহস্র পথের সন্ধান দিয়াছে। সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আর তাহাকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে না।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতেছিল।...

একথা মৃন্ময় ভাল করিয়াই জানে যে, আজ যতটুকু তাহার চোখে পড়িল ঠিক ততটুকুই মঞ্জুষার সত্য এবং সমগ্র পরিচয় নয়। অন্তরালে অনেকখানি আত্মগোপন করিয়া আছে, তথাপি সে জোর করিয়া তাহার দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কোন যুক্তি দ্বারাই ইহার সমর্থন খুঁজিয়া পায় নাই। বিগত দিনের সহিত বর্ত্তমানের যে বহু প্রভেদ। তখন একটা পথই তাহার চোখের সম্মুখে ছিল আজ তাহা সহস্রে পরিণত হইয়াছে।

অকস্মাৎ মনে পড়িল নাস্কুকে। সে যাহা বলে তাহা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়—হয়ত সে খাঁটি কথাই বলিয়াছে।

নাস্কু বলে, তোদের মত নিয়ম মেনে চলা ভাল ছেলে না হয়ে জীবনে আমি ঠকি নি। কোন বাধাই আমার পথ রোধ করে দাঁড়ায় না।

মন সংস্কারমুক্ত না থাকিলে এমনি করিয়া কেহ অবাধ গতিতে সংসারের পথে চলিতে পারে না, শুধু তাহারই মত একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিরন্তর পাক খাইতে থাকে। না পারে অগ্রসর হইতে, না পারে পিছাইয়া যাইতে।

মৃন্ময়ের হাসি পাইল। মানুষ এমনিই বটে। এই নাস্কুকেই সে এক দিন

কৃপার চোখে দেখিত। অথচ জীবনের পথে আজ তারই কাছে ঘটিল কতবড় পরাজয়। ঘর আর বাহির তাহার কাছে একাকার হইয়া গেল। কোন একটা পথকে সে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিল না। আর নাঙ্কুর স্বচ্ছন্দ গতি রহিয়া গেল অব্যাহত। মাঝের কয়েকটি বৎসরকে একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়া সে গ্রহণ করিযাছে। দিনের আলোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই চোখের ধাঁধাঁ কাটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৃন্ময় সহজভাবে ঘটনাটাকে মানিয়া লইতে পারে নাই—সে চুলচেরা হিসাব করিতে বসিয়াছিল। ফলে জীবনের একটি বহুবাঞ্ছিত দুর্লভ ক্ষণকে সে হারাইয়াছে। এই অমূল্য মুহূর্ত্ত বারে বারে আসে না।

আজ ব্যথিত হইলে কি হইবে—দুঃখ করিলেই বা শুনিবে কে। মঞ্জুষা তাহাকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে, জানিয়াছে অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া। হয়ত সেইজন্যই···কিন্তু সত্যই কি সে তাই? মৃন্ময় নিজের মনকে প্রশ্ন করে, অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আর ত সে কালবিলম্ব করে নাই। ছুটিয়া আসিয়া আগ্রহভরে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু মঞ্জুষা সে হাতে হাত রাখিতে পারিল না। হয়ত সেদিনের প্রত্যাখ্যানটাই মঞ্জুর কাছে আজও বড় হইয়া তাহার মনকে বিরূপ করিয়া রাখিয়াছে।

মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে পায়ে হাঁটিয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পাগলের মত এ সে কি করিতেছে। এমনি করিয়া পায়ে হাঁটিয়া সে কতক্ষণে বাসস্থানে পৌছাইবে। সম্মুখেই একটা বাস ষ্টপের পানে চোখ পড়িল। মৃন্ময় সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। আপাতত তাহাকে হোটেলে পৌছাইতে হইবে। তারপরে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

বাস আসিয়া দাঁড়াইল। তিল ধারণের স্থান নাই—তথাপি মৃন্ময় উঠিয়া পড়িল।

আজিকার ব্যাপারে মৃন্ময় ক্ষুব্ধ হইলেও মোটামুটি শান্ত ধৈর্য্যের সহিত অবস্থাটাকে মানিয়া লইল। আহারে প্রবৃত্তি না থাকিলেও জোর করিয়া কিছু খাইল। সে তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।···

মৃন্ময়ের কাছে এতদিনে যথার্থই মঞ্জুষার মৃত্যু ঘটিয়াছে।···

নামমাত্র কিছু মুখে গুঁজিয়া মৃন্ময় ফিরিয়া আসিয়া শয্যার আশ্রয় লইল।

ভিতরটা তাহার একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। বিভিন্নমুখী চিন্তাধারায় তাহার মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্থির চিত্তে কিছু চিন্তা করিবার শক্তিও যেন তাহার ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। অবসাদগ্রস্তের ন্যায় সে চুপচাপ পড়িয়া আছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কিছুক্ষণ ঘুমাইবার নিস্ফল চেষ্টায় কাটিল—পরমুহূর্ত্তেই উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। পকেট হইতে একবার মঞ্জুষার নিজের হাতে লেখা তাহার বাবার এবং নান্কুর বর্ত্তমান ঠিকানা লেখা কাগজখানি বাহির করিয়া চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

মঞ্জুষার স্বহস্তে লিখিত সুন্দর হস্তাক্ষর আরও সুন্দর হইয়াছে। তাহার লেখা আরও বহু চিঠি আজও মৃন্ময় সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে।···

চিঠিগুলি সে ট্রাঙ্ক খুলিয়া বাহির করিল—একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিল। আপন মনে খানিক সে হাসিল। এ হাসির রূপ আলাদা। মৃন্ময়কে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে হইল না। চিঠিগুলিতে অকস্মাৎ সে আগুন ধরাইয়া দিল। নিজের হাতেই সে সব শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু আগুন জ্বলিয়া উঠিতেই তার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। চোখ দুইটা সম্মুখের অগ্নিশিখার ন্যায় এক বার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াই যেন দীপ্তিহীন হইয়া গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, যখন সবই শেষ হইয়া গিয়াছে তখন এই অনাবশ্যক মিথ্যার বোঝা বহিয়া বেড়াইবে সে কিসের জন্য। আগুন নিভিয়া গিয়াছে। পড়িয়া আছে ছাই। মৃন্ময় দুই পায়ে তাহা ঘষিতে লাগিল। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাক। কিন্তু সত্যই কি তাহা সম্ভব। এত সহজে কি সবকিছু শেষ হয়! যাহা বাহিরের বস্তু, চোখে দেখা যায় তাহাকেই না হয় মৃন্ময় ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যাহা বিজড়িত তাহার বিলুপ্তি ঘটাইবে সে কেমন করিয়া ?

মৃন্ময় পুনরায় পাদচারণ করিতে লাগিল। কিন্তু এভাবেও বেশীক্ষণ কাটান তার পক্ষে সম্ভব হইল না। সহসা সে তার বাবার কাছে চিঠি লিখিতে বসিল —কিন্তু অনেকক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়াও একটি ছত্র লেখা হইল না। সত্যই ত লিখিবার মত তার আছেই বা কি। তার চেয়ে সে বরং নান্কুকে চিঠি লিখিবে। জানিতে চাহিবে কেমন করিয়া সে দিন কাটাইতেছে।

নান্কুকে সত্যই সে চিঠি লিখিল। কোন কথাই গোপন করিল না। একের পর এক এই দীর্ঘ ছয় মাসের কাহিনী সে লিপিবদ্ধ করিল। ইহার প্রয়োজন

ছিল! মনের রুদ্ধ আবেগকে মুক্তি দিতে না পারিলে মানুষ বুঝি বাঁচিতে পারে না। চিঠির উপসংহারে মৃন্ময় সত্বর জবাব পাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের ঠিকানা জানাইতে গিয়া গোলমালে পড়িল। ভবিষ্যতে সে কোথায় থাকিবে, কি করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

মৃন্ময় পুনরায় ভাবিতে বসিল। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবে মানুষ চলিতে পারে না। চলা সম্ভবও নয়। তাহাকে বাঁচিতে হইবে। চেষ্টা করিলে সে এখানেই একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। কিন্তু সে তাহা চায় না, বরং দূরে, বহু দূরে কোথাও চলিয়া যাইতে পারিলেই তাহার পক্ষে ভাল হয়।

মনে পড়িল রাজাবাবুকে, মনে পড়িল লিলিকে। সেই ভাল। অনাত্মীয়ই আজ তার পরমাত্মীয়।

মৃন্ময় সহসা নিজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র গোছগাছ করিতে লাগিল। যেন এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। মোটের উপর এখানকার পারিপার্শ্বিকে তার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। আজিকার রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাহির হইয়া পড়িতে চায়। তার পরে দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কিছু করিলেই চলিবে।

লিলির সহিত তাহার একবার দেখা করিবার প্রয়োজন আছে। নইলে সেখানকার বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে কি ভাবিবে। লিলি তাহার পুত্রকে হারাইয়াছে। হারানোটা মর্ম্মান্তিক দুঃখজনক, কিন্তু লিলির পক্ষে ইহা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। আজ সে সবদিক দিয়াই মুক্ত। হয়ত আবার একদিন সে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে। অতীতের সাক্ষ্য দিবার জন্য কেহ আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে না।

মৃন্ময় পুনরায় নান্কুকে লেখা চিঠিখানি লইয়া বসিল। চিঠির শেষে সে নিজের ঠিকানা লিখিয়া তাহা বন্ধ করিল। আপাততঃ সে তার গন্তব্যস্থান স্থির করিয়াছে।

মৃন্ময় উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। অন্ধকার আকাশ কোন নূতন অনুভূতি তার মনে জাগাইল না। এ যেন তার একান্ত পরিচিত, আপন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

খানিকটা চাপা মিষ্ট হাসি মৃন্ময়ের কানে আসিল। সে চমকিত হইল। একটা অতিপরিচিত সুর তার মনে অণুরণিত হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের সমগ্র সত্তা আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

জীবনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির মধুর স্মৃতি হয়তো এমনি করিয়াই তার চলার পথের বাঁকে বাঁকে আসিয়া দেখা দিবে, তার মনে বেদনার সৃষ্টি করিবে। হাসিতে আজ সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এক দিন সেও কারণে-অকারণে হাসির ঝড় তুলিত। সেদিনের কথা আজ তার কাছে স্বপ্ন। শুধু স্মৃতির বেদনা বহন করিয়া আনিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে।

পুনরায় চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল—সেই সঙ্গে গুটিকয়েক কথার টুকরা। মৃন্ময়ের অসহ্য ঠেকিল। সে সশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় শয্যার আশ্রয় লইল।



লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিক মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় আর কোন দিন ফিরিয়া আসিবে না বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছিল। আজ দীর্ঘ ছয় মাস যাবৎ প্রতিদিনই লিলি তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষায় দিন গুনিয়াছে। লিলি খুশী হইয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া মৃন্ময়ের নিকট হইতে সুটকেসটি টানিয়া লইয়া গভীর কণ্ঠে বলিল, দাঁড়িয়ে আছ কেন···চল···

মৃন্ময় নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল। চলিতে চলিতে লিলি পুনরায় কহিল, তুমি তা'হলে সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত ফিরে এলে মিনু-দা!

মৃন্ময় শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার বুঝি সন্দেহ ছিল লিলি?

লিলি বলিল, সেটা কি অন্যায় মিনুদা? তা ছাড়া ভেবেছিলাম, হয়ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এত দিন পরে ফিরে গিয়ে আমাদের কথা ভুলেই গেছ!

আত্মীয়স্বজন···মৃন্ময় একটুখানি হাসিল। এ হাসির সহিত লিলির পরিচয় আছে। সে চমকাইয়া উঠিল। বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া পুনরায় নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণেই যে ঘরে মৃন্ময় পূর্ব্বে থাকিত সেইখানে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ের চোখে মুখে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ঘরখানি চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো রহিয়াছে।

লিলি কতকটা কৈফিয়ৎ দিবার ভঙ্গীতে বলিল, হাতে কাজ না থাকলে যা হয় মিনুদা। কোনকিছু নিয়ে সময় কাটাতে হবে তো? কিন্তু সেকথা এখন থাক। যতদূর মনে হচ্ছে সারাদিনে তোমার কিছু খাওয়া হয় নি। বাথরুমে জল তোলাই আছে। একটু বিশ্রাম করে স্নানটা সেরে ফেল।

আমি ততক্ষণে তোমার কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি।

মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না লিলি—

কি যে তুমি বল মিনুদা—লিলি বাধা দিয়া কহিল, আমি ব্যস্ত না হলে আর কে হবে বল দেখি।...লিলি আর অপেক্ষা করিল না, দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এমনি করিয়া ইতিপূর্ব্বেও আর একটি মেয়ে তাকে একই কথা বলিত। শুধু বলিতই না—সব দিক দিয়া তাহাকে সেবায়, যত্নে, ভালবাসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। প্রাণ ভরিয়া সে সেই সেবার মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে। কিন্তু তার পর...কোথায় গেল সে স্বপ্নমাধুর্য্য?...দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার দাপটে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সেই তুমুল ঝটিকা মৃন্ময়ের স্বপ্নসৌধকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সে উন্মুক্ত প্রান্তরে একাকী দাঁড়াইয়া। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—শুধু অন্ধের ন্যায় সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নীড়-রচনার সাধ তাহার মিটিয়াছে—আজ সে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কাঙাল।

লিলি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃন্ময়ের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, এখনও চুপ করে বসে আছ? ওঠো এবারে।

মৃন্ময় উঠিবার নামও করিল না। বলিল, তুমি ভেবেছিলে আমি আর ফিরব না—আর আমি কি ভাবছিলাম জান—মৃন্ময় সহসা থামিল। একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, আর হয়তো কোন দিন এখান থেকে যাব না। জান লিলি সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস।

লিলি বলিল, জানি মিনুদা জানি, অন্ততঃ আন্দাজ করে নিতে আমি ভুল করি নি, কিন্তু দোহাই তোমার সে ইতিহাসের কথা শোনাবার ঢের সময় তুমি পাবে। শুধু নিজের কথাটাই তুমি ভাবছ—একবার চেয়ে দেখতো আমার পানে...

মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কহিল, আমার সম্বন্ধে কোন কথা ত তোমায় বলি নি লিলি?

লিলি মৃদু কণ্ঠে বলিল, সব কথা বলার দরকার হয় না মিনু-দা। কিন্তু সে থাক, তুমি সত্যিই আর দেরি করো না। চায়ের জল এতক্ষণে ফুটেছে। লিলি পুনরায় চলিয়া গেল।

...চায়ের জল ফুটিয়াছে...এইবারে চা আসিবে। চায়ের সে ভক্ত—বহু-

দিন হইতেই। অভ্যাসটা আজও সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। মঞ্জুষা চা খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বেশী ভালবাসিত বলিয়া।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। এখনি হয়ত লিলি আসিয়া উপস্থিত হইবে, আবার হয়ত প্রশ্ন করিবে, কিন্তু তাহাকে সে এড়াইয়া যাইতেই চায়।

আজ দুই দিন পরে মৃন্ময় প্রাণ ভরিয়া স্নান করিল। শরীর ও মনের অনেক-খানি গ্লানি দূর হইয়াছে।

লিলির পুনরায় সাড়া পাওয়া গেল। সে বলিতেছিল, অত জল ঢেল না মিনুদা, সহ্য হবে না। কথাটা মৃন্ময়ের কানে পৌঁছাইল না। লিলি পুনশ্চ কহিল, তোমার চা নিয়ে এসেছি মিনু-দা।

মৃন্ময় সাড়া দিল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া সোজা গিয়া চায়ের টেবিলে বসিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই লিলি আয়োজন নিতান্ত মন্দ করে নাই। মৃন্ময় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। সোনালী চায়ের মধ্যে যেন ভাসিয়া উঠিল আর একখানি মুখ। মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। খানিকটা চা ছলকাইয়া পড়িল।

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ?...

একটু অন্যমনস্ক ভাবেই মৃন্ময় জবাব দিল, বেশী ভালবাসি বলেই ত্যাগ করতে হবে এ আবার একটা যুক্তি হ'ল নাকি !...

লিলি বলিল, এ সব তুমি কি বলছ মিনুদা ?...কি তুমি বেশী ভালবাস ? কে আবার তোমাকে ত্যাগ করতে বলেছে ?...

মৃন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে বলিল, আমাকে আবার ত্যাগ করতে বলবে কে ? আর বললেই বা শুনছে কে। কথাটা আমার নয়—

মৃন্ময় থামিল। লিলি চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে তার নীরব প্রশ্ন। মৃন্ময় পুনশ্চ বলিতে লাগিল, মঞ্জুষা চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে—সেই সঙ্গে সিঙ্গাড়াও। ওগুলো সে অত্যন্ত বেশী পছন্দ করত বলে। কি ছেলেমানুষী বলতো।...

মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমনি পাগলামি মেয়েরাই করতে পারে...

লিলি এ হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বরং তার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লিলির এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তন মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তুমি অমন চুপ করে আছ কেন লিলি।...

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া লিলি বলিল, চুপ করে না থেকে কি করি

মিন্নুদা। তা ছাড়া কথাটা ত আর তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। মেয়েদের এই পাগলামির জন্যে কি তারা কম দুঃখ পায়···কিন্তু তবুও দেখ তারা দুঃখটাকে জেনে শুনে মেনে নেয়।

লিলির কথা শুনিতে শুনিতে সে আর এক বার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল। লিলির মনে হইল সে যেন বিষ গলাধঃকরণ করিতেছে।

লিলি কিন্তু থামিতে পারিল না, সে বলিতে লাগিল, এই দুঃখের মধ্যেও মেয়েরা একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়, কিন্তু যারা জেনে শুনে আত্মপ্রবঞ্চনা করে তারা নিজেকেও ঠকায়, অপরের সম্বন্ধেও ভুল করে।···কথার মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া সে অন্য প্রসঙ্গে আসিল,—ও কি ডিম যে একেবারেই ছুঁলে না। ওটা তুলে নাও মিন্নুদা। না, না, কোন কথা তোমার আমি শুনতে চাই না।

মৃন্ময় হাসিল। বলিল, এই অসময়ে আর বেশী খেতে ইচ্ছে নেই, আবার রাত্রেও এমনি জুলুম করবে ত তুমি!

লিলি সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, তোমাকে অকারণে ব্যথা দিতে আমি চাই না মিন্নুদা। কোথাও যে নূতন করে গোল বেধেছে সে ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তা বলে নিজের উপর এক তিল অত্যাচার করতেও তোমায় আমি দেব না—কিছুতেই নয়।

লিলি থামিল, একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, একবার আমার কথাটা ভাবতো। সত্যিই কি দুঃখ করবার মত আমার কিছুই নেই? না আমাকে তোমরা পাথরে গড়া মনে করো!···সে আর দাঁড়াইল না—দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার চোখে জল দেখা দিয়াছিল।

মৃন্ময় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিল। হয়তো তার খানিকটা বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছিল, লিলি সেই কথাটাই তাহাকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়া গেল। লিলি একথা বলিতে পারে বটে। মৃন্ময় উঠিয়া গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। চোখে পড়িল লিলির ফুলের বাগান—তার পরেই ছোট একটি লন। ঐ লনে লিলির ছেলের সঙ্গে কত দিন সে খেলা করিয়াছে। ঐ বাগানে প্রত্যহ দেখা যাইত নানা জাতীয় ফুলের সমারোহ। ছেলের সহিত লিলি রোজই যাইত ঐ বাগানে—নিজের হাতে সে প্রত্যেকটি গাছের সেবা যত্ন করিত। আজ যে লিলির আর সে যত্ন নাই···বাগানের দুরবস্থা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।···

মৃন্ময় পুনরায় চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। বাকী চাটুকু এক নিঃশ্বাসে

পান করিয়া সে অনুচ্চ কণ্ঠে লিলিকে ডাক দিল, কিন্তু লিলির পরিবর্তে দেখা দিল মহীপাল। ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে অভিবাদন জানাইল। বলিল, খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। এমন করে কি ভুলে থাকতে হয়।

প্রত্যুত্তরে মৃন্ময় একটু হাসিল—কোন জবাব দিল না। মহীপাল পুনরায় বলিল, এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি? এদিকে আপনি নেই আর কতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু দিদিমণিকে সত্যিই ধন্যবাদ দিতে হয়। এত বড় আঘাতটাকে তিনি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গে সামলে নিয়েছেন। এক দিনের জন্যও ভেঙে পড়েন নি!

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভেঙে পড়বার যে উপায় ছিল না ভাই।

মহীপাল বলিল, একথা বলছেন কেন মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় বলিল, আমি মিথ্যে বলি নি।

মহীপাল অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। বলিল, আপনাকে আমরা অনেক আগেই আশা করেছিলাম। মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে কহিল, আপনাদের আশা সফল করা ছিল আমার কর্তব্য, কিন্তু নানা দুর্দ্দৈবের জন্য তা সম্ভবপর হয় নি। তবে আমার ভরসা ছিল যে, লিলি আপনাদের কাছে আছে, কিন্তু এ সব কথা এখন থাক—লিলি হয়তো শুনে ফেলতে পারে।

মহীপাল লজ্জিত হইল। বলিল, আমার এতক্ষণ এটা বোঝা উচিত ছিল। অতটা তলিয়ে আমি দেখি নি। এখন ত আছেন নিশ্চয় কিছুদিন।

মৃন্ময় জবাব দিল, সেই ইচ্ছে নিয়েই ত এসেছি।

মহীপাল উঠিয়া পড়িল। বলিল, আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না—আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

মৃন্ময় হাসিমুখে বলিল, আমার বিশ্রামের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এখন না গেলেই বরং আমি খুশী হতাম।

মহীপাল হাসিল, বলিল, আপনি অবশ্য একথা বলতে পারেন। কিন্তু জানেন কি, বাবা বলেন যে, আমি এখন সাবালক হয়েছি। সে যা হোক এখন আসি—বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু লিলির কি হইল। এতক্ষণে একবারও সে আসে নাই। মহীপাল আসিয়াছিল, এতক্ষণ বসিয়া গল্প করিয়া গেল—ইহা নিশ্চয় লিলির অজ্ঞাত নয় অথচ ভদ্রতার খাতিরেও একবার আসিয়া দেখা করিল না—ইহাতে মৃন্ময় যার পর নাই

বিস্মিত হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া পাশের ঘরে উপস্থিত হইল। লিলি খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কোন দিকে তার খেয়াল নাই। মৃন্ময় লিলির এই তন্ময়তা ভাঙ্গিতে চাহিল না। কিন্তু এ কি চেহারা হইয়াছে লিলির ঘরের। শ্রীহীন ঘরটির সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। শুধুমাত্র টেবিলটা সযত্নে সাজানো। টেবিলের উপর লিলির মৃত পুত্রের একখানি ফটো রক্ষিত। তার পাশে পঙ্কজের ব্যবহৃত দু'জোড়া জুতা, একটি ছোট ফুটবল, দুধ খাইবার কাপ—তাহাতে দুধ রাখিতেও ভুল হয় নাই। ফুলদানিতে রহিয়াছে একরাশ ফুল। টেবিলের পাশে আছে একটি পেরামবুলেটর, একটি ট্রাইসাইকেল, এমন কি পঙ্কজের খরগোসের খাঁচাটিও সেখানে স্থানলাভ করিয়াছে। মৃত পুত্রের স্মৃতির মাঝে লিলি হয়তো একেবারে ডুবিয়া আছে। তাহার নিদর্শন এই কক্ষটিতে বিদ্যমান। অথচ তার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের ব্যবহারে একথাটা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। মৃন্ময় বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল, কিন্তু মুখে তাহার একটি সান্ত্বনার বাক্য যোগাইল না। সে শুধু একদৃষ্টে লিলির নিশ্চল মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, লিলি—

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটুখানি হাসিল, বলিল, মহীপাল চলে গেল বুঝি? বড় ভাল ছেলে। রোজ দু'বেলা খোঁজ নিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি আবার উঠে এলে কেন, আমায় একবার ডাকলেই ত পারতে।

মৃন্ময় একথা বলিল না যে, ইতিপূর্ব্বে বহুবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়াই সে উঠিয়া আসিয়াছে। বরং কথাটা একপ্রকার মানিয়া লইয়াই সে বলিল, ভাবলাম যে দেখে আসি তুমি এতক্ষণ ধরে কি করছ, তাই আর ডাকি নি। তা ছাড়া একলা চুপচাপ বসে থাকতেও আর ভাল লাগছিল না।

লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমার কিন্তু বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

মৃন্ময় নীরব। লিলি তার নির্ব্বাক মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না মিনু-দা—অবশ্য এক এক সময় তোমার উপর রাগ হ'ত। আচ্ছা এর কি সত্যিই কোন মানে হয়। কেন তুমি ফিরে এলে না—কিসের জন্য এত দেরি হচ্ছে এ নিয়ে কম দুশ্চিন্তা ভোগ করিনি আমি। অথচ তুমি একটা খবর দেওয়াও আবশ্যক বোধ কর নি। তোমার এই ব্যবহার আমায় কম দুঃখ দেয় নি।

মৃন্ময় তথাপি নিরুত্তর। সব কথা ঠিক তার বোধগম্য না হইলেও একথা মৃন্ময় বুঝিল যে, যাহা লিলি প্রকাশ করিল এইখানেই তার শেষ নয়, তার মধ্যে আরও কিছু গোপন রহিয়াছে।

লিলি থামিতে পারিল না। বলিয়া চলিল, নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হ'ত। একটা-কিছুকে আপন করে আঁকড়ে ধরে রাখবার জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠত। পঙ্কজ আমায় সবদিক থেকেই রিক্ত করে গেছে। লিলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, মনটা ভেঙে-চুরে এমন হয়েছে যে, এখন তাকে না পারছি নূতন করে গড়ে তুলতে, না সম্ভব হচ্ছে পুরাতন অবস্থার মধ্যে ফিরে যাওয়া। অথচ দশজনার মত হেঁটে চলেও বেড়াচ্ছি—দরকারমত হেসে কথাও বলছি। লিলি একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

মৃন্ময় যে এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই সহসা লিলির সে খেয়াল হইল। সে একটু লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, ঐ-দেখ! পোড়া মন একটু স্বযোগ পেয়েছে কি অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করেছে। আর তুমিও তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ মিনু-দা!···

মৃন্ময় গভীর স্নেহে ডাকিল, লিলি—

লিলি সাড়া দিল, কিছু বলবে মিনু-দা?

একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃন্ময় কহিল, না—আজ থাক। চল ঘরে যাই।

লিলি পুনরায় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাবছ বুঝি লিলি দুঃখ পাবে। একটুও নয় মিনুদা···একটুও না।···

মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না, তার চোখের সম্মুখে তখন উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে পঙ্কজের ছবি। ঘরের ভিতরকার বহুবিধ স্মৃতিচিহ্ন দুঃখটাকেই নিরন্তর মনে করাইয়া দেয়। অথচ ইহাকেই গোপন করিবার জন্য তার কি প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু ইহা কি শুধুই আত্মগোপন করিবার আকাঙ্খা? মৃন্ময় একটু চিন্তিত হইল। এই শ্রেণীর মানুষকে লইয়াই বিপদ বেশী। যাহারা চিৎকার করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাদের জন্য ভাবনা হয় না, কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে দুঃখের আগুন যাহার মনে মনে ধিকিধিকি জ্বলিতে থাকে ধ্বংসের মারাত্মক আক্রণের হাত হইতে তাহাকে বাঁচান শক্ত। লিলিকে তার আজ একান্ত প্রয়োজন। তার নিজের জন্যও বটে, লিলির জন্যও বটে।···

মৃন্ময় এই মুহূর্ত্তে নিজের কথা ভুলিয়া গেল।

লিলি কিয়ৎক্ষণ মৃন্ময়ের চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া সহজ ভাবেই

জিজ্ঞাসা করিল, তুমি হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেলে কেন মিনু-দা ?···

মৃন্ময় কহিল, না, চুপ করে যাব কেন।

লিলি বলিল, তা ছাড়া আবার একে কি বলব! কতদিন পরে এসেছ, কোথায় তোমার কাছ থেকে কত গল্প শুনব, না তুমি সেই থেকেই মুখ বন্ধ করে আছ।

মৃন্ময় বলিল, কিসের গল্প আবার তুমি শুনবে ?

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বেশ যা হোক—গল্প আবার কিসের হয়! যেখানে গিয়েছিলে সেখানকার।

লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কত দিন যে আত্মীস্বজন বন্ধু-বান্ধবদের চোখে দেখি নি। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি কেন এমন হয়। যাদের কাছ থেকে চিরদিনের মত চলে এসেছি, কোন দিন কোন ছলেও আর যাদের মাঝে ফিরে যাব না তাদের জন্যও মন এমন করে কাঁদে কেন ?···একটা খবর জানবার জন্য এমন ব্যাকুলতা কেন ?

মৃন্ময় বলিল, বিদেশে অনাত্মীয়ের মধ্যে থাকতে গেলে সকলেরই এই অবস্থা হয় লিলি—

লিলি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হয়তো তাই ঠিক, তবে সকলের সঙ্গে আমাকে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে বসো না মিনুদা।···কিন্তু কি কাণ্ড দেখ ত, সন্ধ্যে হয়ে গেল অথচ ঝিয়ের এখনও দেখা নেই। অন্তত দু'ঘণ্টা হ'ল তাকে বাজারে পাঠিয়েছি।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, এ সময় আবার বাজারে কেন লিলি।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আজকের রাতটাও উপোস করে কাটাতে চাও নাকি তুমি ? না না হাসি নয় মিনুদা, আমার কাছে যে ক'টা দিন থাকবে তোমাকে নিয়ম মেনে চলতে হবে, নইলে আমি অনর্থ বাধাব—এ কথা তোমায় আগেই জানিয়ে রাখছি।

আলোচনাটা একটা সহজ পথে ফিরিয়া আসায় মৃন্ময় খুশী হইল। সে হাসিমুখে জবাব দিল, নিয়ম না মেনে চললে বরং পত্রপাঠ বিদেয় করে দিও লিলি।

লিলি হাসিল, কহিল, ঠাট্টা নয় মিনু-দা। আয়নায় নিজের মুখ দেখাও বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছ, নইলে একথা বলতে তোমার আট্‌কাত।

লিলি আর দাঁড়াইল না। দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দিন কয়েক পরে—

লিলি বলিল, তারপর মিনুদা ?

মৃন্ময় একাগ্রচিত্তে একখানি বই পড়িতেছিল। লিলির এই আকস্মিক প্রশ্নে মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, কিসের পর লিলি ?…

লিলি বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, এরই মধ্যে ভুলে গেছ !

মৃন্ময় একটু নড়িয়া-চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিল, কিন্তু আজকের এই পরিণতির জন্য আমি মঞ্জুকে একতিল অনুযোগ দিতে পারি না। নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়েই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে—এ ছাড়া আর কোন পথ তার ছিল না লিলি।

লিলি বলিল, ছিল বৈকি মিনুদা, কিন্তু বোকা মেয়েটার মিথ্যা আত্মসম্মান-জ্ঞান এবং আত্মপ্রবঞ্চনাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠল।

মৃন্ময় তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, অন্যায় ভাবে অবিচার করো না লিলি। তার সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করবার আগে আমার কথাটা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। যেদিন সব কটা দরজা আমার কাছে খোলা ছিল আমি কেন তখন সেখানে অসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারি নি। সত্যকে মেনে নিতে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা—না লিলি তোমার কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারব না। যা সত্য তা মানতেই হবে।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, ভুল তুমি কর নি, একথা কেউ বলছে না মিনুদা। কিন্তু সেই ভুলের সংশোধন আর পাঁচটা ভুল দিয়ে ত করা যায় না। এ যেন একটা প্রকাশ্য লড়াই হয়ে গেছে।

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, লড়াই সে করে নি লিলি, শুধু নিঃশব্দে আমার পথ থেকে সরে গেছে।

লিলি কহিল, ও একই কথা হ'ল মিনুদা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এতে মঞ্জু কতখানি সুখী হবে !

সেটা আমার বিচার করে দেখবার নয়। মৃন্ময় বলিল, তবে আমার মনে হয় তার এই ব্যবহার একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। অনেক দিনের অনেক চিন্তার ফল এটা। কিন্তু মঞ্জুর কথা এখন থাক লিলি। ওকে এখন আমাদের চিন্তা-ভাবনার বাইরে রাখাই উচিত।

মঞ্জুষা সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলেই মৃন্ময় সযত্নে তাহা এড়াইয়া যাইতে চায়, কিন্তু কি জানি কেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই লিলির আগ্রহ ইদানীং মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

লিলি বলিল, বাইরে রাখব বললেই ত সব সময় তা পারা যায় না মিনুদা। এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন?

মৃন্ময় বলিল, ভুলে আমি কোনকিছুই যাই নি লিলি, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যই আজ এ কথা আমাকে বলতে হচ্ছে।

লিলি কহিল, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব হলে অবশ্য কোন গোল থাকত না।

মৃন্ময় বলিল, খুব সত্য কথা। আর সেইজন্যেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে খোলা মনে প্রবেশ করতে অত ভয় পেয়েছিলাম—নিজেকে ভাল করে বুঝে দেখবার প্রয়োজনটা বড় হয়ে উঠেছিল। ভিতরের তাগিদটা মনের পরিবর্ত্তন না সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশ এই কথাটা বিচার করতে বসেছিলাম।

লিলি কহিল, কথাটা খোলাখুলি মঞ্জুকে তুমি জানালে না কেন?

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলিল, কি কারণে কোন্ কাজটা করি নি তা এখন তোমায় বোঝাতে পারব না, তবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, মন তখন আমার পরিষ্কার ছিল না। সংস্কারের বেড়াজাল থেকে সে মুক্ত ছিল না। মঞ্জু হয়ত কথাটা বুঝতে পেরেছিল—

লিলির ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, এ তোমার বাড়িয়ে বলা। মঞ্জুর কথা ভেবে আমার দুঃখও হয় রাগও হয়। মিথ্যা দম্ভকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সে এ কি করলে!

মৃন্ময়ের মুখ প্রশান্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে ধীর কণ্ঠে বলিল, তুমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছ লিলি। মঞ্জুর জন্য দুঃখ আমারও হয়, কিন্তু সে অন্য কারণে। আর দম্ভের কথা যদি বল—ওটা তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মনে প্রাণে যেটা সে বিশ্বাস করেছে কোনকিছুর প্রলোভনেই তা ত্যাগ করতে পারে নি। এতে বরং তার উপর আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেছে।

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, দুঃখের ভিতর দিয়েই সে দুঃখকে জয় করবার চেষ্টা করছে। সে সফল হোক—জয়যুক্ত হোক। আমার নিজের কথা আর আমি ভাবি না। হিসেব করে আর বিচার করে ত অনেক দিনই চলে দেখেছি, তাতে জীবনের সত্যরূপ দেখা আজও ভাগ্যে ঘটল না—এবারে না হয়

অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দেখি কোথায় সে টেনে নিয়ে যায়। দুঃখকে আর আমি ভয় করি না। সুখের অনুভূতি দুঃখের মধ্যেই একদিন জন্মলাভ করবে। একলা এর কোনটাই সত্য নয়।

লিলি বিস্ময়ভরা চোখে মৃন্ময়ের মুখের পানে এতক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সে থামিতেই লিলি বলিয়া উঠিল, এ সব তুমি কি বলছো মিনুদা—

মৃন্ময় বড় অদ্ভুত ভাবে হাসিতে লাগিল। মাথা নাড়িতে নাড়িতে জবাব দিল, স্রেফ পাগলামি লিলি, কিন্তু চটপট একটু চা খাওয়াতে পার। এখুনি একবার বেরুতে হবে।

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনে লিলি রীতিমত বিস্মিত হইল, কিন্তু মুখে কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এইমাত্র উনুন ধরান হয়েছে, চা পেতে দেরি হবে।

মৃন্ময় কহিল, তা হোক দেরি, তুমি বসো—

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল. এই যে বললে তোমাকে বেরুতে হবে।···

মৃন্ময় নির্ব্বিকার কণ্ঠে কহিল, বলেছিলাম বটে, কিন্তু বাইরের রোদের পানে চোখ পড়তেই আমাকে মন বদলাতে হয়েছে।

লিলি বুঝিল মৃন্ময় মঞ্জুষাকে লইয়া কোনপ্রকার আলোচনা করিতে চায় না, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও সে বার বার তারই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে থাকে। তাহাকে যেন কেমন নেশায় পাইয়াছে। মঞ্জুষাকে লইয়া আলোচনা করিতে করিতে সে মৃন্ময়কে লক্ষ্য করে। তার মুখের উপর যে গভীর ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায় লিলি তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া তাহা অনুভব করে। কোনকিছু সে অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে ওর শূন্য মুঠি ভরিয়া উঠে না—বরং শূন্যতাটাই আরও বড় হইয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

মৃন্ময় চলিয়া যাইতে সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তার পরিত্যক্ত ঘরের পাশ দিয়া চলিতে গেলেই একটা বিচিত্র অনুভূতি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার গতিবেগ রুদ্ধ করিত, কিন্তু পঙ্কজের পানে চোখ পড়িলেই তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা একস্থানে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইত। ফলে বাহিরের কোন কিছুই তার মনকে তেমন করিয়া দোলা দিতে পারে নাই। কিন্তু পঙ্কজের মৃত্যুর পরে সে নিজেকে নূতন-ভাবে আবিষ্কার করিল। এই আবিষ্কার তাহাকে শঙ্কিত ও চিন্তিত করিয়া তুলিল। যাহার ফলে পুত্রের স্মৃতিকে ঘিরিয়া···

মৃন্ময় পুনরায় কথা বলিয়া উঠিতে লিলির চিন্তাধারায় বাধা পড়িল। মৃন্ময়

বলিল, ভালবাসায় দ্বিধা থাকলে তা কোনদিন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না লিলি। সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হলেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। আসল কথা দোষ মঞ্জুষার নয়, আমার নিজের।

লিলি বলিল, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিনুদা। খামোকা নিজেদের এ ভাবে বিপন্ন করবার দুর্মতি তোমাদের কেন হয়? তা ছাড়া এ কথাটাও আমি বুঝে উঠতে পারছি না, কথাগুলি তুমি কাকে লক্ষ্য করে বলছ? আমার যতদূর মনে হয় তোমার নিজেকে নয়।

এই প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। তার এতক্ষণের কথাগুলি একবার মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল, কিন্তু লিলির উক্তির সমর্থনে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইল না। প্রকাশ্যে কহিল, তুমি ভুল করছ লিলি, কথাটা আমি নিজেকে লক্ষ্য করেই বলেছি। তুমি ত জান আমার অকারণ দ্বিধাই আবার নূতন করে মঞ্জুষাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি ত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে মিনু-দা। সে হাতে হাত রাখতে মঞ্জু পারলে কোথায়?…

মৃন্ময় বাধা দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, এটা ঠিক হ'ল না লিলি। তোমার শুধু একটা দিকই চোখে পড়েছে, নইলে নাঙ্কুর দেওয়া দায়িত্বকে এড়াবার জন্য আমার চোরের মত পালিয়ে যাওয়াটা তোমার চোখে পড়ত এবং হয়তো তার জন্য তুমি আমায় তিরস্কার করতে। আসলে কোন প্রকারেই আমি একটা সামঞ্জস্য করে নিতে পারি নি।

লিলি বলিল, তুমি দুঃখ পাবে জানলে আমি এসব কথা তুলতাম না মিনুদা। কিন্তু সংসারে ভুল না করে কে—তাই বলে তাকে সংশোধন করে নেওয়া চলবে না কেন! ভুলটাকে চিরদিন ভুল হয়েই বেঁচে থাকতে হবে এ একটা কথাই নয়।

মৃন্ময়ের মুখে বড় চমৎকার একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কি জানি হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

লিলি কহিল, হয়তো নয়, সেইটেই সত্য কথা।

মৃন্ময় হাসিমুখে কহিল, বেশ ত না হয় তাই হ'ল—তাতেই বা দোষ কি।

লিলি বলিল, দোষ-গুণের কথা নয়, মোট কথা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াও অন্যায় মিনুদা।

মৃন্ময় প্রত্যুত্তরে বলিল, সত্য কথাই তুমি বলেছ লিলি, কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের হিসাব ত সকলে এক পথ ধরে করে না। মঞ্জু যে পথ বেছে নিয়েছে সেটা তার বুদ্ধি-বিবেচনায় সঙ্গত মনে হয়েছে বলেই সে তাকে গ্রহণ করেছে। তার পথে সে পূর্ণ হয়ে উঠুক—আমার মতের সঙ্গে তার মতের মিল হয় নি বলে, কিংবা আমার পথকে তার নিজের পথ বলে সে গ্রহণ করে নি বলেই সে ভুল করেছে এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না।

একটা জবাব দিবার জন্যই হয়তো লিলি মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু সহসা ঝিয়ের উপস্থিতিতে সে থামিল এবং তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোমার চুলো ধরলো ?

ঝি জানাইল যে, চুলো বহুক্ষণ ধরিয়াছে এবং চায়ের জলও এতক্ষণে ফুটিতে সুরু করিয়াছে।

লিলি প্রস্থান করিল।

ঝি মৃন্ময়ের ঘর পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। হাতের সঙ্গে তাহার মুখ সমানে চলিতে থাকে। সব কথাই সে লিলিকে উপলক্ষ করিয়া বলিতেছিল। পঙ্কজের মৃত্যুর পর সে নাকি অসম্ভবরকম বাতিকগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পান হইতে চুন খসিবার উপায় ছিল না। অকারণে চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিত। চুপ করিয়া থাকিত শুধু পূজা-অর্চ্চনার এবং মৃন্ময়ের ঘরের জিনিষপত্র গোছগাছ করিবার সময়। একটা তরকারি রান্না করিতে গিয়া পঞ্চাশ বার তাহাকে হাত ধুইতে দেখা যাইত। পঞ্চ ব্যঞ্জনে ভোগ সাজাইয়া রোজই সে তার মৃত পুত্রের ফটোর কাছে ধরিয়া দিত। নিজে সে দিনান্তে কোনদিন বা একবার আহার করিত, কোনদিন একেবারে উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিত। বারণ করিলে গ্রাহ্য করিত না। শুধু হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কিন্তু মৃন্ময়ের উপস্থিতি নাকি দৈব-শক্তির মত কাজ করিয়াছে। উপসংহারে সে একথা জানাইতেও ভুলিল না যে মৃন্ময় যেন এখন কিছুদিন এখানে থাকিয়া যায়। নতুবা আবার হয়ত তেমনি···কথাটা ঝি সমাপ্ত করিতে পারিল না। লিলি এদিকেই আসিতেছে। দূর হইতে সে ঝিয়ের হাত-পা নাড়া লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল, হাত-মুখ নেড়ে এত কি বলছিলি লছমিয়া।

যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে এমনি মুখের ভাব করিয়া সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল মৃন্ময়, লছমিয়ার বুঝি গল্প করবার

কিছু থাকতে নেই ?

লিলি বলিল, থাকবে না কেন। আর সেই কথাই ওকে আমি জিজ্ঞেস করেছি মিনুদা।

মৃন্ময় হাসিয়া বলিল, কথাটা সকলের সামনে বলবার হলে তোমার সামনেই বলতো। ওটা গোপন কথা। ব্যক্তিগত।

লিলি হাসিতে লাগিল লছমিয়া এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া পড়িল।

সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে হেলিয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরি নাই। মৃন্ময় চা পান করিতেছিল। লিলি জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে কি খাবে তুমি।

মৃন্ময় পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, ওটা তুমিই ঠিক করে দিও।

লিলি বলিল, সে তো রোজই দিয়ে থাকি—

মৃন্ময় কহিল, তা হলে আর মিথ্যে জিজ্ঞেস করছ কেন! হ্যাঁ ভাল কথা, আজ আমার ফিরতে অনেক দেরি হতে পারে লিলি। আমার জন্যে অনর্থক ব'সে থেকো না। মহীপাল হয় তো এখুনি এসে পড়বে। কি এক জরুরী কাজে নাকি আমাদের হাত দিতে হবে আর তারই জন্যে একটা সলা-পরামর্শ করা দরকার তার বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে, কিন্তু এই লুকোচুরির প্রয়োজনটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

লিলি খানিকক্ষণ মৃন্ময়ের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, এখানকার অন্ন না উঠলে বাঁচি। যতদূর মনে হচ্ছে, না বোঝার কথাটা নিছক তোমার ভান মিনুদা। তুমি এদের ভেজালহীন রাজরক্তে বিষ সঞ্চার করবার চেষ্টা করছ। এটা সব দিক দিয়ে শুভ হয়ত নাও হতে পারে।

মৃন্ময় হাসিমুখে জবাব দিল, আগে থেকেই একটা মনগড়া ধারণা করে নিচ্ছ কেন লিলি? এমনও হতে পারে যে তাদের রাজরক্ত আরও অনুগ্র হয়ে উঠবে।...

লিলি কহিল, তুমি হাসালে মিনু-দা। রাজরক্ত রাজরক্তই।

মৃন্ময় কথাটা কানে তুলিল না, বলিতে লাগিল—এতদিন যে বড় বড় স্বপ্ন দেখেছি তারই ছোট্ট একটি পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করা হবে। সে চেষ্টায় মহীপাল আমায় সাহায্য করবে। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই,

আর যদি থাকেও এবং সে সর্ব্বনাশকে যদি রোধ করতে না পারি তবে একলাই তলিয়ে যাব।

লিলি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি আমায় কি ভাব বল তো মিনু-দা।

প্রশান্ত হাসিতে মৃন্ময়ের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, তুমি যা—ঠিক তাই। ভুল তোমাকে আমি কোন দিন করি নি। অন্তত ভুল করেও কোন দিন তোমায় আমি ছোট করে দেখি নি। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাস করো লিলি। কিন্তু সত্যি সত্যি আমরা ভয়ানক-কিছু করতে যাচ্ছি না। দিন দিন তুমি আমায় যে ভাবে অকর্ম্মণ্য করে তুলেছ তারই হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা সহজ উপায় খুঁজে পেয়েছি। তা ছাড়া আমাকে কিছু করতে হবে তো। একা মহীপালকে নিয়ে কিছুতেই মন ভরে উঠছে না লিলি। বলিয়াই হো হো করিয়া মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল।

লিলি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, তোমার এই হাসিই সবচেয়ে মারাত্মক মিনু-দা। তুমি গম্ভীর হয়ে থাক—দিন-রাত বই নিয়ে ডুবে থাক—এর একটা সহজ অর্থ আমি খুঁজে পাই।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল। সহাস্যে কহিল, তুমি পাগল লিলি—একেবারে পাগল।···

লিলি কিন্তু থামিতে পারিল না, সে আকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমায় তুমি এমনি করে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করো না মিনু-দা। তোমার ঐ রাজরক্ত আর আদর্শের গোড়ার কথাটা আমায় শুনতেই হবে।

মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, আমি যদি তোমায় না বলি অথবা মিথ্যে বোঝাই, তা হলে কি করবে বল দেখি? তুমি ত নিছক একটা কাল্পনিক ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছ।

লিলি বলিল, সব কথা তোমায় আমি বোঝাতে পারব না মিনু-দা, কিন্তু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, তুমি আমায় মিথ্যে বলবে না। বলিতে বলিতে লিলির চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। তাহার মুখে স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিল। লিলি বলিতে লাগিল, তোমার ভিতরকার আসল মানুষটিকে আমি দেখেছি। আমার এই দেখায় কোনও ভুল হয় নি মিনু-দা।

মৃন্ময় এতক্ষণে জবাব দিল, এ তোমার অতিশয়োক্তি, কিন্তু তোষামোদে দেবতাও তুষ্ট হয় আমি ত নিতান্ত সামান্য মানুষ।

লিলি বলিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে?

মৃন্ময় বলিল, তুমি রেহাই দিলে সত্যিই আমার কিছু বলবার নেই। ঠাট্টা নয় লিলি, বাস্তবিকই আমার ধারণা ছিল তুমি আমার সত্যিকার ব্যথা কোথায় তা বুঝবে এবং তোমার সাহায্য আমি সকল সময় পাব। আমার অতীত এবং বর্ত্তমানের কোন কথাই তোমার অজানা নয়। আজ কোথাও আমার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কিন্তু যে প্রাণশক্তিকে এক দিন আমি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলাম তা যেন ধীরে ধীরে আবার ফিরে পাচ্ছি। এই পরমক্ষণে তুমি আমার কোন কাজে অন্তরায় হয়ো না।

লিলি মৃন্ময়ের এই প্রকার সামঞ্জস্যহীন উক্তিতে রীতিমত বিস্মিত হইল। বলিল, তুমি ক্রমশঃই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়ছ মিনু-দা।

মৃন্ময় ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মানুষ একটা জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করতে না পারলে বাঁচতে পারে না। আত্মীয় বল, বন্ধু বল এক তুমি ছাড়া আজ আর কে আমার আছে। বলতে তোমাকে এক দিন হ'তই—দু'দিন আগে কিংবা দু'দিন পরে।

লিলির চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে একাগ্র দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের ভাবলেশহীন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় তেমনি স্বাভাবিক সুরেই বলিতে লাগিল, জ্ঞানত অন্যায় কোন দিন আমি করি নি, করবও না। তবে এ কথাটাও ঠিক যে, আপাতদৃষ্টিতে যতটুকু চোখে পড়বে সেইটুকুই সব নয়। ভুল বুঝবার এবং ভুল করবার আশঙ্কাও যথেষ্ট আছে।

লিলি ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, বলছি লিলি, একে একে সব কথাই তোমায় বলছি। মৃন্ময় থামিল এবং সহসা সে লিলিকেই পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিল, বলতে পার লিলি আমাদের দেশে স্বাধীনতা শব্দটার আসল মানে ক'জন বোঝে। অথচ শুনতে পাই আমরা নাকি স্বাধীন হয়েছি।

লিলি বলিল, এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি?

মৃন্ময় গভীরতাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, একটু নয় পুরোপুরি লিলি। স্বাধীনতা মানে চারদিকে যা দেখছি তা নয়, এ কথাটা বুঝবার মত শিক্ষার আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশের প্রত্যেক আনাচে-কানাচে আজ আলো জ্বেলে দেবার প্রয়োজন—চোখ চেয়ে যেন আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপটা দেখতে পাই।

লিলি বলিল, তার জন্যে রয়েছে দেশের গভর্নমেণ্ট—

মৃন্ময় বাধা দিয়া বলিল, তা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরও যে একটা দায়িত্ব আছে এ কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। সরকার বাহাদুর সব করে দেবেন ভেবে সবাই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে শুধু গভর্নমেণ্টের বিরূপ সমালোচনা করলে কোন কাজই হবে না, বরং স্বাধীনতা নামক যে বস্তুটি মিলেছে তা পরাধীনতার চেয়েও ঢের বেশী ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দেবে। আমাদের দূরদৃষ্টিও নেই, সংগঠন-শক্তিরও একান্ত অভাব, তাই পদে পদেই ঘটছে নিদারুণ পরাজয়।...

মৃন্ময় একটু থামিয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপর পুনরায় বলিতে লাগিল, খুব সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আপাতদৃষ্টিতে একে তুচ্ছ বলেই মনে হবে, কিন্তু এটাকে সামান্য ভেবে অবহেলা করে আজ আমরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অনেক বড় ক্ষতিকেই ডেকে এনেছি লিলি।

লিলি হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, এ যেন ধান ভানতে গিয়ে শিবের গীত শোনানো হচ্ছে।

মৃন্ময় এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। বলিল, তোমার যা খুশি বলতে পার লিলি, আমি এই অশিক্ষিত পাহাড়িয়া জাতিটার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। এরা অশিক্ষিত, কিন্তু এইটেই এদের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। এদের মন সবল এবং সুস্থ। এদের আত্মীয়ের মত, বন্ধুর মত কাছে টেনে নিয়ে এদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিলে দেশে বহু কল্যাণকর্ম্ম করিয়ে নেওয়া যাবে।

লিলি বলিল, কাজটা কি তুমি খুবই সহজ মনে করো ?

মৃন্ময় বলিল, সহজ না হতে পারে, কিন্তু অসাধ্য যে নয় তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে এবং সে প্রমাণ দেখিয়েছে সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে আগত পাদ্রীর দল। নিজেদের প্রয়োজনে এরা তাদের একটা অংশকে ধর্ম্মান্তরিত করেছে। আমাদের কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে এদের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হবে, সর্ব্বাগ্রে এদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করতে হবে।

লিলি নিঃশব্দে শুনিতেছিল। মৃন্ময় বলিতে লাগিল, আমার কথাগুলো হয়ত কতকটা বক্তৃতার মত শোনাচ্ছে। তা হোক তবুও তোমাকে আমার বলতেই হবে। আমি এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর মহীপাল হবে আমার প্রধান সহায়। ছেলেটি শুধু আদর্শের নীরব পূজারী নয়—ওর মধ্যে আছে প্রচণ্ড গতিবেগ। সেই বেগকে নিয়ন্ত্রিত করে চালনা করতে হবে।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, মহীপালের বাবা তোমাদের এই কাজকে ভাল চোখে দেখবেন বলে আমার মনে হয় না মিনু-দা।

মৃন্ময় বলিল, কথাটা আমিও ভেবে দেখেছি লিলি এবং একথাও আমি জানি যে, আসলে তিনি আজও অতীত যুগের ধারাবাহী এক রাজা যাঁর মধ্যে রয়েছে তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষের রাজরক্ত। হয়তো তিনি বাধা দেবেন তবুও দেখি কত দূর কি হয়।

লিলি বলিল, খবরটা আগেই আমি পেয়েছি অথচ আজও তোমরা কাজে নাম নি সেইজন্যেই আমার এত ভয় মিনু-দা। শুধু আমার নিজের কথা ভেবে এ কথা বলছি না।

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, এতটা অপদার্থ তুমি আমায় মনে করো না যে তোমায় আমি অকারণে ভুল বুঝব, কিন্তু দায় এবং দায়িত্ব সব কাজেই আছে লিলি। তা ছাড়া বাধা যদি আসেই তাতে ভয় পাবার কি আছে!

লিলি নীরব। মৃন্ময় বলিতে লাগিল, আমার মনে হয় একটা বিষয়ে তোমার ভুল হয়েছে। আমাদের কোন কাজেই গোপনতা নেই। মহীপাল অবশ্য তার বাবার দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার পক্ষপাতী, কিন্তু আমি তাতে সায় দিতে পারি নি, বরং তার বাবাকে ওয়াকিবহাল হবার সব রকম সুযোগ করে দিয়েছি। তিনি খুশী হন নি, কিন্তু প্রকাশ্যে বাধাও দেন নি। আর যাই হোক তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি।

বাধা দিয়া লিলি বলিল, সেখানেই আমার আরও ভয় মিনু-দা। ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত যদি ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তাতে সব সময় জীবনসংশয় হয় না, কিন্তু যে অস্ত্রে ধার এবং ভার দুই আছে তা দু'টুকরো করে ক্ষান্ত হয়। বাধা তোমায় আমি দিচ্ছি না, আর দিলেও তোমরা তা শুনবে কেন, তবে অন্ধকার-পথে চলবার ইচ্ছে যেন কোন দিন না হয় মিনু-দা—এ আমার একান্ত অনুরোধ।

লিলি একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আরম্ভটা তোমাদের কোন্ পথ ধরে সুরু হবে?

লিলির কথার ধরনে মৃন্ময় কৌতুক বোধ করিল, কিন্তু মুখে সে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, মঞ্চের উপর বক্তৃতা আমরা দেব না। পরিকল্পনার ফাঁকা ফানুস আমরা আকাশে ওড়াতে চাইব না। শুধু গোড়া থেকে আরম্ভ করা হবে আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ। ওদের আত্মানুসন্ধিৎসা জাগানোই হবে মূল লক্ষ্য। জানতে দিতে হবে যে দেশের কল্যাণসাধনে ওদের প্রয়োজন কম নয়।

লিলি শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর ফলে যদি একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিরোধ করবে তোমরা কোন্ শক্তিতে মিনু-দা ?

মৃন্ময় তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার এ ভয় অমূলক। আমাদের পথ ধ্বংসের পথ নয়, সৃষ্টিকে সুন্দর এবং সার্থক করে তুলবার পথ।

লিলি চিন্তিত ভাবে বলিল, শুনতে খুবই ভাল লাগছে, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে গিয়েই যত সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মৃন্ময় বলিল, এই সংশয় আমাদের আরও সতর্ক করে তুলবে! আসল কথা কি জান লিলি ? আমাদের কাজে দল-উপদলের স্বার্থসিদ্ধির দুরভিসন্ধি থাকবে না, তাই প্রচারের নামে অপপ্রচার ঘটবে না এবং সংস্কারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে আমাদের শিক্ষার আদর্শ। ভাল মন্দর দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে যে মুহূর্ত্তে ওরা সচেতন হয়ে উঠবে, ওদের সবল হাত থেকে তখনই দেশ পাবে কল্যাণের অফুরন্ত সম্পদ।

লিলি কেমন এক প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটুখানি হাসিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, বড় পরিকল্পনা থাকা ভাল মিনু-দা, কিন্তু নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে দেখেছ তো ?

মৃন্ময় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পরিকল্পনা যত বড়ই হোক, আরম্ভটা কিন্তু খুব ছোট থেকেই হয়ে থাকে। তা ছাড়া কি জান এই পরিকল্পনাকে আংশিকভাবেও যদি সফল করে তুলতে পারি তা হলেও নিজের জীবনকে সার্থক মনে করব। অন্ততঃ এই আশা করতে পারব যে আমাদের ভাবী বংশধরেরা আর আমাদের মত না বুঝে ভুল করবে না।

মৃন্ময় ক্ষণকাল নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া থাকিয়া যখন মুখ তুলিল তখন তাহার চোখেমুখে এক বিচিত্র ভাবধারা খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। লিলির সহিত চোখোচোখি হইতেই সে হাসিয়া ফেলিল। লিলি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময়কে আজ যেন সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। মৃন্ময় তেমনি হাসিমুখে বলিতে লাগিল, অবাক হয়ে দেখছ কি লিলি ?

লিলি বলিল, দেখছিলাম তোমাকে। আর—

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, আর ভাবছিলে তোমার মিতভাষী মিনুদার আজ হ'ল কি—তাই না ? জান লিলি এতক্ষণ ধরে যত বক্তৃতা দিয়েছি সব মিথ্যে, শুধু হেসে ওঠাটাই সত্যি। নইলে করতে যাচ্ছি একটা ছোট্ট পাঠশালা আর

তা নিয়ে কত লম্বা লেকচার ঝেড়ে ফেললাম।

লিলি কতক শুনিতেছিল, কতক তার কানেও যাইতেছিল না। সে তখন ভাবিতেছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরে কিছু পূর্ব্বেও যে ঢেউয়ের নৃত্য সে দেখিয়াছে তা কি নিতান্তই অলীক।

মৃন্ময় সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সত্য কথাটা কি জান? একা মহী-পালকে নিয়ে আর মন উঠছে না। পড়াশুনো করতেও যেন আর উৎসাহ পাই না। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।

সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া মৃন্ময় অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল। বলিল, দেখ ত লিলি মনে হচ্ছে যেন ডাক-পিয়ন আমাদের বাসায় ঢুকেছে।

লিলি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, সম্ভবতঃ ভুল করেছে। আমাদের আবার চিঠি আসবে কোথা থেকে।—লিলি অগ্রসর হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই একখানা চিঠি হাতে ফিরিয়া আসিল। মৃন্ময়ের চিঠি। লিখিয়াছে নান্টু। মৃন্ময় সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি গ্রহণ করিল।

লিলির হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মৃন্ময় তাহা একবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। পড়িয়া দেখিবার কোন আগ্রহ তাহার মধ্যে দেখা গেল না। লিলি একবার মৃন্ময়ের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে তাহাকে ডাকিল। বলিল, কোথায় যাচ্ছ লিলি?

লিলি জবাব দিল, একবার রান্নাঘরে না গেলে যে চলছে না মিনু-দা।

মৃন্ময় বলে, কেন তোমার রাঁধুনী—

লিলি একটুখানি হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল, সব সময় তার উপর নির্ভর করলে চলে না। লিলি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

মৃন্ময় চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল।···

ভাই মিনু—

দিনকয়েক পূর্ব্বে তোমার চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতে বসে মনে হয়েছে যে কথা তুমি জানতে চেয়েছ তার যথাযোগ্য উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তাই তখনকার মত আমায় নিরস্ত হতে

হয়েছিল। তোমার আমার পথ যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন তখন মিথ্যা পণ্ডশ্রম করতে আমার মন চায় নি। এর জন্তে তুমি দুঃখিত হলেও আমি নিরুপায়। যেখানে ঘটনাটির শেষ করে দিয়েছি সেইখানেই যেন তার চির অবসান হয়। নইলে তার জের টানতে গেলে এ জীবনেও মুক্তি পাব না, শুধু পথহারার মত ঘুরে মরতে হবে। কিন্তু একটা কথা আজও আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে, এ তুমি করলে কি! ভালবাসার এত বড় অপমানের কথা আমি কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। যা তুমি করেছ তা আমি ভুল করেও অবিশ্বাস করতে পারছি না! পারলে অবশ্যই খুশী হতাম, কিন্তু তোমার সত্যভাষণের উপর আমার আস্থা আছে।

প্রথমে যে ভুলের জন্য তোমরা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে তা আমার অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু আজ আমার দুঃখ এবং বেদনা রাখবার ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছি না এই ভেবে যে, তোমাদের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল আমাকে কেন্দ্র করে। তবুও এই দুঃখের মধ্যেও একথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে, আমার ভাগ্য আমাকে নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এর জন্তে রাধু বোষ্টমকে আমি আমৃত্যু মনে রাখব এবং সেই সঙ্গে একথাটাও আমি ভুলতে পারব না যে, যে হৃদয়বৃত্তি রাধুর মত একজন প্রায় নিরক্ষর মানুষকে শিখিয়েছে ক্ষমা করতে, শক্তি জুগিয়েছে তার গৃহত্যাগিনী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে; হৃদয়ের সেই সুকুমার বৃত্তি তোমার মধ্যে এমন ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল কি করে! অথচ তোমার রয়েছে উচ্চশিক্ষা, উন্নত আদর্শবাদ।

যে ভুল মানুষ না জেনে করে তার দায়িত্ব না হয় অদৃষ্টের উপর চাপিয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু যা তুমি জেনেশুনে করলে তার কি জবাব দেবার আছে মিনু?

মঞ্জুষাকে আমি দোষ দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস এ উক্তিকে তুমিও সমর্থন করবে। অন্যায় সে করে নি—একটি মুহূর্তের জন্য তাকে প্রশ্রয়ও দেয় নি। রাধুর চিঠিতে প্রথমে সে জানতে পারলে যে একটা মারাত্মক রকম ভুলই তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির কারণ। তার পরে আর এক পা সে অগ্রসর হয় নি। সে দৃশ্য আজও আমার মনে পড়ে মিনু। মঞ্জুষা যেন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। সে পাষাণে প্রাণদান করতে একমাত্র তুমিই পারতে, কিন্তু পিছিয়ে গেলে।

আজ যা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে তোমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, তার সাক্ষাৎ হয়তো কোন দিনই তুমি পেতে না, কিন্তু একটা মিথ্যা লৌকিক অনুষ্ঠানের কথা তুমি কিছুতেই ভুলতে পারলে না যার জন্যে আমার এত বড় বিশ্বাসের করলে, অমর্য্যাদা। মঞ্জুষার আসল সত্তাকে মারতে গেলে টুঁটি টিপে। কিন্তু আমি জানি সে মরবে না—মরতে সে পারে না। তার মধ্যে আমি দেখেছি অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্য, কোমল এবং কঠোরের অপূর্ব্ব সমন্বয়। তবে তোমার অবিবেচনার ফলে তার অন্তরের একটা দিক হয়তো কোন দিন ফুটে উঠতে পারবে না—তার কাজের মধ্যে মমতার স্নিগ্ধ স্পর্শের অভাব দেখা দেবে। তাই সে তোমার মুখের উপর অমন করে দরজা বন্ধ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মনকে যেন অনাবশ্যক পীড়ন করা হয়।

লিখেছ আমার অসমাপ্ত কাজ যেন আমিই আবার সমাপ্ত করি। একথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না। এত ছেলেমানুষ ত তুমি নও মিনু। আর আমি চাইলেই তা পাওয়া যাবে এ কথাই বা তুমি বলছ কোন যুক্তিতে! আজ আমার কি মনে হয় জান? মঞ্জুকে তুমি চিনবার চেষ্টা এক দিনের জন্যেও কর নি। শুধু স্বপ্ন দেখে আর রঙিন কল্পনা করেই এতকাল কাটিয়েছ—ভাল তাকে হয়তো এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাস নি।

তুমি হয়তো ভাবছ আমার মত একটা ভবঘুরের মুখে এসব কথা কেন? কথাটা আমারও একবার মনে হয়েছে। ঘোরতর সংসারীর নাকি এইটেই আসল রূপ।

মঞ্জুষার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু ভাবতে বসে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, আমার যা কিছু দুশ্চিন্তা তা তোমাকে নিয়েই—মঞ্জুষা নিতান্তই উপলক্ষ্য। সুতরাং একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, আমার চলার পথে মঞ্জুষার আবির্ভাবটা একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র।

তোমার চিঠিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মঞ্জুষার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা পালটে গেছে। খেয়ালমত তাকে নিয়ে দাবার চাল দেওয়া চলবে না। তার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মচেতনা অত্যন্ত সজাগ।

আবার বলছি তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু ধন্য মেয়ে মঞ্জু—এই ত চাই। নইলে আমাদের চৈতন্য যে আর সারাজীবনেও হবে না।···

আজ আর বেশী লিখব না। বেশ বুঝতে পারছি তুমি ক্রমে ক্রমে চটে যাচ্ছ, কিন্তু কি করব বল। তোমাদের কথা যে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের মত পথের মানুষ তোমরা নও—সংসার তোমাদের অনেককিছু দিতে চায় এবং প্রতিদানে পেতেও চায়।…

আমার কথা জানতে চেয়েছ। ভালই আছি। কিন্তু বর্ত্তমানে যেখানে আছি সেখানে বেশী দিন পোষাবে না। লীলা রাও ঢের বদলে গেছে, এত বদলে গেছে যে, অনেক চেষ্টা করেও ঠিক যেন খাপ খাওয়াতে পারছি না। লীলা বলে ওসব আমার মনের ভুল। কিন্তু ভুলই হোক আর সত্যই হোক, তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। কখন কোথায় থাকি তুমি জানতে পারবে। আমার আন্তরিক ভালবাসা নাও।

ইতি নান্কু—

পড়া শেষ হইতেই মৃন্ময় চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিল। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। এখনও আলো জ্বালানো হয় নাই। লিলির সম্ভবতঃ হুঁশ নাই। মৃন্ময় ভাবিল, আলো দিয়া গেলে চিঠিখানি আর একবার পড়িয়া দেখিতে হইবে।

সহসা সে উঠিয়া আবছা অন্ধকারে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল। মনটা আবার নূতন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। নান্কুর মত সে একবারও ভাবিতে পারিতেছে না যে, যেখানে একবার শেষ করিয়া দিয়াছে সেখানেই যেন সবকিছুর শেষ হইয়া যায়। নান্কুর মন যে কোন্ ধাতুতে গড়া মৃন্ময় তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পারিলে হয়তো তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনায় এমনি করিয়া বিপর্য্যয় দেখা দিত না, অন্ততঃ একটা সহজ পথ সে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইত।

মহীপাল এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ইহার পরে আজ আর বাহির হওয়া চলিবে না। মৃন্ময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে আসিয়া বসিল। এই মুহূর্ত্তে তার কোনকিছুই ভাল লাগিতেছিল না।

লিলি সেই যে গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে এখনও তার দেখা নাই। লছমিয়া একবার আলো-হাতে ঘরের দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া কি জানি কেন প্রবেশ না করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে গুন্ গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিতেছিল। লছমিয়া চলিয়া যাইতে তার হুঁশ হইল, কিন্তু তাহাকে ডাকিবার পূর্ব্বেই সে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাগানে বসিয়া

বসিয়া মৃন্ময় ক্লান্তিবোধ করিতেছিল, নিঃসঙ্গতা তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

লিলিকে দেখা গেল আলো-হাতে তার ঘরের পানে আসিতে। মৃন্ময় দ্রুত বাগান হইতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল, লিলির সহিত দোরগোড়ায় তাহার সাক্ষাৎ হইল। লিলি কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া আলোটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল, বাগানে ছিলে বুঝি? তবে যে লছমিয়া বলছিল তোমার মন ভাল নেই।···

মৃন্ময় বিস্মিত হইল। বলিল, এ খবর লছমিয়াকে কে দিলে লিলি?

লিলি গম্ভীর হইতে গিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি করে জানলি লছমিয়া? কি জবাব দিলে জান? লিলি পুনরায় হাসিয়া কহিল, বললে, দাদাবাবু গান গাইছে—

মৃন্ময় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া উচিত ছিল তোমার।

লিলি শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, প্রয়োজন বোধ করি নি মিনু-দা। কিন্তু চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই তো? কে লিখেছে চিঠি?

মৃন্ময় বলিল, নান্তুদা লিখেছে।

লিলি বলিল, কিন্তু আমার সব কথার জবাব ত এখনও দেওয়া হয়নি মিনু-দা।

মৃন্ময় যেন নিজের উপর নিজে চটিয়া গিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল, কি আর লিখবে। সেই একই কথা। শুধু একটানা ছি ছি আর রাশি রাশি অনুযোগ। এটা হলে ভাল হ'ত, সেটা হলে ভাল হ'ত। যা হয়নি তা হয়নি, এখন কি হতে পারে বলো। না ধন্য মেয়ে মঞ্জু।

লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, দেখছি লছমিয়াও তোমাকে চিনে ফেলেছে। কিন্তু এত রাগ তোমার কার উপর?

মৃন্ময় নিজের এই আকস্মিক উত্তেজনায় ঈষৎ লজ্জিত হইল। বলিল, না রাগ আবার কার ওপর করতে যাব। বলিয়া টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানি তুলিয়া আনিয়া লিলির হাতে দিল, বলিল, পড়ে দেখ।

চিঠিখানি মৃন্ময়কে ফিরাইয়া দিয়া লিলি কহিল, রেখে দাও—তোমার মুখ থেকেই এক সময় শোনা যাবে। তার চেয়ে চলো বাগানে বসি গিয়ে। ভারি চমৎকার চাঁদের আলো বাইরে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর উভয়ে সম্মুখের বাগানে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লিলিই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিল।

সে কহিল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় নূতন করে তুমি ফিরে না এলেই বুঝি ভাল করতে। তোমার নিজেরও তাতে মঙ্গল হ'ত, আমাকেও হয়ত নূতন নূতন দুর্ভাবনার সম্মুখীন হতে হ'ত না।

মৃন্ময় ডাকিল, লিলি।

লিলি সাড়া দিল, কি বলছ মিনু-দা—

মৃন্ময় বলিল, আমাকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছ বোধ হয়?

লিলি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, অস্বীকার করতে পারলেই ভাল হ'ত, কিন্তু কথাটা তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। তোমাকে নিয়ে না হলেও নিজেকে নিয়ে সত্যিই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

লিলি থামিল। একবার আকাশের পানে চাহিল। পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের আলোর অজস্র প্লাবন বহু দিনের হারানো স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। সেদিনের সে মন আজ আর নাই বটে, কিন্তু তবু কি যেন এক অনুভূতি মনকে আকুল করিয়া দেয়—একটা মৃদু পুলক-শিহরণ জাগে সারা দেহ-মনে। মন আজও মরিয়া যায় নাই। লিলির চোখ দুইটি নিজের অজ্ঞাতেই বুজিয়া আসে।

মৃন্ময় খানিক তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ঠিক বুঝতে পারছি না হঠাৎ তোমার মুখে আজ এ সব কথা কেন লিলি? কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন তা জানবার আমার দরকার নেই, তবে আমি কথা দিচ্ছি খুব শিগ্‌গীরই তোমাকে এই দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেব।

লিলি সহসা অতিমাত্রায় চমকাইয়া উঠিল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, সব কথা তোমায় আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না মিনু-দা। কিন্তু একটা অনুরোধ, না বুঝে আমার উপর অবিচার করো না। আমাকে মুক্তি দেবে বলছ, কিন্তু তা যেন শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে শাস্তিস্বরূপ না হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখা দিল। সে কহিল, তোমরা কখন যে কি ধরণের কথা বল তা সত্যিই আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু ভুল যদি কখন করে বসি নিঃসঙ্কোচে তা দেখিয়ে দিয়ো। কিছু না পারি অন্ততঃ সাবধান হতে পারব। একটু থামিয়া মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আধুনিক কালের উপযুক্ত আমি নই, সময়ের গতির সঙ্গে পা ফেলে হিসেব রেখে চলতে পারি না। পদে পদে হোঁচট খাই। ন্যায়-অন্যায়ের চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখি যে, আমার মূলধন নিয়েও টানাটানি পড়ে

গিয়েছে। ফাঁকি অবশ্য ধরা পড়ে, কিন্তু তা এত দেরিতে যে তখন ফাঁক বুজোতে গিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে যাই।···

লিলি নীরব। মৃন্ময় বলিয়া চলিল, লোকে বলে আমি পুরাতনপন্থী। নূতন-পুরাতনের প্রশ্ন এটা নয়। আমি না বুঝে, না জেনে অন্ধের মত এগিয়ে চলি কেমন করে। আজন্মের সংস্কারকে এক কথায় অস্বীকার করতে যে পারে তাকে দুঃসাহসী বলা গেলেও সুবিবেচক বলা চলে না। মঞ্জুষাকে খুব বেশী ভালবাসি বলেই আমায় এত সাবধান হতে হয়েছিল। কোন দিক দিয়ে এত-টুকু ছোট যেন তাকে না হতে হয় সেই চিন্তাটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল।··· কিন্তু নান্টু বলে, ভালবাসার এত বড় অপমান ঘটতে ইতিপূর্ব্বে সে নাকি আর দেখে নি।

লিলি এতক্ষণে মুখ খুলিল। শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা বলছি তুমি রাগ করো না মিনু-দা। মনে করো না আমি মঞ্জুর হয়ে ওকালতী করছি। আচ্ছা সত্য করে বল তো তোমার এত সতর্কতা কি শুধু তার কথা ভেবেই।

মৃন্ময় বলিল, অন্ততঃ তাই তো আমি মনে করি লিলি।

লিলি তেমনি ধীরে ধীরে বলিয়া চলিল, আমার মনে হয় অন্য কথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মঞ্জুষাও আমারই পথ ধরে ভেবে দেখেছে।

মৃন্ময় বলিল, এত ভূমিকা করো না লিলি।

লিলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, মঞ্জু নিছক উপলক্ষ্য, আসলে তুমি ভেবেছ শুধু নিজের কথা এবং সেইটে সবকিছুকে ছাপিয়ে এত বড় হয়ে উঠেছে যে···

মধ্যপথে বাধা দিয়া মৃন্ময় প্রতিবাদ জানাইল, না না, লিলি এ তোমাদের মিথ্যা ধারণা—অসঙ্গত কল্পনা।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, একটুও মিথ্যে নয়, একটুও অতি-রঞ্জিত নয় মিনু-দা। তোমার ভালবাসায় ত্যাগের অভাব ছিল বলেই গ্রহণ করতে গিয়েও ইতস্ততঃ করেছ, কিন্তু মঞ্জুর প্রেম খাঁটি প্রেম তাই সে তোমায় দোরগোড়া থেকে বিদায় দিতে পেরেছে। মনে করো না এটা খুব সহজে সে পেরেছে, কিন্তু তোমার জন্যেই তাকে এতটা শক্ত হতে হয়েছে।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে মৃন্ময় কহিল, আমার জন্য!

লিলি বলিল, ঠিক তাই। ভক্ত তার দেবতাকে ছোট করে দেখবার পূর্ব্বে নিজের মৃত্যুকে কামনা করে। মঞ্জু বেছে নিয়েছে মরণের পথকেই—

মৃন্ময় বলিল, তোমার কথা এখনও আমি বুঝতে পারছি না লিলি।

প্রত্যুত্তরে লিলি বলিল, তুমি যদি কিছুতেই না বুঝতে চাও সে আলাদা কথা।

মৃন্ময় কহিল, তুমিও কি তা হলে এই কথাই বলতে চাও যে, ভালবাসার অপমান আমি করেছি? শুধু নিজের কথাটাই আমি বড় করে দেখেছি?

লিলি জবাব দিল, ঠিক তাই মিনুদা। মঞ্জুষার কথাই যদি তোমার কাছে মুখ্য হ'ত তা হলে তোমার মধ্যে এত দ্বিধা অথবা সঙ্কোচ দেখা দিত না, তোমার মনে এত বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও জাগত না।

মৃন্ময় বলিল, যদি তাই হয় তা হলেই বা আমার অন্যায়টা তুমি কোথায় দেখলে!

লিলি বলিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আমি তুলি না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কহিল, আমার একটা কথার সত্য জবাব দেবে মিনু-দা!

মৃন্ময় কহিল, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পার লিলি।

লিলি বলিল, কিসের জন্য তুমি আবার মঞ্জুর কাছে ফিরে গিয়েছিলে? সে কি শুধু তাকে গ্রহণ করে কৃতার্থ করতে? না তোমার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে মিনু-দা? মঞ্জুষা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে তোমাকে বিদায় দিতে পেরেছে। কিন্তু এর জন্যে তোমার বন্ধু তোমাকে অনুযোগ দিলেও আমি দেব না।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমার হয়ে জবাবটাও যখন তুমি দিয়ে দিলে তখন প্রশ্ন করবার কোন প্রয়োজন ছিল না লিলি, কিন্তু জিজ্ঞেস করি আর দশ জনের মত তুমিই বা আমায় অনুযোগ দিতে পারছ না কেন?

লিলি কহিল, কারণ পুরুষের এই অহঙ্কারকে মেনে নিতে না পারলে সংসার চলে না। শুধু তাল ঠুকে লড়াই করেই দিন চলে যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নান্টুর চিঠি, লিলির যুক্তি সবকিছু একসঙ্গে তার মাথার মধ্যে পাক খাইতেছে। একবার দূরে পাহাড়ের উপরে গোলাকার চাঁদের পানে তার দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু আজ চাঁদের যেন কোন রূপ নাই···নাই কোন আকর্ষণ।···মৃন্ময় পুনরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। উহারা সকলেই হয়তো একেবারে মিথ্যা বলিতেছে না। নিজের

মত করিয়া ওরা ভাবিয়া দেখিতেছে। তার মনের খবর কেমন করিয়া পাইবে। এই মুহূর্ত্তে মৃন্ময়ের নিজেকে বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল মনে হইল।

লিলি কিছুক্ষণ তার চিন্তাকুল মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, নিজের মনের কাছেও তুমি সত্যকে স্বীকার করতে পারছ না। তুমি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ মিনু-দা। নিজের উপরও তোমার সে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আজ আর অবশিষ্ট নেই। নইলে নান্টুবাবুর চিঠি পেয়ে তুমি রাগ করতে না, আমার কথায়ও ক্ষুণ্ণ হতে না।

মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে লিলির পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, অনেক কথাই নান্টু লিখেছে, তুমিও কিছু কম করে বললে না। এর জবাব আজ আমি দেব না, কিন্তু একদিন হয়ত নিজের থেকেই পাবে। তুমি ভেব না নিজের ত্রুটিকে ঢাকবার জন্য আমি একথা বলছি। একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, তুমি বলতে চাও যে এ হ'ল পুরুষের দম্ভের আর এক ধরণের প্রকাশ—

বাধা দিয়া লিলি বলিল, ঠিক তাই অথচ সবচেয়ে মজা এই যে, কথাটা তোমরা বোঝ না—এটা এমনি প্রচ্ছন্নভাবে তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মৃন্ময়ের মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, যাদের মনে এর অবস্থিতি তারা বোঝে না আর তোমরা তার খবর রাখ। এত বড় বিস্ময়ের কথা আর শুনি নি লিলি।···

লিলি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, তাও সম্ভব মিনু-দা। কেমন করে, সে প্রশ্ন করো না—আমি জবাব দিতে পারব না। তা বলে কথাটা আমার হেসে উড়িযে দিও না কিন্তু। আর নয়, এ নিয়ে ঢের সময় কাটানো হয়েছে। চল ঘরে যাই—লছমিয়ার যাবার সময় হয়েছে। তা ছাড়া—

লিলি সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল—ঐ যে তোমার মহীপাল দেখা দিয়েছেন, কিন্তু আজ আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে মিনু-দা।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, মহীপালের সঙ্গে যেতে নিষেধ করবে তো?

লিলি হাসিল, কহিল, ঠিকই আন্দাজ করেছ তুমি।

মৃন্ময় বলিল, কিন্তু ব্যবস্থা যে আমাদের আগে থেকে পাকা হয়ে আছে। ওকে জবাব দেব কি?

লিলি কহিল, সে ভার আমাকে দাও। আমি শুধু তোমার কথা চাই মিনুদা। ওর কণ্ঠস্বর আবেগে ভিজিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল। মৃন্ময় বিস্মিত হইলেও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। ততক্ষণে মহীপাল তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। লিলি তাহাকে কলকণ্ঠে আহ্বান জানাইল।

মঞ্জুষা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবানন্দের চোখে ঘুম নাই। একটা কাল্পনিক আশঙ্কায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। মৃন্ময় আসিয়াছিল আবার চলিয়া গেল। মঞ্জুষা বলে, সে আর আসিবে না।...কিন্তু কেন... কিসের জন্য! তিনি না হয় উত্তেজিত হইয়া দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু মঞ্জুষা এমন নির্ব্বাক দর্শকের মত থাকিতে পারিল কেমন করিয়া! তার আসল মনের কথাটা কি—এ কি মঞ্জুষার নিছক বৈরাগ্য না বিদ্রোহ!

জীবানন্দ ইহার অধিক ভাবিতে পারেন না। চিন্তা করিবার ক্ষমতাও তিনি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। জোর করিয়া নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি আজ তাঁর নাই—এমনি একটা অসহায় অবস্থায় আসিয়া তিনি উপনীত হইয়াছেন।

অকস্মাৎ তাঁর মনে পড়িল গৃহত্যাগী, ধর্ম্মত্যাগী পুত্রকে—একের পর এক মনে পড়িল আরও বহু ঘটনা। তার কল্পনার সোনার সংসার আজ এ কি হতশ্রী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। দুষ্ট শনি গুপ্ত পথে তাঁর সংসারে প্রবেশ করিয়া সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁর চোখের সম্মুখেই সবকিছু ঘটিয়াছে—তিনি বাধা দিতে পারেন নাই...পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে গা ভাসাইয়া দিয়া এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছেন। আজিকার এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য তিনি নিজেকেই বারে বারে ধিক্কার দেন।

নান্কুর সহিত মঞ্জুষার বিবাহকে তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সমর্থন করিতে পারেন নাই অথচ মঞ্জুষার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার শক্তিও তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে, নিজের ইচ্ছায় চলিয়া অনেক দুঃখই এ যাবৎ পাইয়াছেন, দেখা যাক মঞ্জুষা যদি জোড়াতালি দিয়া কোন রকমে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, ভরাডুবি হইতে যতটুকু বাকী ছিল তাহাও সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মানুষ আর কতখানি সহ্য করিতে পারে। জীবানন্দও পারিলেন না। তাঁর

স্বভাবের ঘটিল পরিবর্ত্তন। যখন কথা বলা দরকার তখন চুপ করিয়া থাকেন, আবার অকারণে থামোকা চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তোলেন। ঠিক যে অস্বাভাবিক তা নয়, আবার ইহাকে ঠিক স্বাভাবিকও বলা চলে না। নহিলে মৃন্ময়ের সহিত এইরূপ আচরণের কোন হেতু ছিল না। মৃন্ময় চলিয়া যাইতেই কিন্তু কথাটা জীবানন্দ অনুভব করিলেন—প্রতিকার করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মঞ্জুষা বাধা দিল।

জীবানন্দ ক্ষণকালের জন্য থামিলেন—কি জানি, না জানিয়া আবার তিনি নূতন করিয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে উদ্যত হন নাই ত? মনে মনে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।···

বৈশাখের শেষ। আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই কেমন একটা ভাপসা গুমোট ভাব। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। হয়ত এখনি বৃষ্টি আসিবে। জীবানন্দ স্থিরভাবে শয্যার উপর বসিয়া আছেন। বাহিরের ঐ স্তব্ধ প্রকৃতির সহিত তাঁর মনের কোথাও যেন একটা গভীর যোগ আছে।

জীবানন্দ কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। এমনি ভাবে মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া। তাঁর এতখানি বয়স হইয়াছে—আর কত দিন বাঁচিবেন। কিন্তু মঞ্জুষা—তার জীবনের এই ত সবে আরম্ভ।···আবার সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। দুই চোখ ক্লান্তিতে বুজিয়া আসে, কিন্তু মাথার ভিতরটা দপ দপ করিতে থাকে। কিছু একটা তাঁহাকে করিতেই হইবে।

জীবানন্দ পুনরায় শয়ন করিলেন।

বাবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মঞ্জুষা আপন শয্যার উপর উপবেশন করিল। একটা সমস্যা মিটিয়া যায়, আর একটা আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। সে কি নিজেকেও পদে পদে এমনি করিয়া চিনিতে ভুল করিবে।

'যাও'—বলিয়া মৃন্ময়ের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া মঞ্জুষা ভাবিয়াছিল যে, এইবার হয়ত একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে চিন্তাটা ততই যেন আরও গুরুভার হইয়া তার শ্বাসরোধ করিয়া ফেলিতেছে। যুক্তি-বিচার দ্বারা তার কাজের সমর্থন মিলিলেও মন দ্বিধাহীন ভাবে তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছে না। বরং সেই একটি চিন্তা আরও সহস্র ধারায় মঞ্জুষার মনের দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

সেই প্লাবনের প্রচণ্ড গতিপথে তার জীবনের কত স্মৃতিই একের পর এক দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। মঞ্জুষা চমকিত হয়। তার ভবিষ্যৎ কোথায় কোন গভীর অন্ধকারে—তার পৃথিবী কি চিরবন্ধ্যাই থাকিবে? একদিনের জন্যও সেখানে কি ফুল ফুটিবে না—ফল ধরিবে না?

রাত অনেক হইয়াছে। তার বাবার ঘরে এখনও আলো জ্বলিতেছে। এখনও তিনি জাগিয়া আছেন। হয় ত আজিকার ঘটনার কথা ভাবিয়াই তিনি আবার নূতন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। মঞ্জুষার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সেই শব্দে সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল।

ভাল করে নাই—সে কাজটা মোটেই ভাল করে নাই। হয়ত বলিবার তার অনেক কথাই ছিল।···কিন্তু তাহা জানিয়া মঞ্জুষার কতখানি লাভ হইত। বরং যাচিয়া নিজে আরও দুঃখ বরণ করিয়া লইত। মৃন্ময় সাগ্রহে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার যখন সে হারাইয়াছে তখন ইহা ছাড়া অন্য কোন্ পথে সে চলিতে পারিত!

বাহিরে প্রবল ঝড় উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মঞ্জুষাকে উঠিতে হইল। দ্রুত সে খোলা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া সোজা তার বাবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জানালাগুলি তখনও খোলা রহিয়াছে। জীবানন্দের বোধ হয়, একটু তন্দ্রার ভাব দেখা দিয়াছিল। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহা টুটিয়া গেলেও তিনি নিঃশব্দে শুইয়াছিলেন। মঞ্জুষা আসিতেই উঠিয়া বসিলেন। মঞ্জুষা দ্রুত জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া তার বাবার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর রাত জেগো না বাবা। শুয়ে পড়ো—আমি আলো নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।···

জীবানন্দ করুণ দৃষ্টিতে মেয়ের মুখের পানে খানিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন তুমিও ত জেগেই ছিলে মঞ্জু।

মঞ্জুষা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া জবাব দিল, আমার কথা বলো না বাবা। কিন্তু তোমার শরীর যে মোটেই ভাল নেই।

জীবানন্দ আর কথা বাড়াইলেন না। শুইয়া পড়িলেন। মঞ্জুষা তাঁর গায়ের উপর চাদরটা টানিয়া দিয়া পাথার গতি আরও খানিক কমাইয়া দিল এবং আলো নিভাইয়া দিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

পরদিন মঞ্জুষার ঘুম ভাঙিতে কিছু বিলম্ব হইল। জীবানন্দের প্রত্যেকটি কাজ সে নিজের হাতে করিয়া থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বহু দিন যাবৎ এই নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে। কাজেই অকস্মাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চাকর-বাকর সকলকে ডাকিয়া খুব একচোট ধমকাইলেন। এতগুলি অকর্ম্মণ্য চাকরকে অনর্থক তিনি আর পোষণ করিবেন না একথাটাও জানাইয়া দিলেন।

তাঁর খাস চাকর নিতাই আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জানাইল যে, তাহাদের তিরস্কার করা বৃথা—

জীবানন্দ পুনরায় উষ্ণ হইয়া উঠিলেন।

নিতাই বলিল, আপনার কোন কাজ আর কারুর করবার হুকুম নেই যে, নইলে—

জীবানন্দ সহসা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, বুঝলে নিতাই মেয়েটা একেবারে আস্ত পাগল। আর দু'দিন যদি অসুখেই—কথাটা তিনি শেষ না করিয়া অন্য প্রসঙ্গে আসিলেন, বলিলেন, তাই ত কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল। এতক্ষণ মঞ্জু ত কোন দিন বিছানায় পড়ে থাকে না। বলিয়া শশব্যস্তে উঠিতে গিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন। মঞ্জুষা দেখা দিয়াছে।

সে আসিয়া একবার দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়া চাহিয়াই নিতাইকে মৃদু ভর্ৎসনা করিল, এতখানি বেলা হয়ে গেছে আর আমাকে একবার ডাকবার কথাও তোমাদের কারুর মনে হ'ল না। খামোকা বাবার কত দেরী হয়ে গেল। তোমরা যদি এই বুদ্ধিটুকুও না খরচ করবে তা হলে চলে কি করে।

নিতাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে একে একে নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

জীবানন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, হতভাগাদের আজই বিদেয় করে দাও মঞ্জু। রোজ রোজ তোমাকেই বা সব কাজ করতে হবে কেন?

মঞ্জু হাসিমুখে জবাব দিল, তার জন্যে ওদের দোষ দিও না বাবা। আমার মানা আছে বলেই তোমার কোন কাজ করতে ওরা ভরসা পায় না।

যুক্তিটা জীবানন্দ এক কথায় মানিয়া লইতে পারিলেন না। তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তুমি বারণ না করলেও ওরা এগুত না। বলিতে বলিতে সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসিলেন। উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি অসুখ করেছে মা, না সারারাত ঘুম

হয় নি?

হাসিমুখে মঞ্জুষা প্রত্যুত্তর করিল, এ কথা কেন বাবা—আমি ত আজ বরং অনেকটা বেশীই ঘুমিয়ে নিয়েছি।

জীবানন্দ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, সব দিকে আর তেমন দৃষ্টি রাখতে পারি না বলে তোরা সবাই মিলে আমায় যদি ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিস তা হলে আমি যাই কোথা বলত মা।

বাধা দিয়া মঞ্জুষা প্রত্যুত্তর করিল, মিথ্যা দুর্ভাবনা করলে আমরাই বা কি করতে পারি বাবা।

জীবানন্দ অদ্ভুত ভঙ্গীতে একটু হাসিয়া বলিলেন, আমি কিছুই বুঝি না—আমি মিথ্যা দুর্ভাবনা করি, কিন্তু আয়নায় একবার নিজের মুখ দেখে এসে আমার কথার জবাব দিও মঞ্জু। আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আজ তোমার মা বেঁচে নেই।

মঞ্জুষা শান্ত কণ্ঠে বলিল, তাছাড়া শরীর যদি সত্যিই একটু খারাপ হয়ে থাকে তা নিয়ে হৈ চৈ করবার কি আছে। শরীর কি কারুর খারাপ হতে নেই? কিন্তু আর একটা কথাও নয়। তুমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এস। নিতাই এখুনি তোমার চা নিয়ে আসবে।

আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, কই তোমার নিতাই এলো মঞ্জু? সাধে কি আর রাগ করি।

একটু হাসিয়া মঞ্জুষা বলিল, তোমার মেজাজ ভাল নেই বাবা, নইলে নিতাই মোটেই দেরী করে নি। ঐ ত সে এসে পড়েছে।

নিতাই ঘরে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে চায়ের সরঞ্জাম টেবিলের উপর রাখিয়া প্রস্থান করিল।

মঞ্জুষা চা তৈরি করিতে করিতে মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, মা বেঁচে থাকতে কোনদিন বোধ হয় আমাদের কথা নিয়ে তুমি এত চিন্তা কর নি, বাবা? এ সব কথা কেন যে তুমি বার বার বল আমি বুঝি না।

মঞ্জুষার কণ্ঠস্বর করুণ মনে হইল। জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, চিন্তা ভাবনার অংশীদার থাকলে মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়, কিন্তু তুমি দুঃখ পাবে জানলে এ কথা বলতাম না মা।

মঞ্জুষার মুখে হাসি দেখা দিল। এ হাসির ধরণ আলাদা। মৃদু কণ্ঠে সে

প্রতিবাদ জানাইল, আমি কিন্তু উল্টো বুঝি। মা চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখ এ পর্য্যন্ত অনেক পেলে কিনা বাবা।

জীবানন্দ গভীর স্নেহে কিয়ৎক্ষণ মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, দুঃখকে আমি কোন দিনই ভয় করি নি, কিন্তু আমার জীবনে এই মর্ম্মান্তিক পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না মঞ্জু—কথাটা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারছি না। তোর দিকে চোখ পড়লেই নিজেকে আমার সবচেয়ে বড় অপরাধী বলে মনে হয়।

মঞ্জুষা অস্বাভাবিক ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কিন্তু আমি ত বেশ আছি বাবা।

জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। মঞ্জুষা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু এ কেমন হাসি! তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে যেন আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন, ভাল বৈকি খুব ভাল—কিন্তু এ আর আমি চলতে দিতে পারি না—

মঞ্জুষা বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি বলছ বাবা?

জীবানন্দ যথাসম্ভব সহজভাবে বলিলেন, আর কারু কথা আমি শুনব না মঞ্জু। কারুর বাধা, কোন বিধানকেই গ্রাহ্য করব না। আমাকে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে হবে।

প্রত্যুত্তরে শান্ত কণ্ঠে মঞ্জুষা জবাব দিল, আমার বাবা কোন দিন অন্যায় কাজ করেনও নি, অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দেন নি।

জীবানন্দের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এমনি করে পদে পদে আমার পথ আগলে দাঁড়াস নে মা, আমাকে আর পাপের ভাগী করিস নে মঞ্জু।

মঞ্জুষা আবেগহীন কণ্ঠে বলিল, পাপ না করেও যদি নিজেকে তুমি পাপী মনে করো তবে কথাটা তোমায় জানিয়ে দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি। কিন্তু কিসের জন্য তুমি আমায় নিয়ে হঠাৎ এমন দুশ্চিন্তায় পড়লে বাবা?

জীবানন্দ নীরব।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, কাল মিনুদা চলে যাবার পর থেকেই তুমি চঞ্চল হয়ে উঠেছ, কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না যে, এ বাড়ীর দরজা আমিই তার মুখের উপর বন্ধ করে দিয়েছি।

জীবানন্দ সহসা এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিলেন যে, তাঁহার হাতের ধাক্কায় চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে নিতাই ছুটিয়া আসিল। কি হ'ল দিদিমণি?

মঞ্জুষা নীচু হইয়া কাঁচের টুকরাগুলি একস্থানে জড়ো করিতে করিতে মৃদু কণ্ঠে জানাইল, কিছু নয়, হাত থেকে পড়ে গেছে—

নিতাই বলিল, আপনি সরুন আমি পরিষ্কার করে নিচ্ছি।

মঞ্জুষা তেমনি মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বলিল, এক কথা তোমায় কতবার বলতে হবে নিতাই।

নিতাই সভয়ে প্রস্থান করিল। ভাঙ্গা পেয়ালার টুকরাগুলি পরিষ্কার করাই মঞ্জুষার আসল উদ্দেশ্য নয়—তার নিজের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল এবং পাছে নূতন করিয়া বাবার কাছে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে বসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গা টুকরাগুলি সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অকারণে অনেকটা সময় অতিবাহিত করিয়া এক সময় সে পুনরায় স্থির হইয়া বসিল।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন তার বুকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অতি গোপন কথাটিও জানিয়া লইতে চায়। মঞ্জুষা চোখ নামাইল। জীবানন্দের মুখে ঈষৎ অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, আমার স্নেহান্ধতা আর ভুলের সুযোগ নিয়ে সহজকে তোমরা জটিল করে তুলেছ। আমায় সত্যি করে বল মা যদি কোন পথ খোলা থাকে হয়ত একটা প্রতিকারের উপায় এখনও হতে পারে। আমায় সবাই মিলে পাগল করে তুলো না মঞ্জু।

মঞ্জুষা একটু হাসিল। জীবানন্দ চমকাইয়া উঠিলেন। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার অবাধ্য হবার সুযোগ কোন দিনই তুমি দাও নি—আজও দিও না বাবা। যেখানে আমাদের মর্য্যাদা এবং সম্ভ্রম—

জীবানন্দ কথার মাঝখানে বাধা দিয়া বলিলেন, শুধুই মর্য্যাদা আর সম্ভ্রম মঞ্জু।

মঞ্জুষা জবাব দিল, হয়তো আরও অনেক কিছু বাবা, কিন্তু সব কথা তুমি নাই বা শুনলে। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তোমার মঞ্জুকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই, সে কোন দিন তোমাকে ছোট করবে না।...

জীবানন্দ নীরব। মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, আমি বরং দেখছি বিয়েটা শেষ পর্য্যন্ত না হয়ে ভালই হয়েছে। নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যেতে পারব।

জীবানন্দ ডাকিলেন, মঞ্জু—

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, তোমায় মিথ্যে বলছি না বাবা। তোমাদের দিকে

চেয়ে চেয়ে আমার এ বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হচ্ছে দিন দিন। কত দুশ্চিন্তা, কত দুর্ভাবনা। একটু শান্তিতে থাকবারও কি যো আছে।

জীবানন্দ পুনঃ পুনঃ মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, কথাটা ঠিক হ'ল না মঞ্জু। এই দুর্ভাবনার মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকবার অনেকখানি তাগিদ রয়েছে এ কথা বুঝবার দিন যদি তোর আসত তা হলে বুড়ো বাপের মুখ এমন করে বন্ধ করে দিতে পারতিস নে মা।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, তা বলে যে দিন এখনো আসে নি তার জন্য অনর্থক দুঃখ করতেও আমি পারব না, কিন্তু তুমি কি আজ কিছুতেই থামবে না বাবা?

জীবানন্দ বলিলেন, থেমেই ত এতদিন ছিলাম মা, কিন্তু মৃন্ময়ের দেখা পেয়ে আবার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—

কিছু একটা জবাব দিবার জন্যই মঞ্জুষা মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু বামুনদিদিকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া সে থামিল। বামুনদিদি কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই মঞ্জুষা কহিল, বাবা কি থাবেন এই কথা ত? কাল যা খেয়েছেন আজও তাই থাবেন।

বামুনদিদি কিছু বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মঞ্জুষা পুনরায় কহিল, কখন কি বলেছি তাই মনে করে বসে আছ বুঝি? আজ আমার শরীরটে ভাল নেই, বকতে পারছি না।

বামুনদিদি চলিয়া যাইতে মঞ্জুষা স্থির হইয়া বসিল।

জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, সবই বুঝি মা, কিন্তু তবুও না ভেবে ত পারছি না। সেই থেকে ক্রমাগতই ভাবছি।

মঞ্জুষা সহসা বলিয়া বসিল, আর সেইজন্যই রাত দুটো পর্য্যন্ত তোমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখা যায়—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু মঞ্জুষা সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ তাহার ঘরে যে সারা রাত আলো জ্বলিয়াছে সে প্রশ্ন উঠিলে কি জবাব···কথাটা মঞ্জুষা শেষ পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখিবারও অবকাশ পাইল না। কথার মাঝখানে থামাইয়া দিয়া জীবানন্দ পালটা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, তোমার কথা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এমনি করে আর কত দিন নিজেকে গোপন করে রাখা যায় মা! শুধু বুড়ো বাপের উপর চোখ রাখবার জন্যই তোমাকেও অত রাত জেগে বসে থাকতে হয়েছিল, এই কথাটাই কি আমাকে বিশ্বাস করতে বল?

একটু থামিয়া তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, নিজের উপর বিশ্বাস আমার শিথিল হয়ে পড়েছিল বলেই চুপ করে ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি অন্যায় তাতে ক্রমাগত শুধু বেড়েই চলেছে—

মঞ্জুষা জোর করিয়া খানিক হাসিয়া বলিল, জোর করে মরা গাছে ফুল ফোটানো যায় না। নইলে আমার কথা আমার চেয়ে বেশী আর কে বুঝবে বাবা। আমি আজ আর ছেলেমানুষ নই। একটু ভেবে দেখলে এ কথা তুমিও স্বীকার করবে, কিন্তু কত বেলা হ'ল দেখেছ—আমার এখনও ঢের কাজ বাকী। বলিয়া সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা বন্ধ করিয়া দিয়া মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।



জোর করিয়া তখনকার মত জীবানন্দের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই সব সমস্যা মিটিয়া যাইতে পারে না। মঞ্জুষা অনেক কথাই বলিয়া গেল, তথাপি মৃন্ময় সম্বন্ধে তাহার মনের আসল ধারণাটা যেন ঠিক স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। যতই আশ্বাসবাণী সে শুনাক না কেন, জীবানন্দ অকুণ্ঠ চিত্তে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। মানুষ এমনি করিয়া বাঁচিতে পারে না। তাঁর মত বৃদ্ধেরই এই একঘেয়ে কর্ম্মহীন জীবনযাপনে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে। আর মঞ্জুষা ত নিতান্তই ছেলেমানুষ। সম্মুখে তার সারাটা জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। মঞ্জুষার যে বয়স তার একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। এই সব কথা তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন না—ভুলিয়া যাওয়া উচিতও নহে। অথচ এমনি দুর্ভাগ্য যে, তিনি নিজের স্থির সিদ্ধান্তেও অবিচল থাকিতে পারেন না। মঞ্জুষা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেই সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। নিজের কোন মতকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। মঞ্জুষার ইচ্ছার কাছে হার মানিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া চলেন। তাঁর কাছে মঞ্জুষা খানিকটা দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে মৃন্ময়ের স্মৃতিকে মঞ্জুষা সযত্নে লালন করিয়া চলিয়াছে। তার প্রতিদিনের চিন্তার সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া আছে—মনের কোণে ভাসিয়া ওঠে তার অতীত জীবনের ছোট বড় অসংখ্য স্মৃতি। একটি কাল্পনিক সংসারের মনোরম একখানি ছবি তার মনে রং ধরাইয়া দেয়। চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া ওঠে তাদের গ্রামের বাড়ী, বাগান, দেউড়ি যেখানে পাহারা দিত

চোবে। আর ফ্রকপরা ছোট মেয়ে মঞ্জু নাচিয়া খেলিয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত। মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল।···কত বড় বিরাট পরিবর্ত্তন এই সামান্য কয়টা বৎসরের ব্যবধানে ঘটিয়া গেল।

সেদিনের মঞ্জু পদ্মার জলের ঢেউয়ের তালে তালে নৃত্য করিত, খিল খিল করিয়া হাসিতে পারিত। গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া ছবির বই দেখিত। মৃন্ময় গাছে চড়িয়া তাহার জন্য পেয়ারা পাড়িত। মঞ্জু তার গায়ের উপর পেয়ারা ছুড়িয়া দিয়া বলিত, ছুয়ো—সে ছিল একদিন। তার পর···

মঞ্জুষা সহসা যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। বহুক্ষণ সে কাজের অছিলায় তার বাবার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কাজের মধ্যেও এই দীর্ঘ সময় সে শুধু বাজে চিন্তা করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে।···

বাজে চিন্তা—যে চিন্তার ছোঁয়া লাগিলেই আজও তার মনের দুই তীর প্লাবিত হইয়া যায় তার কি সত্যই কোন মূল্য নাই ?

মঞ্জুষা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। কিন্তু সে দিনে আর আজিকার দিনে কত প্রভেদ।

মনে পড়ে, মৃন্ময়ের সামান্য একটা ইচ্ছাকে পূরণ করিবার নিমিত্ত সে নিজেকেও ভুলিয়া যাইত। নহিলে তার জন্য একটা জলপদ্ম তুলিতে গিয়া সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে পারিত না।

অপরিণত বয়সের সে ঘটনার কথা আলোচনা করিতে গিয়া একদিন মৃন্ময় বলিয়াছিল, কত সামান্য কারণে তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলে—আজ কিন্তু সে কথা ভাবতেও ভয় হয়। যুক্তি-বিচার বলে 'ছেলেমানুষী'। এই মুহূর্ত্তে ওর চেয়ে ঢের ঢের বড় কারণেও হয়ত এ কাজ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সেদিনের এই কথায় প্রকাশ্যে কোন প্রকার প্রতিবাদ না করিলেও মনে মনে মঞ্জুষা বিরক্ত হইয়াছিল এবং তার যুক্তিকে অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া অন্তরে বেদনা বোধও করিয়াছিল। বহুদিন পরে আজ আবার সেই কথাটিই চিন্তা করিতে গিয়া মনে হইতেছে যে, মৃন্ময় হয়ত একেবারে মিথ্যা বলে নাই। যুক্তি-বিচারটাই যদি আজ তাদের জীবনে বড় হইয়া না উঠিত তাহা হইলে এই সব চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজনই দেখা দিত না। অথচ সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় যে, সব জানিয়া বুঝিয়াও কোন একটা সহজ পথে সে অগ্রসর হইতে পারিল না। বিশ্লেষণের গোলকধাঁধায় পড়িয়া শুধু লক্ষ্যহারার মত ঘুরিয়া

মরিতেছে।

তার জীবনের বর্ত্তমান পরিণতির জন্য মঞ্জুষা কাহাকেও এক বিন্দু অনুযোগ দিতে চাহে না। শুধু সে নিজের ভাবে চলিতে পারিলেই সন্তুষ্ট—নূতন পথে কোন কিছু চিন্তা করিতেও আজ আর তার ভাল লাগে না অথচ তার বাবার ইঙ্গিতকেও এক কথায় উড়াইয়া দিতে পারে না।

দেয়াল-ঘড়ির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকাইয়া উঠিল, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে—আর এখনও কোন কাজেই সে হাত দেয় নাই। মঞ্জুষা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু নড়িতে চড়িতেও কেমন সে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল। পুনরায় বসিবার উপক্রম করিতেই বামুনদিদি আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, বড়বাবুর খাওয়ার সময় হ'ল কিন্তু দিদিমণি।

মঞ্জুষা অকারণে একটু লজ্জিত হইল, বলিল, সব কাজেই আজ কেমন দেরী হয়ে যাচ্ছে। শরীরটে মোটেই ভাল নেই বামুনদিদি। কিন্তু তুমি যাও আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।

বামুনদিদি চলিয়া গেল এবং মঞ্জুষাকেও অল্পক্ষণ পরেই স্নানের ঘরে দেখা গেল।

বহুক্ষণ ধরিয়া মাথায় সে জলের ধারা দিল। স্নানান্তে মঞ্জুষা পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল।

কাপড় ছাড়িয়া চুল আঁচড়াইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আবার ঘরে আসিয়া হাজির হইল, কিন্তু সেখানে দু'জনের খাবার ব্যবস্থা দেখিয়া মঞ্জুষা তার বাবাকে প্রশ্ন করিল, আর কেউ খাবে এ কথা আমায় ত তুমি আগে বল নি বাবা।

জীবানন্দ বেশ খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, আর কাউকে বলা হয় নি বলেই তোমায় জানানো হয় নি।

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে দুটো আসনে কি হবে বাবা?

জীবানন্দ জবাব দিলেন, আজ থেকে তোমাকেও আমার কাছে বসে খেতে হবে মঞ্জু।

মঞ্জুষা মৃদু আপত্তি করিয়া বলিল, এ ব্যবস্থায় তোমার যে বড় কষ্ট হবে বাবা। মাঝখান থেকে তোমারও খাওয়া হবে না, আমারও নয়—

জীবানন্দ প্রতিবাদ জানাইলেন, এই ব্যবস্থাই চিরদিন ছিল যে মঞ্জু। মাঝের কয়েকটা বছরে যা কিছু বদলে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ মঞ্জুষার মা মারা যাবার পর হইতেই সে পূর্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া

ছিল। বাল্যকাল হইতেই সে দেখিয়া আসিয়াছে তার মাকে বাবার খাওয়ার তদারক করতে। বাপ এবং মেয়ে খাইতে বসিলে মা আসিয়া সেখানে বসিয়া থাকিতেন—এই খাওয়া এবং খাওয়ানোর মধ্যে যে একটি গভীর পরিতৃপ্তির যোগ ছিল একথা মঞ্জুষা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিতে শিখিয়াছে। মায়ের মৃত্যুর পরে সেবায় যত্নে সেই অভাবটা যথাসম্ভব পূরণ করিবার চেষ্টা সে করিয়া আসিতেছে। জীবানন্দ কোন দিন আপত্তি করেন নাই, বরং খুশীমনেই মঞ্জুষার এই ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়াছেন। আজ অকস্মাৎ কেন যে তাঁর মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল ইহা সঠিক অনুমান করিতে না পারিলেও কি জানি কেন মঞ্জুষার মনটা ভরিয়া উঠিল। সে সহাস্যে কহিল, বেশ ত এতেই যদি তুমি খুশী হও না হয় দু'জনেই আমরা দু'জনকে এবার থেকে দেখব.।

জীবনন্দ খুশীর সুরে বলিলেন, খুব ভাল কথা মা—অতি উত্তম প্রস্তাব।...

মঞ্জুষা হাসিয়া কহিল, কথাটা মনে রেখো বাবা—নইলে আমি অনর্থ বাধাব।...

বামুনদিদির সহিত নিতাইকেও খাবার লইয়া আসিতে দেখা গেল।

মঞ্জুষা হাসিয়া বলিল, এবারে খেতে সুরু করো বাবা।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ পুনরায় কহিয়া উঠিলেন, ভাবছিলাম দিনকয়েকের জন্য অন্য কোথাও ঘুরে আসি—তুমি কি বলো মা ?

বেশত বাবা, মঞ্জুষা বলিল। কিন্তু কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ ?

জীবানন্দ বলিলেন, একবার দেশের বাড়ীতে যাব ভাবছিলাম, ম্যানেজার-বাবুও বার বার লিখছেন। দিন দিন গোলমাল শুধু বেড়েই চলেছে আর আমি একবার গিয়ে পড়লে নাকি অবস্থাটা কিছু আয়ত্তে আসবে।

মঞ্জুষা বলিল, তুমিও কি তাই বিশ্বাস করো বাবা ?

জীবানন্দ বলিলেন, অবস্থাটা যতক্ষণ নিজের চোখে না দেখছি ততক্ষণ বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না। তবে আমার মনে হয়—

মঞ্জুষা হাত তুলিয়া বাধা দিল, না আর একটি কথাও নয়—তুমি খাওয়া ফেলে শুধু কথাই বলে চলেছ। সে থামিল এবং অদূরে দণ্ডায়মানা বামুনদিদিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, খাসা হয়েছে মোচার ঘণ্টটি, বাবার জন্য আর খানিকটা নিয়ে এসো।

বামুনদিদি হাসিয়া প্রস্থান করিল।

খাওয়া দাওয়ার পরে জীবানন্দ পুনরায় একই প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি গেলেও খুব যে বেশী সুবিধে হবে এ আমার মনে হয় না বাবা। দেশ বিভাগের দরুন ব্যক্তিগত ভাবে আমরা অনেককিছু হারালেও আত্মসম্মানটুকু বজায় রাখতে পেরেছি, কিন্তু গ্রামে গেলে সেখান থেকে মান-সম্ভ্রম নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হবে বলে তুমি কি বিশ্বাস করো বাবা? তা ছাড়া কিসের মোহে সেখানে ফিরে যাবে—বাস্তুভিটা আর সামান্য কিছু জমি-জমা এই তো?···

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, সেদিন তুমি আমার উপর রাগ করেই আমাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ বিক্রী করেছিলে। তোমার মত আমিও দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে, অনেক বড় দুঃখের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই সেদিনের সে দুঃখটা ভগবান আমাদের দিয়েছিলেন।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এটা হ'ল যুক্তির কথা। অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু মন যে সব সময় যুক্তির ধার ধারে না, তাই তো ম্যানেজারের চিঠি পাবার পর থেকেই মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। তা ছাড়া বয়েসটা দিন দিন বেড়েই চলেছে কিনা—এর পরে হয়তো চোখে দেখার ইচ্ছেটাও পূর্ণ হবে না—

মঞ্জুষা নীরব।

জীবানন্দ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, মান অপমানের কথা মনেই আসে না মঞ্জু। গ্রামের সঙ্গে যে আমার নাড়ীর সম্বন্ধ মা—তাই থেকে থেকে মনটা কেঁদে ওঠে। এর পরে হয় তো আমার বলে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবার অধিকারও আর থাকবে না।···

জীবানন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মঞ্জুষা ঈষৎ চমকাইয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল, এ সব কথা কেন বাবা? তোমাকে যেতে ত আমি মানা করছি না, শুধু বর্ত্তমান অবস্থার কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, নইলে আমারই কি যেতে ইচ্ছে হয় না মনে করো তুমি?

জীবানন্দ খুশী হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তবে আমায় এত কথা বলছ কেন মঞ্জু—তা হলে আর দেরী করে কাজ নেই। কি বলো মা?

মঞ্জুষা তার বাবার কথার ধরনে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, মনে হচ্ছে তোমার এখুনি রওনা হতেও আপত্তি নেই বাবা।

প্রশান্ত হাসিতে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, কথাটা একেবারে মিথ্যে বলো নি তুমি।

মঞ্জুষা ভাবিল, ইহা এক প্রকার মন্দের ভাল হইল। মৃন্ময়কে কেন্দ্র করিয়া তাহার বাবা হঠাৎ যে ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহাতে মঞ্জুষাও যেন মনে মনে অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। অথচ ভবিষ্যতের একটি সহজ এবং সুন্দর পরিণতির কথা সে কল্পনায়ও আনিতে পারিতেছে না। তার চলার পথ নানা জটিলতায় আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার পথে সে একলাই চলিতে চাহে। আর কাহাকেও টানিয়া আনিতে পারিবে না—মৃন্ময়কে ত কোনক্রমেই নয়। বাবা বোঝেন না। স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছে। তাঁহার কাছে শুধু একটা কথাই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মঞ্জুষার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তার কাছে মৃন্ময় আজ প্রয়োজনের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সে বাহিরেই থাকুক। কাছে আসিয়া কোন কারণেও যদি সে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে না পারে মঞ্জুষা তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারিবে না। এইখানেই তার সবচেয়ে বড় দ্বিধা—মর্ম্মান্তিক ভয়। পাছে নান্কুর সহিত তাহার বিবাহ-প্রহসনটাই আবার নূতন করিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়া বসে এইজন্যই মঞ্জুষা এমন সতর্কতার সহিত মৃন্ময়কে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু এ সব কথা সে বলিবে কাহাকে।

মেয়ের চিন্তাকুল মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া জীবানন্দ এক সময় কহিয়া উঠিলেন, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে তা হলে না হয় যাওয়া বন্ধ করে দাও মা।

মঞ্জুষা একটু হাসিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, গ্রামে যাবার ইচ্ছে তোমার চেয়ে আমার কিছুমাত্র কম নয়—আমি অন্য কথা ভাবছিলাম, কিন্তু এবারে তুমি একটু বিশ্রাম নাও। বলিয়াই ধীরে ধীরে মঞ্জুষা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে জীবানন্দ তাঁর গ্রামের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু যে আশা ও উৎসাহ লইয়া তিনি এখানে আসিয়াছিলেন তাহার এক বিন্দুও আর অবশিষ্ট নাই। আসলে তিনি জমিদারীসংক্রান্ত কোন কাজ করিবার জন্য এখানে আসেন নাই। মনে মনে আর একটি গোপন আশা তিনি পোষণ করিতেছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এখানে আসিয়া হয়ত মৃন্ময়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে এবং সম্ভব হইলে তিনি নিজের ত্রুটি শোধরাইয়া লইবেন, কিন্তু

অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, প্রতুল বহুদিন পূর্ব্বেই গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন সে খবর কেহই রাখে না। মঞ্জুষা বলে, খবরটা সে পূর্ব্বেই জানিত, কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়াই সে প্রকাশ করে নাই। জীবানন্দ অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাদের কোন খোঁজখবর লন নাই—কতকটা লজ্জা ও আত্মগ্লানির দরুন। তাহা ছাড়া নিজেকে লইয়া তিনি এমন ডুবিয়া ছিলেন যে, আশেপাশে দৃষ্টিপাত করিতেও তাঁর মন চাহে নাই। কিন্তু যখন একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্প লইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন তখন তাঁর পায়ের তলা হইতে মাটি যেন সরিয়া গেল। জীবানন্দ দুঃখিত হইলেও বিস্মিত হইলেন না। তাঁর জীবনে ইহাই আজ সত্য। নিষ্ফলতা এবং ব্যর্থতাই তাঁর অদৃষ্টলিপি। কিন্তু মঞ্জুষার পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান। যাহাকে লইয়া তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি নাই সে কেমন করিয়া এমন নির্ব্বিকার স্বাচ্ছন্দ্যে কাজকর্ম্ম করিতে পারে!

ইতিমধ্যে বহু পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব আসিয়া জীবানন্দের সহিত দেখা করিয়া গিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আর বোধ হয় এখানে থাকা সম্ভব হইবে না—এ কথাটাও তাঁহারা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। জীবানন্দ কোন জবাব দিতে পারেন নাই। বহুদিন তিনি গ্রামছাড়া। দেশবিভাগের শোচনীয় কুফল যে পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া গিয়াছেন। মঞ্জুষা কিন্তু এই সামান্য কয়টা দিনের মধ্যেই বহু বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ও যাহা বলে তাহা কেমন যেন ভাসা ভাসা।

মঞ্জুষা বলে, যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চান তাঁদের যাওয়াই উচিত, কিন্তু যাঁদের থাকবার মত সাহস আছে তাঁদের কোনমতেই পিতৃভূমি ত্যাগ করা ঠিক হবে না।

জীবানন্দ জবাব দেন, কিন্তু ওঁরা যে বলেন আত্মসম্মান বজায় রেখে এখানে বাস করা সম্ভব নয়।

মঞ্জুষা বলিল, তাঁরা হয়তো মিথ্যে বলেন না। স্বাধীনতার বাস্তব রূপের সঙ্গে এদের প্রকৃত পরিচয় নেই বলেই এমনটি ঘটছে। একটু থামিয়া মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, আমাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত না করলে চলবে কেন বাবা। কিন্তু যে আত্মসম্মানের দোহাই তাঁরা দিচ্ছেন তা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও কতখানি

বজায় থাকবে সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তুমি দেখ নি, কিন্তু আমার দেখার সুযোগ হয়েছে যে, কত সুখে আর কি ভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে তারা দিন কাটাচ্চে!

জীবানন্দ বলিলেন, সকলের মান-অপমান বোধও একই ধরণের নয়, সকলের চিন্তাধারাও একরকম হতে পারে না।

মঞ্জুষা বলিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাবা। সকলের জন্য যে এক ব্যবস্থা হতে পারে না তা স্বীকার করি। আর তারই জন্মে বলছিলাম যে, যারা একান্তই যেতে ইচ্ছুক তাদের যাওয়াই উচিত, কিন্তু যারা পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকটা অসম্মানজনক বলে মনে করে তারা যাবে না। কিন্তু আমার মনে হয় বাবা, এ অবস্থা বেশাদিন চলতে পারে না। পরিবর্ত্তন আসবেই, তা যে পথ ধরেই দেখা দিক না কেন।

জীবানন্দ বলিলেন, সেই আশায় বসে থাকতে গিয়ে এদের অস্তিত্ব যদি লোপ পেয়ে যায়?

মঞ্জুষা বলিল, আমরা আজ মধ্যযুগেও বাস করছি না, বিদেশীর শাসনাধীনেও নেই এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা। আর যদি যায়ই তবে যাক না—ওদের চিতার আগুনে যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠবে তাতে সকল অন্যায় সকল অবিচারের অবসান হবে।

জীবানন্দ বলিলেন, তোমার এ অভিযোগ কার বিরুদ্ধে মঞ্জু?

মঞ্জুষা কহিল, অভিযোগ আমাদের সকলের বিরুদ্ধে। নইলে একা রাষ্ট্রের কতটুকু ক্ষমতা। আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে নিজেরাই ডেকে আনি। তার-পরে তারস্বরে চীৎকার সুরু করি। দেশ স্বাধীন হয়ে এইটেই যেন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মজা এমনি যে, নিজেদের শক্তি এবং সামর্থ্যকে আমরা কোন কাজেই লাগাতে চাই না। এটা হ'ল না, আর সেটা হ'ল না এই নিয়ে আমাদের নালিশের অন্ত নেই, কিন্তু কি করলে কাজ হবে তার জন্মে নিজেদের উদ্যম নেই। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা করে দাও আমরা ফলভোগ করি। এ ভিক্ষার মনোবৃত্তিকে মোটেই সমর্থন করা যায় না বাবা।

মঞ্জুষা থামিল। জীবানন্দ নীরব। মঞ্জুষার এই কথাগুলি তার মাথার মধ্যে তখনও পাক খাইতেছে।

বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। সহসা পড়ন্ত রোদের পানে দৃষ্টি পড়িতেই মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল, বলিল, আমাকে এখুনি একবার বেরুতে হবে—আমি

ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যেও না বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন, এই অসময়ে আবার কোথায় যাবে মঞ্জু ?

মঞ্জুষা বলিল, একবার রাধু বোষ্টমের ওখানে। সেখান থেকে নমঃশূদ্র পাড়ায়।

জীবানন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, সেখানে আবার কি দরকার তোমার মঞ্জু!

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, দরকার একটু আছে বাবা। ভারি চমৎকার একটা মতলব মাথায় এসেছে, তোমায় পরে বলব।

জীবানন্দ বাধা দিলেন। মঞ্জুষা হাসিমুখে কহিল, শুভ কাজে পিছু ডাকলে তো বাবা।

জীবানন্দ কথাটা কানে না তুলিয়া বলিলেন, চোবেকে সঙ্গে নিও, একলা কোথাও যেও না মঞ্জু।

মঞ্জুষা বলিল, আচ্ছা বাবা।···কিন্তু সে ভাবিল যে সব কথা লোকমুখে শোনা যায় তা যদি সত্য হয় তবে চোবেকে সঙ্গে লওয়া আর না লওয়া একই কথা। কিন্তু মন সব কথা বোঝে না। মঞ্জুষার পিছু পিছু জীবানন্দ বাহির হইয়া আসিলেন। চোবেকে ডাকিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন। মঞ্জুষা প্রস্থান করিলে তিনি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিলেন।

বাহিরে কোথায় একটা পাখী অনবরত ডাকিতেছে। জীবানন্দ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। এখানে থাকিতে আর মন চায় না। অতীতের সহস্র স্মৃতি তাঁহাকে যেন পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর মঞ্জুষা আবার একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া না বসে। বর্ত্তমান পরিবেশে অতীতের প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কাজে লাগিবে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। মঞ্জুষার সব কথা তিনি ভাল বোঝেন না—কোথায় যেন একটা ফাঁক রহিয়াছে। তবুও তিনি প্রতিবাদ করিতে পারিতেছেন না। করিবার পথও নাই।

অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ তাঁর নিজের দেশ পররাষ্ট্র, সেখানে তাঁর ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে অপরের দাক্ষিণ্যের উপর। ম্যানেজারবাবু বলেন, তাঁর চরকান্দির প্রজারা নাকি খাজনা বন্ধ করিয়াছে। জমিদার তলব করিয়াছে শুনিয়া খবর পাঠাইয়াছে যে, জমীদারের দরকার থাকিলে নিজেই যেন আসে। জমিদারবাড়ী যাইবার তাহাদের সময় নাই।

ক্রোধে জীবানন্দ জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ম্যানেজার বাধা দিয়াছেন—

সেই সঙ্গে মঞ্জুষাও যোগ দিয়াছে। ইহাতে লাভের চেয়ে লোকসানই নাকি বেশী হইবে। যেদিকে তাকানো যায় কোথাও বিন্দুমাত্র শৃঙ্খলা নজরে পড়ে না। চতুর্দ্দিকে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। ইহার শেষ কোথায় কে জানে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস মানুষ একদিনেই ভুলিতে পারে না, ভোলা সম্ভবও নয়। দুঃখ পাইতে হয় বাস্তবের সম্মুখীন হইয়া। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই—মানিয়া লইতে আটকায়। তাই তো অর্জ্জনের আনন্দকে ছাপাইয়া বর্জ্জনের বেদনাটাই এত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

মঞ্জুষা জানাইয়াছে, প্রতুল গিয়াছে তার বড়ছেলের কাছে পশ্চিমের কোন একটা শহরে।···অনেক দুঃখেই সে হয়ত গিয়াছে। তাহাকেও আবার যাইতে হইবে। এই যাওয়াই হয়ত শেষ যাওয়া। জীবানন্দ ঘুরিয়া ফিরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে বাড়ীখানি দেখিতেছেন। একটা বিচিত্র অনুভূতি তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সেই প্রশস্ত চাতাল যেখানে পুণ্যাহের সময় তাঁর প্রজারা নজরানা লইয়া জোড়হাতে আসিয়া সমবেত হইত। সেদিনের সঙ্গে আজিকার কত প্রভেদ! জীবানন্দ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এমন জানিলে তিনি এখানে আসিতেন না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। মঞ্জুষা এখনও ফিরিয়া আসে নাই। জবীনন্দ বাড়ীর পিছন দিক্‌কার বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নামেই শুধু বাগান—চতুর্দ্দিক আগাছায় পূর্ণ হইয়া আছে। মঞ্জুর সখের ফুলবাগান আজ সম্পূর্ণরূপে হতশ্রী। জীবানন্দ আশ্চর্য্য হইয়া যান। বাড়ীর সে সৌন্দর্য্যও আর নাই। বালি খসিয়া, চূণ ঝরিয়া বিশ্রী আকার ধারণ করিয়াছে।

তাঁর ভিটাবাড়ীর প্রজা বসির হইয়াছে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বুদ্ধি আছে। লোকের সঙ্গে কথা বলিতে জানে।

উপযাচক হইয়া সে দেখা করিয়া গিয়াছে। অভয় দিয়া বলিয়াছে, আপনারা যাবেন না বাবুমশাই। মুই আছি কেনে। আসলে স্থাসটাই ভাগ হইছে। মনডাতো আর ভাগ হয় নাই।

কথাগুলি শুনিতে ভালই লাগে, কিন্তু বসিরের উক্তিতে প্রচ্ছন্ন মুরুব্বিয়ানার ভাবটি জীবানন্দ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জীবানন্দ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মঞ্জুষা এখনও ফিরিল না। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। গ্রামের লক্ষ্মীশ্রী যেন লোপ পাইয়া গিয়াছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়—সবই মোটামুটি এক রকম ঠিক আছে

অথচ সর্ব্বত্রই একটা ছাড়া-ভাঙা ভাব। পথে ক্বচিৎ কখনো দুই-চারি জন পথচারীর দেখা মিলে। কোথাও কর্ম্মচাঞ্চল্য নাই। অতীতের একটা কঙ্কাল যেন ভয়াবহ মূর্ত্তিতে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে আসিয়া পদ্মার তীরে উপস্থিত হইলেন। নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া পুরাতন স্বপ্নের আবেশে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। নদীর এখানে-সেখানে চর আজ মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। বর্ষায় নদী আবার যৌবন ফিরিয়া পাইবে। প্রচণ্ড আবেগে চারিদিক প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিবে।

জীবানন্দ একটি গাছের নীচে আসিয়া বসিলেন। দুই-একখানি নৌকা পাল তুলিয়া বাতাসের অনুকূলে ভাসিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে এই সময় পদ্মার বুকের উপর দিয়া নৌকা-চলাচলের ঘটা পড়িয়া যাইত। লোক-জনের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না—কেনা-বেচার অভাব ছিল না। আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া মানুষে মানুষে গড়িয়া উঠিত একটা সহজ প্রীতির সম্বন্ধ। কিন্তু আজ যেন সকল গতি থামিয়া গিয়াছে—শুধু একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছে—ইহার পরে কি হইবে?

কি হইবে তাহা আজ কল্পনা কারও সহজ নয়। এমনি করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। সন্দেহ আর অবিশ্বাস মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, মানুষের শান্তি মুছিয়া গিয়াছে।

মঞ্জুষা বলে, মানুষের প্রকৃতি কোনদিন আগাগোড়া বদলে যেতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাও পরিবর্ত্তিত হতে পারে না। ক্ষয়ক্ষতির উপরই নূতন আদর্শের জন্ম হয়ে থাকে সর্ব্বত্র। এটাই যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। উপযুক্ত মূল্য না দিলে কোন বড় জিনিসই লাভ হয় না। পাওয়া গেলেও তাতে সত্যিকারের অধিকার জন্মায় না। সেই মূল্যই নাকি আমাদের তিল তিল করে দিতে হচ্ছে।

জীবানন্দ বলিয়াছিলেন, কিন্তু এই মূল্য দিয়ে আমরা কি পেলাম মা।

মঞ্জুষা জবাব দিয়াছিল; সে হিসেবের দিন আজও আসে নি বাবা। হিসেবের খাতায় এখনও শুধু অঙ্কপাতই হচ্ছে।

জীবানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন, চারদিকে এত গোঁজামিল মঞ্জু; হিসেব মিলবে কেমন করে?

মঞ্জুষা বলে, মিলতে হবেই বাবা। একটা ক্রান্তিও বিচারকের দৃষ্টি এড়িয়ে

যাবে না।

যেদিন বাস্তবিকই হিসাব-নিকাশের পালা আসবে সেদিন হয়ত তাহা যাইবে না—জীবানন্দ ভাবেন। কিন্তু অন্তরে তিনি ভরসা পান না। তাঁহার চতুর্দিকে শুধু অন্ধকারের গভীর কালো আস্তরণ। হয়ত মঞ্জুষার কথাই ঠিক।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কবে সে দিনের দেখা মিলবে বলতে পার মঞ্জু ?

মঞ্জুষা বলিয়াছিল, সময় হলেই মিলবে বাবা।

এ কথার কোন জবাবই জীবানন্দ দেন নাই। এমনই একটা ফাঁকা কথাকে তিনি মানিয়া লইবেন কেমন করিয়া—কতকগুলি কথার সমষ্টিমাত্র। বাস্তব জীবনে এগুলির কতটুকু মূল্য আছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, পূর্ণিমার অখণ্ড চাঁদ। জীবানন্দের চিন্তার ঘোর কাটিয়া গেল। মঞ্জুষা এখনও ফিরল না কেন। এই পথেই ফিরিবার কথা। তাহার অগোচরে ফিরিয়া যাইতেও অবশ্য পারে। মঞ্জুষা তাঁহাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া থাকিলে আজ একটা কাণ্ড বাধাইবে। মঞ্জুষাকে আজকাল তিনি রীতিমত ভয় করেন।

জীবানন্দ দ্রুত গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

মঞ্জুষা অনেকক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে রাধু বোষ্টমও আসিয়াছে। খবরটা জীবনন্দ বাড়ীর ফটকেই পাইয়াছেন। তাহারা নাকি এখনও বাহিরের ঘরেই আছে। জীবানন্দ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন এবং মঞ্জুষার অলক্ষ্যে ভিতর-বাড়ীতে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। মঞ্জুষার সম্মুখে পড়িতে তিনি চান না।

মঞ্জুষা তাহার বাবাকে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করিল, কিন্তু ডাকিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিল না। তাঁর এই লুকোচুরি খানিকটা উপভোগ করিল।

রাধু বলিতে লাগিল, জান দিদি, আমার ভাঙ্গা ঘর নূতন করে বেঁধেছি বলেই বোধ হয়, এত বেশী দ্বিধা করছি তাকে আবার ভেঙে ফেলতে।

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু আর কতদিন এভাবে চলবে বোষ্টমদা। দুঃখকষ্ট সহ্য করে থাকা এক কথা, কিন্তু উপোস করে মানুষ থাকতে পারে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি কাজ দেব, তুমি কাজ করবে, তার বদলে

নেবে পারিশ্রমিক। তুমি বলছিলে না আমাদের গ্রামের বহু পরিবার কোথাকার কোন্ আশ্রয়-শিবিরে গিয়ে আছে—তাদের চলে কি করে তুমি বলতে পার?

মঞ্জুষার মুখের পানে খানিক স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া রাধু জবাব দিল, কায়ক্লেশে, অপরের দয়ায়। শুনতে পাই আজকাল তাও জোটে না। যত দিন পয়সা ছিল ভেঙে খেয়েছে, তার পরে চলেছে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এখন একেবারে অচল অবস্থায় এসে পৌছেছে। সকলের বাড়া দুর্গতি হয়েছে গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের। শুনতে পাই তাদের অভাবের ছিদ্রপথ লক্ষ্য করে দালালরা ঘোরাফেরা করে থাকে।

মঞ্জুষা শিহরিয়া উঠিল।

রাধু বলিল, আমাদের রাষ্ট্রে আসল গলদ কোথায় তা বুঝি না, বুঝবার মত বিদ্যাবুদ্ধিও নেই—

মঞ্জুষা বাধা দিয়া কহিল, এই একটা কথাই যত্রতত্র শুনতে পাই। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভালমন্দ নিয়েই দুনিয়া। রাষ্ট্র নির্ভুল কাজ করছে এমন কথাও বলছি না, কিন্তু সব কাজ রাষ্ট্র করে দেবে এ কথনও সম্ভব নয়। আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে, নইলে সমস্যা চিরদিন সমস্যাই থেকে যাবে—সমাধান তার ইহজন্মে হবে না বোষ্টমদা।

রাধু হাসিমুখে বলিল, এ সব বড় বড় কথা সব সময় আমার মাথায় ঢোকে না দিদি।

মঞ্জুষা কহিল, না বোঝার ভান করো না। আমাদের সামনে আজ এইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা। মরণ-বাঁচনের সমস্যা। নইলে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে।

রাধু বলিল, তোমার গ্রামের মাত্র দু'চারটি পরিবারকে নিয়েই ত আজ এ সমস্যা দেখা দেয় নি। তুমি একলা এগিয়ে গিয়ে কতটুকু করতে পারবে দিদি?

মঞ্জুষা বলিল, কথাটা তুমি একেবারে মিথ্যে বলো নি। সত্যিই তো প্রয়োজনের তুলনায় তোমার আমার শক্তি কতটুকু, কিন্তু একার চেষ্টায়ও যদি পথ একটা আবিষ্কার করতে পারি আর সে পথ যদি কল্যাণের পথ হয় তবে হয়ত আর দশজনকেও আমার পাশে পাব—

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, আর যদি কেউ এগিয়ে নাই আসে তাতেই বা কি ক্ষতি। আমাদের চেষ্টায় দুটো পরিবারও যদি মানুষের

মত বাঁচতে পারে তার মূল্যও ত কম নয়। জান বোষ্টমদা, গান্ধীজী এই দেশকে ঠিকই চিনেছিলেন, কিন্তু দেশবাসী তাকে বোঝে নি তাই তাঁর আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও তাঁর নির্দ্দেশিত পথে তারা চলতে পারছে না। মত আর পথ দুটো আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের বেঁচে থাকার সব উপকরণ নিজেদের মধ্যেই আবিষ্কার করতে হবে।

রাধু বলিল, সেদিন এক ভদ্রলোক কি বলছিলেন জান দিদি—বর্ত্তমান জগতে নাকি এ সব একেবারে অচল। ওসব আদর্শ টাদর্শ নাকি স্রেফ কথার কারসাজি।

মঞ্জুষা কহিল, মিথ্যা আর প্রবঞ্চনায় যে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস বিষিয়ে গেছে বোষ্টমদা। নইলে এমন কথা কেউ বলতে পারত না। সত্য চিরদিনই সত্য। কিন্তু আমার কথাটা শুধু আদর্শ নিয়ে নয়, আমি দেশের বিলুপ্ত-প্রায় কুটিরশিল্পের কথা বলতে চাইছিলাম।

রাধু বলিল, যা লোপ পেতে বসেছে তাকে বাঁচিয়ে তুলবে কেমন করে দিদি?

মঞ্জুষা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন সাধনার জোরে। ঠাট্টা নয় বোষ্টমদা, একদিনেই এ কাজ সম্ভব নয়—সময়ের দরকার। কিন্তু যাদের এই উঞ্ছবৃত্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে তাদের উৎসাহ এবং ঐকান্তিকতার অভাব যদি না থাকে তবে কৃতকার্য্য আমরা হবই। আমাদের নিত্যকার প্রয়োজন মেটাবার জন্যে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

রাধু বলিল, আমার কাছে এ কিন্তু অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

কিন্তু মঞ্জুষা চায় কাজের মধ্যে নূতন করিয়া বাঁচিয়া উঠিতে। তার কাছে আজ শুধু ইহাই একান্ত ভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে হাসিয়া বলিল, তাই মনে হয় বোষ্টমদা। যাঁরা আজীবন কাজ না করে শুধু হেসে গেয়েই কাটিয়ে দিলে তারা একটু ভয় পাবে বৈকি, কিন্তু সেখানে গিয়েও তুমি যত খুশী হাসতে, গান গাইতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না বোষ্টমদা। কিন্তু আজ আর নয়, বাবা অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এতক্ষণে হয়তো রাগ করেই বসে আছেন—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, ওঃ, ভাল কথা, একটু দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি।

মঞ্জুষা দ্রুত চলিয়া গেল এবং অনতিকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রাধুর হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিল।

রাধু কিছু বলিতে উন্নত হইতেই তাহাকে বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, উহু কোন কথা নয়। হাঁড়ি তোমার শূন্য, সে খবর আমি পেয়েছি।

রাধু বহুক্ষণ যাবৎ বলি বলি করিয়াও এতক্ষণ বলিতে পারে নাই। মৃন্ময়ের খবর সে জানিতে চাহে। তাহার বাড়ীতে বার দুই কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। মঞ্জুষা অন্য কথা তুলিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিয়াছে।

রাধু এবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল।

মঞ্জুষা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, সে অনেক কথা বোষ্টমদা। আর একদিন শুনো। মোদ্দা কথা, বিয়ে করে সংসার-ধর্ম্ম করাটা বোধ হয় আমার অদৃষ্টে নেই, আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখ।

কিছুক্ষণ গভীর নীরবতা।

রাধু পুনরায় বলিল, একখানা চিঠি দিয়েছিলাম তোমায়—

মঞ্জুষা কহিল, অনেক দেরীতে পেয়েছিলাম, কোন কাজেই আসে নি।

রাধু একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, মিনুদা সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ তা হলে আজও ঘোচে নি দিদি?

মঞ্জুষা আবার ঈষৎ হাসিল। বলিল, তা নয় বোষ্টমদা। আসলে আর সকলের সন্দেহটাকেই আমি বরাবর অবিশ্বাসের চোখে দেখে এসেছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাবা এবং জ্যাঠাবাবুর জন্যে আমি ভুল করেছিলাম।

রাধু বলিল, সে ভুল ত আজ ভেঙ্গে গেছে দিদি?

মঞ্জুষা কহিল, লাভ তাতে কিছুই হ'ল না বোষ্টমদা, বরং দুঃখটা আরও নিবিড় ভাবে ঘিরে ধরেছে। এর চেয়ে বরং ভুল না ভাঙ্গাই ছিল ভাল।

রাধু বলিল, ইচ্ছে করলেই তো এর থেকে মুক্তি পেতে পার দিদি। তুমি রাগ করো না, বড্ড স্নেহ করি বলেই এত কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি।

মঞ্জুষা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ইচ্ছে থাকলেও সব কাজ সকল সময় করা সম্ভব হয় না বোষ্টমদা।

রাধু কহিল, এটা কোন কাজের কথা নয় দিদি।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি সব ঘটনা জান না বলেই এ কথা বলতে পারছ। এক কথায় তা তোমায় বোঝানো সম্ভব নয়। আর এক দিন শুনো।

রাধু বলিল, তোমার যখন বলতে আপত্তি আছে তখন থাক, কিন্তু মিনুদার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল। মঞ্জুষা জবাব দিল, কিন্তু আজ আর একটি কথাও নয়। সময়-

মত সবই তুমি জানতে পারবে। যাদের তুমি স্নেহ কর তারাও কিছু তোমায় কম প্রীতির চোখে দেখে না। আমার এ কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পার বোষ্টমদা।

রাধু একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, এ কথা বলে লজ্জা দিও না দিদি। তোমাদের স্নেহপ্রীতির যদি অমর্য্যাদা করি তা হলে ধর্ম্মে সইবে না। বলিয়াই সে উঠিল। মঞ্জুষা তাহার সঙ্গে খানিকদূর আগাইয়া আসিয়া পুনরায় কাল দেখা করিবার জন্য অনুরোধ করিল।

রাধু চলিয়া গেল, কিন্তু মঞ্জুষা তখনই তাহার বাবার কাছে ফিরিয়া আসিল না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বাহিরে পায়চারি করিয়া প্রায় মিনিট পনের পরে ধীর পদক্ষেপে আসিয়া জীবানন্দের পাশে দাঁড়াইল।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্মিত হাস্যে কহিলেন, গ্রামটা পদক্ষিণ করে এলে বুঝি মঞ্জুষা ?

মঞ্জুষা না বুঝিবার ভান করিয়া পাণ্টা প্রশ্ন করিল, কার কথা বলছ তুমি বাবা ? তোমার নিজের কথা ?

জীবানন্দ বলিলেন, কার কথা বলছি সে কি আর তুমি বুঝতে পার নি মা।

মঞ্জুষা হাসিয়া ফেলিল। জীবানন্দ কহিলেন, তুমি হাসছ যে ?

মঞ্জুষা তেমনি হাসিমুখেই বলিল, আমার পেছনেও দুটো চোখ আছে বাবা। কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি, নদীর পাড়ে ?

জীবানন্দ জবাবটা এড়াইয়া গিয়া বলিলেন, তা বলে তুমিও ফিরতে অনেক দেরী করেছ। একলা কতক্ষণ বসে থাকা যায়। কিন্তু আজ কি আমায় খেতে দেবে না মা ?

মঞ্জুষা বলিল, সে নিয়ম তো তুমিই পাণ্টে দিয়েছ বাবা। কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে।

জীবানন্দ বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। কথাটা তিনি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ইহারই দিনকয়েক পরে মঞ্জুষা জীবানন্দকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া রওনা হইল। রাধুও সস্ত্রীক তাহাদের অনুগমন করিল।

•

আরও কয়েকটা মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই মঞ্জুষ

একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। মঞ্জুষার উৎসাহ এবং রাধুর পরিশ্রমের অভাব নাই, কিন্তু প্রথমে যেমনটি আশা করা গিয়াছিল সেইরূপ সাড়া মিলিতেছে না। জীবানন্দ অবশ্য প্রথম হইতেই বাধা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরোক্ষে তিনি সাহায্য করিতেছেন, নতুবা তাহাদের এই উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত।

অবশ্য মঞ্জুষার এই কাজের সাফল্য সম্বন্ধে জীবানন্দের মনে সংশয় ছিল প্রচুর। তাঁর মানসিক অবস্থা এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, কোনকিছুকেই তিনি সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাই ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তিনি মঞ্জুষাকে বলিলেন—এতে কি সত্যিকার কাজ হবে মঞ্জু!

মঞ্জুষা বলিল, তা হলে তোমার মতে আমাদের কি করা উচিত?

জীবানন্দ বলিলেন, তার জবাব এক দিন তোমরা নিজেরাই পাবে, কোন্ পথ কল্যাণের পথ তা বেছে নিতে পারবে, কিন্তু আজ আর নয়। চেয়ে দেখ তোমার বোষ্টমদা আবার আসছে যেন?

মঞ্জুষা সহসা তার বাবাকে লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, ওর সামনে যেন আবার আমাদের প্রতিষ্ঠানটির প্রসঙ্গ তুলো না বাবা। তার পর রাধুকে আহ্বান করিয়া বলিল, এস বোষ্টমদা, তোমার খবর কি?

রাধু বোষ্টম গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, খবর ভালই। পাঁপর আর ডালের বড়ি রোজই তৈরী হচ্ছে, ইজের ফ্রকও কম তৈরী হয় নি, কিন্তু দিদি—

জীবানন্দের মুখে একটু অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি মুখ খুলিলেন না।

মঞ্জুষা কিন্তু উল্টা বুঝিল। সে রাধুকে বলিল, তুমি অত ইতস্ততঃ করছ কেন বোষ্টমদা। আরও কিছু টাকার দরকার এই ত?

রাধু বলিল, কথাটা শুধু তাই নয় দিদি—শুধু টাকার ব্যাপার হলে এ কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

মঞ্জুষা অধীর হইয়া বলিল, তুমি বড় বেশী ভূমিকা কর বোষ্টমদা। যা বলতে চাও তা স্পষ্ট করে বলে ফেল।

রাধু বলিল, ভূমিকা করব কেন দিদি। কিন্তু মাল যে অনবরত জমে উঠছে—ওগুলো কাটাতে হবে তো?

জীবানন্দ বলিলেন, রাধু হক কথাই বলেছে মঞ্জু-মা। তা ছাড়া তোমার

এই পাঁপর আর বড়ি বেশী দিন মজুত রাখাও চলবে না। আয়-ব্যয়ের একটা হিসেব রাখা হয় ত মঞ্জু ?

কথাটা মঞ্জুষাকে বলা হইলেও জবাব দিল রাধু বোষ্টম, তা রাখতে গিয়েই গোল বেধেছে। আমাদের জিনিষ এখন আর বাজারে চলে না। বাজারদর আমাদের চেয়ে ঢের সস্তা। তারা যে দামের কথা বলে আমাদের তাতে পড়তা হয় না অথচ জিনিষগুলো সব নষ্ট হতে বসেছে।

মঞ্জুষা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে জিনিষ তৈরী বন্ধ করে দিয়ে বিক্রির কাজে সবাইকে লাগিয়ে দাও বোষ্টমদা।

রাধু বলিল, বাজারে বেরুবার লোকেরই অভাব, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়—দর সম্বন্ধে কি করা যাবে ?

মঞ্জুষা কহিল, আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামেও কি কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ?

রাধু জবাব দিল, প্রথম প্রথম কিছু সাড়া পেলেও ইদানীং সকলেই নাকি এক কথাই বলে।

মঞ্জুষা রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে তার বাবার নিকট হইতে প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু টাকা লওয়া হইয়াছে—কিন্তু আসল কাজ একটুও হয় নাই অথচ এই অপচয়ের প্রতিকার যে কোন্ পথে তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

রাধু পুনরায় বলিল, তবে একটা পথের সন্ধান নিয়েই আমি এসেছি।

মঞ্জুষা সাগ্রহে রাধুর মুখের দিকে চাহিতেই সে বলিল, রামভরস আগরওয়ালা আমাদের সব মাল কিনে নিতে রাজী আছে।

মঞ্জুষা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, এত বড় খবরটা এতক্ষণ আমায় দাও নি তুমি বোষ্টমদা !

এতক্ষণে জীবানন্দের মুখে একটুখানি অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তার মানে তোমাদের পরিশ্রমের ফলটা আর একজনকে দিয়ে দিতে চাইছ। এই ত হ'ল মোদ্দা কথা ? কিন্তু সর্ত্তটা কি বোষ্টম ঠাকুর ? বাজারদর থেকে কত কমে মাল তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে ?

ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। কেহ কোন উত্তর দিল না।

জীবানন্দ পুনরায় কহিলেন, তোমাদের আগরওয়ালার সঙ্গে একবার দেখা হয় না ?

রাধু জবাব দিল, আজ্ঞে বলেন ত তাকে নিয়ে আসতে পারি।

জীবানন্দ বলিলেন, বিলক্ষণ, এ কথা এতক্ষণ বলতে হয়। যাও যাও তাকে সমাদরে নিয়ে এস। কিছু না হোক ব্যবসার মারপ্যাঁচটা শেখবার চেষ্টা করা যাবে।

রাধু ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মঞ্জুষা তার বাবার কথা বলার ধরণে বিস্মিত হইলেও চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধু বোষ্টম আগরওয়ালাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। আগরওয়ালা পাকা ব্যবসাদার লোক। কতটুকু চাপ দিলে কতখানি কাজ আদায় হইতে পারে ইহা তার জানা। ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করিয়া যাইবার পূর্ব্বে সে কিছু উপদেশ বর্ষণ করিতে ভুলিল না। উপদেশটা মঞ্জুষার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এবং তার সারমর্ম্ম হইল এই যে, সস্তায় পড়তা ফেলিতে হইলে সকল সময় সদুপায়ের আশ্রয় লইলে চলে না।

মঞ্জুষার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। রাধু কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। আর জীবানন্দ ব্যবসায়ের মূলতত্ত্বদর্শী এই যুবকের কথায় কৌতুকবোধ করিতেছেন। তিনি ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

রাধু বোষ্টম আগরওয়ালাকে লইয়া প্রস্থান করিল। মঞ্জুষা বলিল, দুঃখ আর কিছুর জন্যে নয় বাবা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদেরও এদের আওতায় গিয়ে পড়তে হ'ল।

জীবানন্দ সহসা অস্বাভাবিক রকব গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না গিয়ে উপায় কি মঞ্জু! কিন্তু ভেব না এইখানেই এর শেষ—তবে আমার মনে হয় এরও প্রয়োজন আছে।

একটু থামিয়া জীবানন্দ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, শুনতে ভাল না লাগলেও কথাটা আগরওয়ালা মিথ্যে বলে যায় নি। ব্যবসায়-জগৎটা আজ প্রবঞ্চনার উপরই দাঁড়িয়ে আছে।

মঞ্জুষা কহিল, অত্যন্ত ভাবনার কথা বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন, কিন্তু এ নিয়ে তুমি আমি চিন্তা করে কতটুকু করতে পারব। লোভ আর স্বার্থপরতা আজ পৃথিবী জুড়ে রাজত্ব করছে। এর প্রতিবিধান করতে হলে আজ খুব বড় শক্তির প্রয়োজন মা। তুমি আমি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি করতে পারি।

মঞ্জুষা এ কথার কোন জবাব না দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল এবং সরাসরি

আসিয়া তার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হইল। প্রতিকূলতার কাছে এত সহজে হার মানিতে তার মন চাহিল না।

রাধু আসিয়া এরই মধ্যে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সকলকে জানাইয়া দিয়াছে যে, শুধু জিনিষ তৈরির উপর মজুরী প্রাপ্তি নির্ভর করিবে না, সে জিনিষ বাজারে কাটাইবার দায়িত্বও তাহাদেরই। ইহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইল, বহু কণ্ঠে প্রতিবাদ উঠিল, কিন্তু মঞ্জুষা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। মানব-চরিত্রের একটা নূতন দিক সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা হইল।

রাধু বলিল, দুঃখ করবার কিছু নেই দিদি। ভিক্ষাবৃত্তি মানুষকে এমনি করেই নির্জ্জীব আর অকর্ম্মণ্য করে তোলে। দায়িত্ববোধ বলে কিছু আর এদের মধ্যে নেই।

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু এমনটি ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বোষ্টম-দা? এদের আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর বলেই আমার বিশ্বাস ছিল।

রাধু বলিল, ভালমন্দ নিয়েই সংসার। এদের সকলকে এক পর্য্যায় ফেলা উচিত হবে না দিদি, কিন্তু এদের ভালোর জন্যেই তোমার দয়ার দান থেকে এবার এদের বঞ্চিত করতে হবে।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি বলতে চাইছ কি বোষ্টম-দা?

রাধু বলিল, অত্যন্ত খাঁটি সত্য কথা। এদের মাথা গোঁজার ঠাঁই তুমি করে দিয়েছ—এখন যার যার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব এরা নিজেরাই গ্রহণ করুক। আত্মশক্তিকে ওরা কাজে লাগাক। তুমি রাগ করো না দিদি, কিন্তু এখানে আর তোমায় আসতে দেওয়া হবে না, আর এলেও কোন কথা তোমায় আমি বলতে দেব না।

মঞ্জুষা কহিল, তারপর?

রাধু বলিল, পরের কথা পরে ভাবা যাবে কিন্তু লোকসান আর তোমাকে সইতে হবে না। বোষ্টম এতদিন শুধু নামগান করেই তার জীবনটা কাটায় নি দিদি।

মঞ্জুষা কহিল, আমাকে কি তুমি চুপ করে বসে থাকতে বলো? তা হলে বাঁচবো কেমন করে বোষ্টম-দা!

মঞ্জুষার কণ্ঠস্বরে কেমন একটা অসহায় ভাব ফুটিয়া উঠিল।

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বেশ যা হোক—চুপ করে বসে থাকবে কেন তুমি। তোমার কাজের ভাবনা কি। কিন্তু ছ' মাস তো তুমি

দেখলে, দুটি মাস শুধু আমার উপর সকল দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বলছি।

মঞ্জুষা হাসিল।

রাধু পুনশ্চ কহিল, তুমি রাগ করবে এবং ব্যথা পাবে জেনেই এত দিন বলি নি, কিন্তু তোমার দয়ায় এদের উপকার না হয়ে বরং ক্ষতিই হচ্ছে।

মঞ্জুষা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, অভাবের জ্বালা আর প্রবলের অত্যাচারে এদের মন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু এ কথাটা আমি আজও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না যে, নিজেদের ভালমন্দ কেন ওরা বুঝতে পারবে না।

রাধু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। মঞ্জুষা বলিয়া চলিল, নিজেদের প্রকৃত অবস্থাটা একদিন ওরা উপলব্ধি করবেই। অভাব আর আয়ের মধ্যে যেখানে এত বড় ব্যবধান সেখানে গোলযোগ আর মনকষাকষি কিছু হবেই। অভাবের ছিদ্রপথ দিয়ে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবেই। কিন্তু এ কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই অভাব মেটাতে হলে নিজেদের ঢের বেশী কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠতে হবে। শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না। ভাবপ্রবণতার চেয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তাই আজ অনেক বেশী। জান রাধুদা, আজ মনে হচ্ছে সহযোগিতা ও সদিচ্ছার একান্ত অভাব ঘটেছে আমাদের সমাজ-জীবনে। আমরা তাই এগুতে পারছি না, শুধু একটা অস্বস্তিকর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলছি। আজ যখন আমাদের নূতন করে সমাজকে গড়ে তুলবার দিন এল তখন আমরা মন দিয়েছি ভেঙ্গে ফেলার কাজে। এ পথে কোন দিনই প্রকৃত কল্যাণ হবে না।

মঞ্জুষা সহসা থামিল। একটু হাসিয়া বলিল, ঐ দেখ কি কথায় কোন্ কথা এসে গেল। হ্যাঁ কি বলছিলে তুমি বোষ্টম-দা? ওদের সাহায্য করে ক্ষতি করেছি—কিন্তু হঠাৎ আজ এ কথা কেন?

রাধু কহিল, হঠাৎ ঠিক নয় অনেকদিন ধরেই কথাটা তোমায় বলব ভাবছিলাম। ওদের আশ্রয় দিয়েছ ভাল করেছ, কিন্তু তা বলে ওরা রোজগারের চেষ্টা করবে না?

মঞ্জুষা কহিল, ওরা ত আমার দয়ার দান গ্রহণ করে নি বোষ্টম-দা। পরিশ্রমের বিনিময়ে মূল্য নিয়েছে। দোষ আর কারুর নয় আমার অদৃষ্টের।

রাধু বলিল, শুধু অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই দিদি। নিজের হিসেবের ভুলই এর জন্য দায়ী।

মঞ্জুষা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, রাধুর শেষ কথায় পুনরায় যেন সজাগ হইয়া উঠিল। বলিল, হিসেবের ভুল ত নিশ্চয়ই বোষ্টম-দা। বাবা যখন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন তখন অনেক সদুপদেশ তিনি আমাকে দিতেন। তিনি কি বলতেন জান? বলতেন, সব মানুষের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। এরই জন্য কাজের শ্রেণী বিভাগ, কিন্তু সমাজের প্রত্যেকের উপযোগী শিক্ষা দেবার আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী আর সে শিক্ষার মূল পাঠ গ্রহণ করতে হবে অন্তঃপুর থেকে—আদর্শ জননীর কাছ থেকে। বাবার মুখেই শুনেছিলাম আমি নাকি সেই জাতের একজন, আদর্শ জননী হওয়া যার জীবনের চরম সার্থকতা।

রাধু বোষ্টম সমর্থনসূচক ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক কথাই তিনি বলেছিলেন দিদি।

মঞ্জুষার মুখে বিচিত্র ধরণের একটু হাসি দেখা দিল। সে বলিল, বাবা বলতেন নরম মাটি দিয়েই পুতুল গড়া সম্ভব—মানুষের মনটা যত দিন বাইরের আবহাওয়া থেকে মুক্ত থাকে তত দিন তাতে সুশিক্ষার বীজ বপন করা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, আর এর ষোল আনা দায়িত্ব নাকি মায়েদের।

রাধু বলিল, তিনি ত মিথ্যে বলেন নি দিদি—

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, সত্যি কি মিথ্যে তা ঠিক জানি না বোষ্টম-দা, কিন্তু এই কথাগুলি যেন আমার মনে গেঁথে আছে। এগুলো সময় সময় মনকে বড় দুর্ব্বল করে ফেলে। আমি যে কত নিরুপায় সে কথা বুঝবার শক্তিও হয়ত বাবা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আজ আর নয়। মঞ্জুষা উঠিল এবং পথ চলিতে চলিতে রাধুকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বোষ্টম-দা, তোমার আগর-ওয়ালাকে বিমুখ করলে কেমন হয়?

রাধু বলিল, মোটা টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

মঞ্জুষা বলিল, যা ভাল হয় তুমিই করো বোষ্টম-দা, কিন্তু ডালের বড়ি কিংবা পাঁপড়ে এরা ভেজাল দেয় কেমন করে।

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তার উত্তরও আগরওয়ালা দিয়ে গেছে। বাজারে বাজীমাৎ করতে হলে সস্তায় ডাল কিনতে হবে। গরুকে খাওয়াবার নাম করে কিনবে, তারপরে···মালের জন্য আমাদের ভাবতে হবে না। কাটাবে আগরওয়ালা।

মঞ্জুষা কহিল, তারপরে মানুষের খাদ্যবস্তু রূপে তা বাজারে বেরুবে এই তো!

বোষ্টম-দা, এদের চরম শাস্তি হওয়া দরকার। এদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাই দেশটাকে দিন দিন ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবে। না বোষ্টম-দা জেনেশুনে তোমার আগরওয়ালাকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। ওকে বিদায় করে দিও। আমরা সবাই মিলে বাড়ী বাড়ী ঘুরব সেও ভাল।

রাধু কহিল, অনেক দিনের তৈরি সব জমে গেছে। ওগুলো যে প্রায় অখাদ্য হয়ে উঠেছে—কিছু ছেড়ে দিলে হ'ত না?

মঞ্জুষা গর্জ্জিয়া উঠিল, ছিঃ বোষ্টম-দা এ কথা তুমিও বলতে পারলে কি করে! না না ওগুলো বরং তুমি নষ্ট করে ফেল তবু এ কাজ কোন দিন করতে যেও না। আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের সেবা করা, তাদের মৃত্যুর কারণ হওয়া নয়। তোমার আগরওয়ালাকে কথাটা জানিয়ে দিও।

মঞ্জুষার এই তিরস্কারে রাধুর মুখে বড় চমৎকার একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে দিদি।

মঞ্জুষা গাড়ীতে উঠিল।



মহীপাল ঈষৎ গম্ভীর মুখে আসিয়া মৃন্ময় এবং লিলির সম্মুখে দাঁড়াইল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এতক্ষণ খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছিল। সেইজন্যেই আমার দেরী হয়ে গেল।

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, তারপর?

মহীপাল জবাব দিল, আপনার অনুমানই ঠিক, বাবা সত্যিই আমাদের প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন।

মৃন্ময় বলিল, সে সন্দেহ আশা করি এখন আর তাঁর নেই?

মহীপাল এতক্ষণে একটু হাসিল, বলিল, তাই ত আমার মনে হ'ল। বাবা বলেন, কথাটা তাঁকে আরও আগে জানানো উচিত ছিল। এরই মধ্যেই নাকি তাঁর কাছে বহু অতিরঞ্জিত খবর পৌঁছে গেছে।

তিনি বুঝি তাই বললেন? মৃন্ময় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু খবরটা তোমার বাবাকে দিলেন কে!

মহীপাল গম্ভীর মুখে জবাব দিল, তেমন লোকের অভাব কি মাষ্টার-মশাই—যে যার সুযোগের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে কহিল, তাঁদের বক্তব্য কি—অভিযোগটাই বা কিসের জন্য।

কিছু জানতে পেরেছ ?

মহীপাল ঈষৎ উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, তাঁদের মতে এটা নাকি পরোক্ষে বাবার বিরুদ্ধেই একটা দলগঠনের পূর্ব্বসূচনা। তা ছাড়া একজন বিদেশীকে বাবা এতটা প্রীতির চক্ষে দেখেন এ তাদের সহ্য হচ্ছে না।

একটু থামিয়া মহীপাল পুনরায় বলিতে লাগিল, বাবাকে তাঁরা সত্য মিথ্যায় জড়িয়ে এমন ভাবে বুঝিয়েছেন যে, তিনি ওদের কথা অবিশ্বাস করতে পারেন নি এবং আমাদের উপর নজর রাখবার ব্যবস্থাও এরই মধ্যে হয়ে গেছে।

লিলির মুখে একটু অর্থপূর্ণ হাসি দেখা গেল, কিন্তু সে নীরব রহিল।

মৃন্ময়ই পুনরায় বলিল, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে দেখছি মহীপাল, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আব নয়, চল ভিতরে যাই।

মহীপাল আপত্তি জানাইল—বলিল, এখানেই বেশ আছি।...একটু থামিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, সে হুকুম অবশ্য বাবা রদ করেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে বাবা আপনার সঙ্গেও আলাপ করতে চান।

মৃন্ময়কে যেন খানিকটা গম্ভীর মনে হইল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমার বাবাকে আমার নমস্কার জানিও ; বলো, কাল সকালেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

আপনার সুবিধেমত গেলেই চলবে—মহীপাল জবাব দিল, কিন্তু আমি আর দেরি করব না।

মহীপাল চলিয়া গেল।

এতক্ষণে লিলি মুখ খুলিল, ভিতরে চল মিনুদা।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, হুঁ—যাব, কিন্তু কিছু বুঝলে তুমি লিলি ?

লিলি হাসিমুখে জবাব দিল, না বোঝার মত ব্যাপার ত এটা নয়। তোমার চেয়ে এদের বুঝবার ঢের বেশী সুযোগ আমি পেয়েছি তাই সেদিন তোমায় আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। আসলে ওরা নিজেদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ তাই সবকিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। সন্দেহ আর অবিশ্বাসই ওদের মূলমন্ত্র। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের একটা সহজ সম্বন্ধ গড়ে ওঠা আজও সম্ভব হয় নি। অবিশ্বাস আর সন্দেহ সব ক্ষেত্রেই মরাত্মক মিনুদা।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল, বহু ক্ষেত্রেই যে তা সত্য, সে ত

চোখের ওপরই দেখতে পেলাম, কিন্তু আর নয়। মনে হচ্ছে রাত নেহাত কম হয় নি।

উভয়ে বাঙলোয় ফিরিয়া আসিল। খাইতে বসিয়া মৃন্ময় অদূরে উপবিষ্ট লিলিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তুমিও বসে পড়লে পারতে লিলি।

লিলি একটু হাসিয়া প্রতিবাদ জানাইল, বেশ বললে যা হোক্…তারপরে তোমার কিছু দরকার হলে?

নিজের থালার পানে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া মৃন্ময় বলিল, যা দিয়েছ তাই শেষ করে উঠতে পারি কিনা সন্দেহ লিলি—

লিলি একটু হাসিয়া বলিল, তবে সেই চেষ্টাই কর, কিন্তু তোমার খাওয়া শেষ হলে তবেই আমি বসব।

মৃন্ময় বলিল, এখন বসতেই বা দোষ কি লিলি!

লিলি হাসিয়া জবাব দিল, দোষ-গুণের কথা এটা নয় মিনুদা। সুবিধে অসুবিধেই হচ্ছে আসল কথা। কিন্তু দোহাই তোমার তর্ক করো না, খাও—ওগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোমার ভাল লাগবে না।

মৃন্ময় কিন্তু না থামিয়া নিজের কথারই জের টানিয়া বলিতে লাগিল, সে প্রশ্ন যখন এখানে উঠছে না তখন তোমার আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

লিলি আর বাদানুবাদ না করিয়া নিজের খাবার বাহির করিল। কিন্তু সেই দিকে চাহিয়া মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। বলিল, তুমি কি ওগুলো খাবে নাকি?

লিলি মৃদু হাসিয়া বলিল, এই ত আমার রোজকার খাবার মিনুদা।

মৃন্ময় সহসা হাত গুটাইয়া বসিল, অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল, একযাত্রায় পৃথক ফল কেন লিলি? আমার জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন আর তোমার ভাগে খানকয়েক পোড়া রুটিমাত্র।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, পোড়া নয় মিনুদা—সেঁকা। তা ছাড়া তোমার যা খাওয়া চলে আমার তা চলে না।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, একথার মানে?

তেমনি শান্ত গম্ভীর স্বরে লিলি জবাব দিল, এখানে আমার কি পরিচয় তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমি না তোমার বিধবা বোন?

মৃন্ময় প্রত্যুত্তরে জানাইল, না ভুলব কেন—কিন্তু এখানে ত কেউ তোমায়

অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে না লিলি।

লিলি বলিল, তা অবশ্য দিচ্ছে না। কিন্তু নিজেকে যে কোনমতেই ফাঁকি দেওয়া চলে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—তা বলে তুমি অমন হাত গুটিয়ে বসে আছ কেন—খাও মিনুদা।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না, শুধু নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। লিলির মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, খাবে না ?

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু তোমার এসব কথার মানে ?

লিলি বলিল, তা না বললে কি তুমি খাবে না ঠিক করেছ!···মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া—তুমি এত বোঝ অথচ মাঝে মাঝে অতি সাধারণ বিষয়গুলোও তোমার মাথায় ঢোকে না কেন তার মানে আমি খুঁজে পাই নে। নিজের উপরই যে সব সময় আমাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। সেখানে ফাঁকি চলবে কেমন করে বলতে পার!

কিন্তু কেন···কিসের প্রয়োজনে ? মৃন্ময় আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

লিলি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার এ প্রশ্নের জবাবটাও কি আমাকেই দিতে হবে মিনুদা! বেশ তাই না হয় দেব, কিন্তু তার আগে খেতে আরম্ভ কর, আমাকেও ও কাজটা সারতে দাও।

ইহার পরে মৃন্ময়ের আহারে আর রুচি থাকিল না। খাবারগুলা যেন তার গলায় আটকাইয়া যাইতে লাগিল। এতদিন একই বাড়ীতে থাকিয়াও লিলি কি খায়, কেমন করিয়া দিনযাপন করে—এ সমস্ত সে চোখ চাহিয়া দেখে নাই। নিজের এই ঔদাসীন্যে তার অত্যন্ত অনুশোচনা হইতে লাগিল।

মৃন্ময় পুনরায় প্রশ্ন করিল, সকালেও কি তোমার জন্য এমনি ধরণের আলাদা ব্যবস্থা হয় লিলি ?

লিলি হাসিয়া বলিল, হয় বৈ কি মিনুদা। উপায় নেই বলেই হয়।

মৃন্ময় কহিল, এই নিরামিষ আহারই চলছে দিনের পর দিন।

লিলি স্মিত মুখে বলিল, ঠিক তাই মিনুদা, কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর আমার নিজের জন্যেই আহারে এই কঠোর সংযমের একান্ত প্রয়োজন—

মৃন্ময় কিছুক্ষণ লিলির মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কাল থেকে আমারও একই ব্যবস্থা হবে লিলি—

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরে কি ছিল কে জানে, কিন্তু সহসা লিলি চমকাইয়া উঠিল

এবং মুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল, এ সব তোমার ছেলেমানুষি মিনুদা। কোন কথাই যদি না বুঝবে তবে আমি যাই কোথায়। আমার নিজের প্রয়োজনেও আলাদা ব্যবস্থা করতে পারব না। এ তোমার কেমন যুক্তি।

মৃন্ময় কহিল, এই কথাই কি তুমি আমায় বিশ্বাস করতে বল যে, তোমার নিজের জন্যই এই কৃচ্ছ্রসাধনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

লিলি কহিল, নইলে সাধ করে কেউ তা করে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিধবাদের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা নিতান্ত অকারণে করেন নি মিনুদা। এর গোড়ার কথাটা যে কি তা একটু তলিয়ে দেখলে আমার বক্তব্য বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু সত্যিই তুমি তো বিধবা নও লিলি।

লিলি বড় অদ্ভুত ভাবে হাসিয়া বলিল, আমার কথা তুমি এ জীবনে বুঝবে না মিনুদা। তুমি বড় অবুঝ—বড় ছেলেমানুষ।

মৃন্ময় বলিল, বুঝে আমার দরকার নেই লিলি।

লিলি সহসা যেন রীতিমত গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ মিনুদা, কিন্তু ও কি, আর খাবে না তুমি! অতটা মাছ তর-কারি—জান কত কষ্ট করে এগুলো আমায় জোগাড় করতে হয়?

মৃন্ময় ধীরে ধীরে বলিল, আজ জানতে পেরেছি বলেই এগুলো গলা দিয়ে নামছে না লিলি।

লিলি মৃন্ময়ের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তার কথায় যতটা সে ব্যথা পাইয়াছে, মনে মনে তার চেয়ে ঢের বেশী তৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যে কহিল, এ ব্যবস্থা মেনে চলতে গেলে অর্দ্ধেক দিন যে তোমার খাওয়াই হবে না মিনুদা! বাঁচবে কেমন করে?

এতক্ষণে মৃন্ময় হাসিয়া উঠিল। বলিল, কেন যেমন করে তুমি বেঁচে আছ।

লিলি কহিল, তুমি জেনে শুনে আমায় এত বড় শাস্তি দিতে পারবে?

মৃন্ময় বিস্ময়ের সুরে বলিল, কি যে পাগলের মত বলছ লিলি, এর মধ্যে আবার শাস্তিটা কোথায় দেখলে তুমি।

লিলি ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিল, তোমার চোখ নেই তাই এ কথা বলতে পারলে—না না, মিনুদা, তোমার এ ব্যবস্থা আমি কিছুতেই মানতে পারব না। এখানে যতদিন তুমি থাকবে আমার অবাধ্য হওয়া তোমার চলবে না।

মৃন্ময় সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। বলিল, তা হলে বাধ্য হয়েই আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে লিলি।

লিলি একটু চড়া গলায় ডাকিল, মিনুদা—তাহার কণ্ঠস্বর কতকটা আর্ত্ত-নাদের মত শুনাইল।

মৃন্ময় শান্ত ভাবে বলিল, তুমি মিথ্যে রাগ করছ লিলি—আমার কথাটা একবারও ভেবে দেখছ না।

লিলি এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, যে-কোন কারণেই কি মঞ্জুষাকে আজ এ কথা তুমি বলতে পারতে মিনুদা? কিছুতেই পারতে না। আমার কোথাও কেউ নেই বলেই আজ এমন করে আমায় আঘাত করতে পারলে।

মৃন্ময়ের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। লিলির আজ কি হইয়াছে—এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিবার কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। সে পুনশ্চ বলিল, তুমি সত্যিই আজ আমাকে অবাক করে দিলে লিলি। মঞ্জুষা হলে কি করতাম আর এখন কি করতে পারছি না সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু আঘাত আবার তোমায় কখন আমি করলাম লিলি। তাই বুঝতে পারছি না। তুমি ক্রমশঃই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ যে।

লিলি নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহার আজ কি হইয়াছে এ কথা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কথা কাটাকাটি করিতে করিতে নিজেকে সে এ কোথায় আনিয়া দাঁড় করাইল। এই ঘটনার পরে মৃন্ময় যদি তাহার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবিয়া বসে তবে তাহা খুব অসঙ্গত হইবে না।

মৃন্ময় কিছুক্ষণ লিলির আনত মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে বলিল, তোমাকে স্নেহ করি বলেই এ কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে—তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে নয়। তোমার সব কথা সকল সময় আমি বুঝি না, বুঝবার চেষ্টাও করি না লিলি। তার কারণ এ নয় যে, তোমাকে আমি অবহেলা করি। শুধু ভয় হয় পাছে ভুল বুঝে তোমার উপর আমি অবিচার করে বসি।

লিলি তথাপি মুখ তুলিতে পারিল না।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, আজ তোমার ও আমার অবস্থা একই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

লিলি কি জানি কেন চমকাইয়া উঠিল। তাহা মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, চমকে উঠ

না লিলি। আমি এক তিল মিথ্যে তোমায় বলছি নে। আজ তোমার আমার অবস্থা সত্যিই এক। যে দিকে চোখ ফেরাই সব শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু আমার মনের এই বিরাট শূন্যতাকে যে স্নেহে সেবায় ভরে দিয়েছ তার সম্বন্ধে আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে—

লিলির অজ্ঞাতেই তার মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল, নৈতিক দায়িত্ব! লিলি সহসা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আর সেইজন্যেই চলে যাবার কথাটা এমন সহজে তুমি মুখ দিয়ে বের করতে পেরেছ।

মৃন্ময় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি ঠিকই বুঝেছ লিলি—সত্যিই সেজন্য আমাকে একথা বলতে হয়েছে। যতদিন জানতে পারি নি সে ছিল এক কথা, কিন্তু এখন জেনে শুনে আর নিজের চোখে দেখেও চুপ করে থাকলে অপরাধের বোঝা আরও ভারী হয়ে উঠবে। অথচ আমি জানি শুধু কথায় তুমি রাজী হবে না।

লিলি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, তুমিও ভুল বুঝেছ লিলিকে। যে কাজ সে স্বেচ্ছায় করবে না তা কোন দিন হাজার চাপ দিলেও তাকে দিয়ে করানো সম্ভব হবে না। তার নিজস্ব একটা মত এবং পথ আছে—যার বাইরে সে কিছুতেই চলতে রাজী নয়। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাকে নিয়ে মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কি?

মৃন্ময় আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, তুমি যখন চাও না তখন তাই হবে মিনুদা, আলাদা ব্যবস্থা কাল থেকে বন্ধ করেই দেব। বলিয়া সমস্ত বাগ বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সে উঠিয়া পড়িল। মৃন্ময়ও আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া আপন শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই মৃন্ময়ের সর্ব্বপ্রথমে মহীপালের কথা মনে পড়িল। রাজাবাবু কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন একবার জানিয়া আসা প্রয়োজন। মৃন্ময় বাহির হইয়া পড়িল। লিলি তখনও ওঠে নাই। মৃন্ময়ের ঘুম আজ খুব ভোরেই ভাঙ্গিয়াছে।

রাজাবাবু এইমাত্র তাঁর পাঠাগারে আসিয়াছেন। এই সময়টা যে তিনি অধ্যয়নে রত থাকেন সে কথা মৃন্ময়ের জানা ছিল। সে বাহির হইতে বলিল, ভিতরে আসতে পারি?

রাজাবাবু হাসিমুখে তাহাকে আহ্বান জানাইলেন। সে ভিতরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিলেন, আপনি খুব ভোরে ওঠেন ত মৃন্ময়বাবু। মহী বুঝি জরুরী তাগিদ দিয়ে এসেছে? ওর সবকিছুতেই এমনি অনাবশ্যক ব্যস্ততা।

মৃন্ময় বিনীত ভাবে বলিল, আপনি নাকি জরুরী তাগিদই দিয়েছেন?...

রাজাবাবু হাসিয়া অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন। একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, যতদূর মনে হচ্ছে আপনার এখনও চা খাওয়া হয় নি। ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছেন।

মৃন্ময় স্মিতমুখে বলিল, তা হয় নি—ফিরে গিয়েই হবে।

রাজাবাবু বলিলেন, এটা ঠিক কথা হ'ল না। তিনি হাঁক দিতেই একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতরাশের কথা বলিয়া দিয়া তিনি নিজেও একখানি চেয়ার টানিয়া বসিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল।

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই রাজাবাবু সোজাসুজি বলিলেন, মহী-পালের কাছে আমি সবই শুনেছি। আপনার উদ্দেশ্য ভালই, সে বিষয়ে অন্তত এখন আমার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও কি জানেন আমার দেহে যে অভিজাত-রক্ত বইছে তা ঠিক যেন আপনাদের উদ্দেশ্যকে মেনে নিতে পারছে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের অবস্থাটাই হয়েছে সবচেয়ে শোচনীয়। না পারি অতীতে ফিরে যেতে, না পারি খোলা মনে এগিয়ে আসতে—আর এই নিয়ে কি দুঃখের অবধি আছে মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় বলিল, আর একটু সোজা এবং স্পষ্ট করে বলুন রাজাবাবু।

রাজাবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, প্রজারা জ্ঞানের আলো পাক, নিজেদের শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠুক—এটাও যেমন আমাদের কাম্য, তেমনি অন্য দিকে নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এ কল্পনা করতেও যে ভয় হয়...

মৃন্ময় বলিল, কিন্তু প্রজাদের শিক্ষার ভিতর দিয়েই ত ওদের সঙ্গে আপনা-দের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে রাজাবাবু।

রাজাবাবু হাসিমুখে বলিলেন, আপনার মত করে ভাবতে পারলে ত কোন গোল ছিল না, কিন্তু তা পারছি কোথায়। যে শিক্ষা আমরা সারা জীবন ধরে

পেয়ে এসেছি তা প্রজাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে সন্দেহ আর অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, কাজেই তাদের ভাল দিকটা আজ আর চোখে পড়ে না। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি—হঠাৎ এমনি ধরণের একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঝোঁক আপনার দেখা দিল কেন?

মৃন্ময় সহাস্যে কহিল, হঠাৎ নয় রাজাবাবু—কল্পনাটা অনেক দিন থেকেই আমার মাথায় ছিল। আমার বিশ্বাস সত্যিকারের শিক্ষা আমরা পাই নি বলেই দল-উপদলের ভিড়ে স্বচ্ছন্দে পথ চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপনিও একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। এর উপর অকারণ অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করছেন। মোটের উপর পরীক্ষামূলক মনোভাব থেকে একটা সামান্য ব্যাপারে আমি হাত দিয়েছি, কাউকে অকারণে বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তা ছাড়া হাতে এত সময় রয়েছে যে চুপ করে বসে থাকাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজাবাবু বলিলেন, কাজের লোক কোনদিনই চুপ করে বসে থাকতে পারে না এ কথা সত্য। কিন্তু আপনি ত একটা কাজ করতে পারেন মৃন্ময়-বাবু—আমার ষ্টেটে একটা ভাল চাকরি নিন না কেন? আপনার মত লোক পেলে আমি খুশীই হব। কথাটা একটু ধীরে সুস্থে চিন্তা করে দেখবেন মৃন্ময়-বাবু—

মৃন্ময় রীতিমত বিস্মিত হইলেও স্বাভাবিক সুরেই বলিল, আমার সামান্য উদ্যমকে আপনি সত্যিই অত্যন্ত বড় করে দেখছেন—

বাধা দিয়া রাজাবাবু বলিলেন, সামান্যই একদিন অসামান্য হয়ে ওঠে মৃন্ময়বাবু—এই দীর্ঘ জীবনে সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কোনকিছুকেই অবজ্ঞা করতে নেই তা আপাতদৃষ্টিতে সে যত নগণ্যই হোক।···বলিতে বলিতে তিনি মুহূর্ত্তকাল থামিয়া অন্য প্রসঙ্গে আসিলেন, এই যে আমাদের চা এসে গেছে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিল। রাজাবাবুর কথাগুলি তার মাথার মধ্যে পাক খাইতেছে।

রাজাবাবু মৃন্ময়ের চিন্তাকুল আনত মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আপনার কাজে বাধা দেবার জন্য এত কথা বলেছি তা মনে করবেন না। মোটামুটি অবস্থাটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আপনি মহীপালের শিক্ষক। আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

মৃন্ময় সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, আপনি মহৎ রাজাবাবু। আপনার সম্বন্ধে যেন কোন দিন না আমি ভুল সিদ্ধান্ত করে বসি। আর আপনার উপদেশ আমি বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখব যদিও মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই।

রাজাবাবুর মুখে হাসির রেখা খেলিয়া গেল। কিন্তু এই হাসিতে যেন খানিকটা সন্দেহ, খানিক উল্লাস প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মগোপন করিয়া রহিল। মৃন্ময়ের চোখে তাহা ধরা পড়িল কিনা বোঝা গেল না।

আরও নানা বিষয় আলোচনা করিয়া সে যখন উঠিল তখন বেলা প্রায় নয়টা।

বাংলোয় ফিরিয়া সর্ব্বপ্রথমেই সে লিলির সম্মুখে পড়িল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া সে বলিল, উঠতে একটু দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু ডেকে তুলতে ত পারতে মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল, তা অবশ্য পারতাম, কিন্তু দরকার বোধ করি নি।

লিলি পুনরায় কহিল, চা বোধ হয় রাজাবাবুর ওখান থেকেই খেয়ে এসেছ ? আর দরকার হবে কি ?

মৃন্ময় কহিল, না চায়ের দরকার হবে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা আছে। চল বসা যাক।···

উভয়ে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময় বলিল, তুমি ঠিকই বলেছিলে লিলি। রাজাবাবুকে যে ধরণের লোক মনে করেছিলাম তিনি ঠিক তা নন। অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং চাপা প্রকৃতির লোক তিনি।

লিলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

মৃন্ময় বলিতে লাগিল, মনে হচ্ছে আমাদের কাজে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হবেন তিনি নিজেই অথচ মুখে অনেক ভাল ভাল কথাই শোনালেন। এই-খানেই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। অনেক কথাই তিনি বলে গেলেন। আমি রাজী থাকলে তাঁর ষ্টেটে একটা ভালো চাক্‌রি পেতে পারি এ ভরসা দিতেও তিনি কসুর করেন নি। যে কারণেই হোক তিনি একটু ভীত হয়ে পড়েছেন এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

মৃদু কণ্ঠে লিলি কহিল, আশঙ্কাটা তার মিথ্যা ত নয়। যতই তুমি পাঠশালা বলে প্রচার কর না কেন, এ যে নিছক পাঠশালা নয় এ কথা বুঝবার মত বুদ্ধি রাজাবাবুর আছে, তার উপর আবার তাঁর একমাত্র পুত্রকে তুমি দলে টেনে

নিয়েছ। এতেও যদি তিনি একটু শঙ্কিত না হন তবে হবেন কিসে শুনি।

মৃন্ময় কহিল, কিন্তু সত্যিই ত আমাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয়।

লিলি কহিল, সেকথা যদি সকলে বিশ্বাস না করতে চায় তবে তোমার কি করবার আছে শুনি? আমার মনে হয় এ সব গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে না যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাজাবাবু নিজের স্বার্থের খাতিরেই এদের শিক্ষা···

বাধা দিয়া লিলি কহিল, ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হবে অবান্তর। আপনার বেগে আপনিই সব ভেঙে চুরে যাবে, কিন্তু দোহাই তোমার মিনুদা, তুমি এদের ভাল করবার সঙ্কল্প বাদ দাও। শেষে ভাল করতে গিয়ে হয়ত তাদের আরও ক্ষতি করে বসবে।

মৃন্ময় বলিল, হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ। রাজাবাবুও কথা প্রসঙ্গে যেন এরূপ একটা ইঙ্গিত করেছিলেন। কথাটা আমিও সেই থেকেই ভাবছি।

লিলি বলিল, তুমি যত খুশী ভাব, কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, তোমাকে আমি এ সব কাজে নামতে দেব না। মহীপাল এলে তার জবানিতে কথাটা তুমি রাজাবাবুকে জানিয়ে দিও।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, সেই সঙ্গে চাকরিটার কথাও বলে দেব ত? বলিতে বলিতে সে সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি ভয় পেয়ে গেছ, কিন্তু ভয়ের কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না—তবে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে দেখা যে সমীচীন তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় এঁরাই আমাদের ভরসা। সুতরাং হঠাৎ কিছু করে ফেলব না, বিশেষ করে ব্যাপারটা শুধু যখন আমাকে নিয়েই নয়।

লিলি পুনরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। মৃন্ময় বলিল, তোমার কথাটা ভুলে যাওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না। এ কথা আগেই আমার ভেবে দেখা উচিত ছিল।

লিলির মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাজাবাবু সহাস্যে কহিলেন, এ আমি আগেই জানতাম মৃন্ময়বাবু যে

আমার কথা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। আপনাদের এই উত্তমকে অভিনন্দন জানাতে পারলেই আমি খুশী হতাম, কিন্তু প্রত্যেক কাজের জন্যেই উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করার প্রয়োজন আছে। আমার এখানে সেই ক্ষেত্রেরই একান্ত অভাব। তা হলেও আপনার কথা আমার সব সময় মনে থাকবে। সময় এবং সুযোগ এলে আমিই অগ্রণী হয়ে আপনাদের কাজে সহযোগিতা করব। কিন্তু কোন রকম চাকরি নিতে আপনি অনিচ্ছুক কেন জানতে পারি কি?

মৃন্ময় হাসিমুখে বলিল, নিশ্চয় জানতে পারেন রাজাবাবু। এই চাকরি নেওয়া আমার কাছে উৎকোচগ্রহণের সামিল বলে মনে হচ্ছে। আমি নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যাব যদি আপনার প্রস্তাবে রাজী হই।

রাজাবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার কথায় আপনার আর একটা সঙ্কল্পও ত ত্যাগ করেছেন মৃন্ময়বাবু।

মৃন্ময় স্মিতহাস্যে জবাব দিল, কিন্তু তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত নেই।

রাজাবাবু কহিলেন, আপনার বক্তব্যটা ঠিক পরিষ্কার হ'ল না।

মৃন্ময় কহিল, যে কাজ করতে আমি অগ্রসর হয়েছিলাম তা নিতান্তই অপরের জন্য। কিন্তু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, সময় থাকতে আমায় সাবধান করে দিয়েছেন, নইলে অকারণে হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'ত।

রাজাবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, ধন্যবাদ আপনারই পাওয়া উচিত মৃন্ময়বাবু। অন্ততঃ এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে, আমার বাধাদানকে আপনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পেরেছেন। এটা কিন্তু মহীপালও পারে নি।

মৃন্ময় হাসিয়া কহিল, ছেলেমানুষ বলেই সে আপনাকে বুঝতে ভুল করেছে।...

রাজাবাবু বলিলেন, এটাকে শুধু ছেলেমানুষি বলা চলে না। আসলে মানুষের কল্যাণসাধন করতে হলে যে ধরণের মানসিক প্রস্তুতির দরকার মহীপালের তা নেই। তার মনে যুক্তি নেই—বিচার নেই। আর এইজন্যেই আমি একটু বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

মৃন্ময় কহিল, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। যে কাজ আমার করণীয় তা মহীপালকে সাজে না এবং তার পক্ষে তা সঙ্গতও নয়। কিন্তু এখন আমি

আসি। মহীপালকে সব কথা আমি বুঝিয়ে বলব, ওকে নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা করা অনাবশ্যক।

মৃন্ময় উঠিল। বাংলোয় পৌঁছিতেই লিলি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, কি বললেন রাজাবাবু—

মৃন্ময় হাসিমুখে বলিল, নতুন আর কি বলবেন, চাকরি নিতে রাজী না হওয়ায় বিস্মিত হলেন। ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। কিন্তু একটা কথা তিনি ঠিকই বলেছেন—কোনও কাজ করতে অগ্রসর হবার আগে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে হয়। আমার ভুল হয়েছিল সেইখানেই। মহীপালকে এর মধ্যে টেনে না আনলে রাজাবাবু এত বেশী সজাগ হয়ে উঠতেন না। তার এলাকার মধ্যে অমন দশটা পাঠশালা হলেও তিনি মাথা ঘামাতেন না। তা ছাড়া সন্দেহ রোগটা বড় ছোঁয়াচে—জট শুধু পাকিয়েই তোলে।

মৃন্ময় একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সেই থেকেই বার বার রাজাবাবুর কথা ভাবছি—ক্ষেত্র প্রস্তুতের গোড়ার কথাটা হ'ল মনকে তৈরি করা—

লিলি বলিল, তোমার উদ্দেশ্যটাও ত ঠিক তাই ছিল মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল, ছিল কেন এখনও আছে, কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে। যাদের সম্বন্ধে গোড়ায় আমি ভেবেছি প্রকৃতপক্ষে তাদের নিয়ে আজ বড় সমস্যা দেখা দেয় নি। ওদের মন কাঁচা—গড়ে তোলাও তাই কষ্টসাধ্য নয়। ভাবনা হচ্ছে জ্ঞানপাপীদের নিয়ে। তাদের পাটোয়ারী বুদ্ধি এবং গতানুগতিক চিন্তাধারাকে বদলে দিতে হবে। ওদের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আছে দুর্নিবার লোভ এবং স্বার্থপরতা, তাই তো ঘরে বাইরে অসন্তোষ এমন তীব্র হয়ে উঠেছে।

লিলি কহিল, জ্ঞানপাপী তুমি কাদের বলছ মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল—যারা জেনেশুনে অন্যায় করে বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় তাদের সবাইকে—

লিলি কহিল, একি কখনও সম্ভব হবে যে···

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, সহজে হবে না একথা সত্য, এর জন্য দরকার একটা বিপ্লবের—

লিলি চমকাইয়া উঠিল। তাহা মৃন্ময়ের দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কথাটা না বুঝেই চমকে উঠো না। আমি যে বিপ্লবের কথা

বলছি তা সমাজকে ধ্বংস করে না। আমি এমন বিপ্লবের কথা বলতে চাই যা সমাজের জীর্ণ অচলায়তনকে ভেঙেচুরে নব সৃষ্টির ইমারত গড়ে তোলে। এ যদি আমরা না করতে পারি তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

লিলি বলিল, এ নিছক কল্পনা-বিলাস! অসম্ভব।

মৃন্ময় বলিল, আমার তা মনে হয় না। সত্যিই যদি তেমন বিপ্লব আসে এবং যাবতীয় ধ্বংসোন্মুখ সনাতন ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরে তছনছ করে দিতে সক্ষম হয় তবেই নূতন পথের সন্ধান মিলবে, মানুষ অতীতের গ্লানিময় অধ্যায়ে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক হবে।

লিলি বলিল, দুটো পাঠশালা আর কতকগুলো গরম গরম বক্তৃতায় তা সম্ভব বলে মনে কর নাকি তুমি!

মৃন্ময় জবাব দিল, সেইজন্যেই ফিরে এসেছি লিলি। কিন্তু এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে না। চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে একটা প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের পূর্ব্বাভাস। ধ্বংসের মধ্যেই সুন্দরের আবির্ভাব ঘটবে।

লিলি কহিল, সে বিপর্য্যয়ে যদি পৃথিবী রসাতলে যায়।

মৃন্ময় কহিল, আমি কিন্তু মনোজগতের বিপ্লবের কথা বলছিলাম—

লিলি বলিল, তোমার এ কথার কোন মানে হয় না মিনুদা। বাইরে থেকে আঘাত না হানলে ভিতরের পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে না।

মৃন্ময় কহিল, তুমি হয়তো সত্যি কথাই বলছ। কিন্তু বিপ্লবেরও তো বিভিন্ন রূপ আছে। গান্ধীজী কি বিপ্লবী ছিলেন না? কিন্তু তাঁর প্রবর্ত্তিত বিপ্লব ধ্বংসের পথকে পরিহার করে সৃষ্টির পথকেই কি বেছে নেয় নি?

লিলি বলিল, কিন্তু সে পথকে মানুষ মেনে নিতে পারল কোথায়? আসলে মানুষের রক্তের মধ্যে রয়েছে আদিম হিংস্র প্রবৃত্তি—

বাধা দিয়া মৃন্ময় বলিল, আবার সেই মানুষের মধ্যেই ভগবান যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন—না না, লিলি, শুধু তর্কই করো না। আমি হয়তো ভুল করতে পারি, কিন্তু আমার সঙ্কল্প ছিল মহৎ। তাকে তুমি ব্যঙ্গ করো না।

লিলি একটু বিস্মিত হইল। বলিল, এ সব তুমি আবার কি বলছ মিনুদা। তোমাকে ব্যঙ্গ করতে যাব কিসের জন্যে। আমি সাধারণ ভাবেই কথাটা বলছি। দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে আজ সংস্কারের নাম করে কি বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চারি দিকে। মানুষে মানুষে মিলনের প্রয়োজন যখন আজ সবচেয়ে বেশী তখনই আমরা একের কাছে থেকে অপরে বহুদূরে সরে যাচ্ছি।

বাঁচার প্রয়োজনের চেয়ে বঞ্চনার আয়োজনটাই আজ বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই, ভালও লাগে না এবং কতকটা অনধিকারচর্চ্চাও।

মৃন্ময় কহিল, এটা ঠিক কথা হল না লিলি।

লিলি শান্ত কণ্ঠে বলিল, অন্ততঃ তোমার আমার পক্ষে এইটেই ঠিক কথা মিনুদা। গায়ের জোরে তুমি আমার মুখ বন্ধ করে দিলেও সত্য সব সময়ই সত্য।

মৃন্ময় ইহার কোন জবাব দিল না।

লিলি প্রসঙ্গটা একটু ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিল, আচ্ছা মিনুদা, যে প্রশ্নটা আজ বার বার তোমার মনে রেখাপাত করছে এর সত্যিই যদি কোন মূল্য দিতে, তোমার জীবনের ধারাও আর দশজনের মত স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হ'ত।

মৃন্ময় হাসিমুখে জবাব দিল, এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় লিলি। তবে আমার মনে হয় তা হলে বিষয়টা আরও গভীরভাবে আমার মনকে নাড়া দিত। আজ আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবনের স্রোত একেবারে গতিহারা হয়ে গেছে—তা আজ বিষাক্ত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের লোকেরা শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে নূতন কোন আলোর আশায়।

লিলি বলিল, কিন্তু তার সন্ধান দেবে কে? তেমন নায়ক কোথায়? তুমি আমি পথ চলতে পারি, পথের নির্দ্দেশ দিতে পারি না। কিন্তু আর নয় মিনুদা, আমরা বড় বড় কথায় এসে পড়েছি। একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ কটা বাজে।

লিলি আলোচনাটা থামাইয়া দিতে চাহে। মৃন্ময়ের নিজেরও ভাল লাগিতে-ছিল না। কিন্তু কথাটা লিলি বেশ বলিয়াছে। সে নেতা কোথায়—পরিচালনা করিবার উপযুক্ত নায়ক না থাকিলে সাধু সঙ্কল্পও যে ব্যর্থ হইয়া যায় এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চতুর্দ্দিকের এত ব্যর্থতা বুঝি তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত···মৃন্ময় ভাবিতেছিল।

তাহার চিন্তাচ্ছন্ন মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া লিলি একটু হাসিয়া কহিল, ভাবছ কি মিনুদা? আবার নূতন কোন যুক্তি দেখাবে? কিন্তু তা খাওয়া-দাওয়ার পরে। বড় খিদে পেয়েছে আমার।

মৃন্ময় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, না তর্ক আমি করি নি। কথার পিঠে দুটো

কথা বলেছি মাত্র। কিন্তু ভাবছিলাম শুধু এই কথাটাই যে, যে দরজা দিয়েই সোজা হয়ে ভিতরে ঢুকতে চাই অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, মাথা নীচু না করে আর তা সম্ভব হয় না। সেই প্রাচীন আমলের ইটের গাঁথুনি আর কাঠের ফ্রেম। না একটু বড় না একটু ছোট, সর্ব্বত্র ঠিক তেমনি আছে—কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটেনি—কিন্তু আর নয় সত্যই বড় বেলা হয়ে গেছে।

লিলি হাসিয়া বলিল, তবু যদি না মনে করিয়ে দিতাম।

মৃন্ময়ও সে হাসিতে যোগ দিল। বলিল, ঠিক বলেছ। কথায় পেলে আমার আর নাওয়া-খাওয়ার পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না। আর এই নিয়ে কি কম লাঞ্ছনা আমায় ভোগ করতে হয়েছে।

লিলি বলিল, ভোগ করা তোমার উচিতও।

মৃন্ময় কহিল, ভোগ ত করেছিই। এমন দিনও গেছে যে সারাদিন খাওয়াই হয় নি।

লিলি হাসিয়া কহিল, কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে সে তোমার একলার, আজ বোধ হয় দু'জনারই শেষ পর্য্যন্ত—

কথাটা চাপা পড়িল মৃন্ময়ের উচ্চ হাস্যে। সে বলিল, আবার কথায় পেয়েছে তাই বলছ ত? না না, এবার সত্যিই যাচ্ছি—বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই খাবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

আহার্য্য তৈরিই ছিল। মৃন্ময় খাইতে বসিল এবং কয়েক গ্রাস মুখে দিয়াই পুনরায় পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া আরম্ভ করিল, যখন কলেজ হোষ্টেলে থাকতাম, এই ভয়ে কোথাও আমি যেতে চাইতাম না। মার কাছে এই নিয়ে কি কম বকুনি শুনতে হয়েছে আমাকে। রাধু বোষ্টমের রামপ্রসাদী শুনতে বসলে আমার সময়ের জ্ঞান থাকত না।

লিলি কহিল, বোষ্টম হয়ে রামপ্রসাদী এ আবার কেমন বোষ্টম মিনুদা।

মৃন্ময় হাসিল, বলিল, একেবারে জাতবোষ্টম লিলি। তার কাছে কালী আর কৃষ্ণে কোন তফাৎ নেই। জাতবোষ্টম বলেই সে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেছে। মানুষের বেলায়ও ওর কাছে সবাই সমান। ভালবাসায় দেখেছি ওর ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সেখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার না করে অন্তরের কোমল বৃত্তিকেই সব সময় বড় আসন দিয়েছে।···

মৃন্ময়ের সহসা খেয়াল হইল যে এতক্ষণে সে কিছুই খায় নাই এবং আড়চোখে লিলির মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু একটু

বাদেই পুনরায় মুখ তুলিয়া খুশীর সুরে বলিল, আজকের সোনামুগের ডালটি খাসা হয়েছে—এমন বহুদিন খেয়েছি বলে মনে হয় না। আর ক্ষোয়াসের ডালনাটিও চমৎকার লাগছে।

লিলির চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে হাসিয়া বলিল, দেব আর ?

মৃন্ময় বলিল, দেবে দাও, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তোমার জন্যে থাকবে ত ?

লিলি ধমক দিল, সে ভাবনা তোমার নয়।

মৃন্ময় বলিল, খাওয়ানোর ব্যাপারে তোমাদের এই জিনিষটি আমার খুব আশ্চর্য্য লাগে। তোমাকেও দেখছি আরও অনেককেই লক্ষ্য করেছি। এক্ষেত্রে তোমরা সবাই সমান। প্রশংসা করলেই তোমরা দানে একেবারে মুক্তহস্ত হয়ে যাও।

লিলি পুনরায় মৃদুভাবে ধমক দিয়া বলিল, কিন্তু তোমাদের এই প্রশংসা করার মানেই হ'ল আর খানিকটা চাওয়া—এ কথাটাও সেই সঙ্গে স্বীকার করো—

মৃন্ময় তীব্র আপত্তি জানাইল, মোটেই করি না। প্রশংসা করার মানেই যদি চাওয়া হয় তা হলে সে তো ভারি মুশকিলের কথা। মৃন্ময় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। লিলিও সে হাসিতে যোগ দিল এবং বলিল, সব ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর একই অর্থ গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায়, কিন্তু এ নিয়ে আর তর্ক করলে বিপদ আছে। তা হলে আমি যে এতক্ষণ অভুক্ত আছি তা হয়তো তোমার মনেই থাকবে না।

মৃন্ময় খানিক প্রাণখোলা হাসি হাসিল, বলিল, কথাটা তুমি মিথ্যে বল নি। বলিয়াই পুনরায় সে আহারে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। বলিল, সেদিন তুমি বলছিলে না যে, এই খেয়ে আমি বাঁচব কি করে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এমনি খাওয়া জুটলে পরমায়ু আমার বেড়েই যাবে।

লিলি হাসিয়া বলিল, না তোমাকে নিয়ে দেখছি সত্যিই আর পারা যাবে না। মাঝে মাঝে তোমার অদৃষ্টে যে কিছু জুটত না, তা ঠিক শাস্তিই হ'ত।

লিলি হাসিতে লাগিল—মৃন্ময়ও সে হাসিতে যোগ দিল।



এমনি করিয়াই তাহাদের দিন কাটিতে থাকে। মৃন্ময় আজকাল আবার

নূতন করিয়া পড়াশুনায় মন দিয়াছে। রাজাবাবুর গ্রন্থাগারেই ইদানীং বেশীর ভাগ সময় তাহার কাটিয়া যায়। মহীপাল ক্ষুব্ধ হয়—অনুযোগ দেয়। মৃন্ময় শুধু হাসে, কোনও জবাব দেয় না। রাজাবাবু মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেন। মৃন্ময়কে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে বলেন, জানেন মৃন্ময়বাবু, পয়সা থাকাটাও যেমন পাপ, ওটা না থাকাও তেমনি পাপ। মৃন্ময় একাগ্র চিত্তে পড়িতেছিল, অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল। বলিল, আমাকে কিছু বলছেন নাকি ?

হ্যাঁ বলছি। রাজাবাবু জবাব দিলেন, কত সামান্য কারণ থেকে ভুলের সৃষ্টি হয় অথচ এই সামান্যকে গায়ে না মাখলে কত সহজে গোল মিটে যায়।

মৃন্ময় বলিল, কিন্তু সব সময় মানুষ তা পারে কোথায়। মানুষেব মনেই বাসা বেঁধে আছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এর থেকে মুক্ত থাকা সহজ নয়।

রাজাবাবু বলিলেন, আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন, কিন্তু আর আপনাকে বিরক্ত করব না—আপনি পড়ুন।

রাজাবাবু চলিয়া গেলেন, কিন্তু সে আর পড়ায় মন দিতে পারিল না। কিছু দিন হইতেই থাকিয়া থাকিয়া তার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এমন অনেক কথা, এমন অনেক ঘটনা আসিয়া হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে —যাহা কোন দিন মনে স্থানও দেয় নাই। আজ এই নির্ব্বাসিত জীবনের পথে সেই সব অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। একটা অভিনব অনুভূতিতে তাহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মঞ্জুষা আজ কোথায় কেমন আছে এ খবর সে রাখে না। জানিবার উপায়ও নাই, কিন্তু তাহার কথা ভাবিতে বসিলে আর একটি মেয়ে আসিয়া তার মনের একাংশ জুড়িয়া বসে। সে লিলি। নিজের দুঃখটা তাই আর বড় হইয়া উঠিতে পারে না। বুঝিবার ভুলের জন্য আজ মঞ্জুষার এবং তার মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইলেও তারা একে অপরকে আজও অবজ্ঞার চোখে দেখে না, কিন্তু লিলির বেলায় দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপ, সে হইয়াছে একেবারে নিরবলম্ব। ঘৃণার বিষে তার সারা অন্তর জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে—খানিক কাল্পনিক আনন্দ পাইবার মত সম্বলও তার নাই।...

ভাবিতে ভাবিতে মৃন্ময় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটিল। এতক্ষণ তার একটি পৃষ্ঠাও পড়া হয় নাই। মৃন্ময় বুঝিল, আজ আর কোন কাজ হইবে না। এই মুহূর্ত্তে নিজেকে তাহার বড় একলা

মনে হইল, মানুষের সঙ্গ লাভের জন্ম মন তার সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এমন মাঝে মাঝে হয়। জীবনটা স্বাদহীন, রসহীন প্রস্তরখণ্ড নয়। এই পৃথিবীর মৃত্তিকার উপরে দাঁড়াইয়া নিয়ত সে দেখিতেছে জীবনের বিপুল সমারোহ। যে মাটি হইতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ে আহরণ করিতেছে প্রাণরস তারই সঙ্গে যেন ওর নাড়ীর যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—সে যেন শূন্যে ঝুলিতেছে ত্রিশঙ্কুর মত।

সহসা মহীপাল ডাকিল, মাষ্টার মশাই—

স্বপ্নলোক হইতে মৃন্ময় সহসা যেন বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল। তাহার দু'চোখে কেমন এক প্রকারের বিহ্বলতা—অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার এক বেদনাময় অভিব্যক্তি।

মহীপাল পুনরায় ডাকিল। মৃন্ময় এতক্ষণে কতকটা ধাতস্থ হইয়াছে। সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, পড়তে পড়তে বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। একেবারেই খেয়াল ছিল না। কিছু বলবে আমায় মহীপাল ?

হ্যাঁ—মহীপাল বলিল, চলুন না খানিক বেড়িয়ে আসি। যাবেন ? কোন অসুবিধা হবে না ত ?

মৃন্ময় কহিল, না অসুবিধে আবার কি। মাথাটা ধরেছে, বেড়িয়ে এলে একটু ভাল বোধ করব হয়ত।

মহীপাল বলিল, আপনার শরীরটা কি তেমন ভাল যাচ্ছে না মাষ্টার মশাই ?

বাধা দিয়া মৃন্ময় কহিল, না বেশ ভালই আছি ত। মাথাটা একটু ভারী বোধ হচ্ছে। তা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকার দরুনই বোধ হয়।

মহীপাল বলিল,আমি তিনবার এসে ঘুরে গেছি। আপনি কিন্তু একেবারেই পড়ছিলেন না। অথচ—

মৃন্ময় একটু হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ টের পেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি ডাক নি বলে আমিও সাড়া দিই নি।

মহীপাল বলিল, আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে আপনাকে দেখছিলাম।

স্মিত হাস্যে মৃন্ময় কহিল, অবাক হয়ে দেখবার কি ঘটেছিল মহী ?

মহীপাল বলিল, সে আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আপনাকে।

মৃন্ময় আবার হাসিল, বলিল, ও কিছু নয়—চলো কোথায় যাবে বলছিলে

না। কিন্তু যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের হইল না। লিলি খবর পাঠাইয়াছে এখনই বাংলোয় ফিরিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন আছে নাকি।

মৃন্ময় বলিল, তোমার দিদিমণি ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ আর তোমার সঙ্গে যাওয়া হ'ল না মহীপাল।

মহীপাল বলিল, সে ত শুনতেই পেলাম মাষ্টার মশাই। মৃন্ময় চলিয়া গেল।

মৃন্ময় বাংলোয় ফিরিবামাত্র লিলি আসিয়া হাসিমুখে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। খুশী হইয়া বলিল, খবরটা তা হলে ঠিক সময়ই পৌছে দিয়েছে মিনুদা।

তা দিয়েছে। মৃন্ময় কহিল, কিন্তু এমন জরুরী তলব কেন লিলি?

লিলি জবাব দিল, বলছি, কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নাও। তুমি হাত মুখ ধুয়ে বসো, আমি এখুনি নিয়ে আসছি। লিলি চঞ্চল চরণে প্রস্থান করিল।

মৃন্ময়ের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। লিলির চলায় বলায় অকস্মাৎ যেন প্রাণচাঞ্চল্যের জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু ভাবিবার সময় কম।

মৃন্ময় অল্পক্ষণেই হাত মুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিল। লিলিও সঙ্গে সঙ্গে হাজির—পিছনে লছমিয়া খাবার বহিয়া আনিয়াছে। আহার্য্যের প্রাচুর্য্যে মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, এ সব কি লিলি? সারাদিন বসে আজ কি এইগুলোই করেছ?

লিলি হাসিমুখে বলিল, নইলে সময় কাটাই কেমন করে মিনুদা। তোমার মত আমার জন্যে ত কেউ তাঁর পাঠাগার খুলে রাখেন নি—

মৃন্ময় পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলিল, তা রাখলেও তুমি পারতপক্ষে ওদিক মাড়াতে না। তার চেয়ে বোধ করি রান্নার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কারের দিকে তোমার আগ্রহ বেশী।

লিলি তেমনি হাসিমুখে জবাব দিল, তুমি মিথ্যে বলো নি মিনুদা, কিন্তু এই আবিষ্কারকে কখনো ছোট করে দেখো না। তোমাদের অধ্যয়ন আর গবেষণার চেয়ে এর মূল্য ঢের বেশী।

মৃন্ময় খুব একচোট হাসিল। লিলি চোখে-মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া কহিল, এটা বুঝি হাসির কথা হ'ল?

হয় নি বুঝি? মৃন্ময় বলিল, কিন্তু নিজেও যে হাসি চেপে রাখতে পারছ না লিলি। বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

লিলি সে হাসিতে যোগ দিল না। বলিল, এমনি করেই তোমরা সত্যকে

সব সময় অস্বীকার করো মিনুদা, কিন্তু এসব কথা এখন থাক, খাবারগুলোর একটা গতি করো।

মৃন্ময় কহিল, তুমি খাবে না ?

লিলি কহিল, এগুলো সবই তোমার একলার জন্তে এনেছি নাকি ? বলিয়া দ্রুত খাবারগুলি ভাগ করিয়া মৃন্ময়ের অংশ তার দিকে ঠেলিয়া দিল এবং নিজেরটা টানিয়া লইয়া কহিল, নাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, এত তাড়া কিসের লিলি—

লিলি কহিল, ঐ দেখ আসল কথাই তোমায় এখনও বলা হয় নি। আমার সঙ্গে একবার তোমায় যেতে হবে মিনুদা। আমার একটি ছাত্রীর কিছুদিন ধরে শরীর খারাপ যাচ্ছে—তার একটা খোঁজ নিয়ে আসব আর সেই সঙ্গে খানিকটা বেড়ানোও হবে।

মৃন্ময় বলিল, কোন্‌টা মুখ্য লিলি ?···

উত্তরে লিলি বলিল, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক মিনুদা। তার চেয়ে বলো ক্ষীরের লুচি কেমন হয়েছে ?

মৃন্ময় ততক্ষণে একটা লুচি মুখে পুরিয়াছে, সে ইঙ্গিতে জানাইল যে, জবাবটা সে পরে দিতেছে। মৃন্ময়ের রকম দেখিয়া লিলি কৌতুক বোধ করিল। অনেকদিন এমন সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাহার নিকট হইতে সে পায় নাই। হঠাৎ আজ মৃন্ময়ের কি হইয়াছে তাহা না বুঝিলেও একটা অকারণ পুলকে তাহার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

মৃন্ময় এতক্ষণে কথা কহিল, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক লিলি। এ যা তৈরি করেছ মনে হচ্ছে গবেষণা আর অধ্যয়নের চেয়ে এর স্বাদ অনেক বেশী। কিন্তু তোমার উপর আজ আমি রীতিমত চটে গেছি।

লিলি হাসিমুখে কহিল, ক্ষীরের লুচি আর সরপুরিয়া খাওয়ানোর জন্তে ?

মৃন্ময় বলিল, না—এতদিন ঠকিয়ে এসেছ বলে।

লিলির চোখ-মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, সত্যিই ভাল হয়েছে মিনুদা ? বাড়িয়ে বলছ না ত ?

মৃন্ময় পুনরায় একটা সরপুরিয়া মুখে দিয়া ইশারায় জানাইল যে, সে বাড়াইয়া বলে নাই।

অল্পক্ষণ পরে উভয়ে বাহির হইয়া পড়িল। হাসি গল্পে আজ সারাটা পথ মুখরিত করিয়া তাহারা আগাইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত লিলির ছাত্রীর বাড়ীতে

যাওয়াই হইল না। সেখানে গেলে হয়তো সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফেরা হইবে না এই অজুহাতে তাহারা সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। কিন্তু এ-যে নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা সে কথা তাহাদের মনের অগোচর রহিল না। কাছাকাছি একটা পাহাড়িয়া ঝর্ণার কাছে আসিয়া বসিয়া তাহারা অনেকটা সময় নীরবে কাটাইয়া দিল। অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া লিলি বলিয়া উঠিল, জান মিনুদা অনেকদিন পরে আজ আমার মনে হচ্ছে যে, আমি এখনও বেঁচে আছি। আমার দেহের রক্ত চলাচলের শব্দ আজ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। মানুষের মন বড় বিচিত্র মিনুদা। কিছুদিন আগেও মনে হয়েছিল যে, আমার আসল সত্তাটা যেন মরে গেছে। আজ মনে হচ্ছে ওটা ভ্রম, কিছুদিন অচেতন থাকবার পর নিজেকে যেন আজ আবার আমি ফিরে পেয়েছি।

মৃন্ময় নিঃশব্দে লিলির কথাগুলি শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিয়া বাধার সৃষ্টি করিল না। লিলি যেন ছোট্ট বালিকার মত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময়ের ভারি আশ্চর্য্য লাগিতেছিল।

লিলির কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল, এক এক সময় আমার মনে হয় মিনুদা যে, সুনির্ম্মল শত্রুতা করতে গিয়ে আমার বন্ধুর কাজই করেছে, নইলে তোমার সাক্ষাৎ···সহসা মৃন্ময়ের মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে মাঝ পথে থামিল। এক মুহূর্ত্তে সে অনেক চিন্তা করিয়া লইল—এতক্ষণ ধরিয়া সে যত কথা বলিয়াছে তাহা এক একটি করিয়া মনে পড়ায় নিজের কাছেই সে যেন ছোট হইয়া গেল। লিলির মুখে বড় সুন্দর একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিয়া পর মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। সে সংযমের রাশ দৃঢ় হস্তে টানিয়া ধরিল। প্রকাশ্যে কহিল, তুমি বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছ আমার রকম দেখে, না মিনুদা? অনেক দিন পরে পুরনো আর একঘেয়ে গণ্ডির বাইরে এসে হয় তো একটু আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল তাই ঐ ঝর্ণার জলোচ্ছ্বাস দেখে মনটাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তুমি সত্যিই অদ্ভুত মিনুদা।—লিলির কণ্ঠস্বরে বেদনা এবং হতাশার আভাস। মৃন্ময় তাহা লক্ষ্য করিল না বরং লিলির কথাটা এক প্রকার মানিয়া লইয়াই বলিল, ভয় ঠিক নয়, কিন্তু সত্যিই ভারি আশ্চর্য্য লাগছিল আমার।

লিলি বলিল, দিনরাত সর্ব্বাঙ্গ একটা মিথ্যা খোলসে ঢেকে রেখে নিজের আসল চেহারাটাকেও যেন ভুলে গিয়েছিলাম। যেমনি বাইরে এসে আত্মপ্রকাশ করতে গেলাম—তোমরা হলে বিস্মিত। বুঝলাম আমার আমিত্বটুকু মরে গেছে,

খোলসটাই সত্য হয়ে উঠেছে। সেই ভাল, সত্য আমার বুকের মধ্যেই থাক।...লিলির চোখে মুখে একটা স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়া উঠিল।

মৃন্ময় একটু জোরে ডাকিল, লিলি—

তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সত্যই লিলির এ যেন আর এক রূপ—যার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মৃন্ময়ের পরিচয় ঘটে নাই।

লিলি হাসিল। তার ঠোঁট দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চোখে গভীর উজ্জ্বল দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে জ্বালা নাই—আছে অন্তরের আকুতির প্রকাশ।

মৃন্ময় স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে পুনরায় ডাকিল, লিলি—

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া লিলি সাড়া দিল, জান মিনুদা ঠিক এই জন্যেই বহুদিন তোমার কথার অবাধ্য আমি হয়েছি। এখানে এলেই জীবনটা আমার গানের মত সুন্দর হয়ে ওঠে—তার রেশ আমায় মুগ্ধ করে...চঞ্চল ক'রে তোলে। আমি কান পেতে শুনি, সব ভুলে যাই। কিন্তু এখানে আর একটি মুহূর্ত নয়, এর পরে ফিরে যেতে প্রাণান্ত হবে।

লিলি তার এই ভাবান্তরের যত কৈফিয়ৎই দিক না কেন মৃন্ময়ের কাছে সে আজ আরও খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাপারটা মৃন্ময়কে নূতন করিয়া ভাবাইয়া তুলিল।

বাংলোয় ফিরিয়া লিলি সোজাসুজি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। মৃন্ময়ও তার ঘরে আসিয়া বিছানার উপর হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। এ ভাবে বেশ কিছু সময় কাটিল। কতক্ষণ তাহা তার নিজেরই হুঁস নাই। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে সে খানিক ঘুমাইয়া লইয়াছে। সহসা লিলির আহ্বানে চমকাইয়া উঠিল।

লিলি বলিল, ওকি সেই থেকে শুয়ে রয়েছ। বাইরের কাপড় জামা ছাড়তেও তোমার সময় হ'ল না। কত রাত হয়েছে তা জান? নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। খাওয়া-দাওয়ার কথাও কি ভুলে গেছ তুমি। নাও ওঠো—

লিলি প্রস্থান করিল।

...পরস্পরবিরোধী দুইটি রূপ। মৃন্ময় ভাবিল। নিভৃত নির্জ্জনতায় ঝরণাতলায় লিলির যে রূপের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল তার সহিত কোথাও যদি একবিন্দু মিল থাকে। আশ্চর্য্য!

লিলি পুনরায় দেখা দিল।

মৃন্ময় তখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

লিলি খানিক তার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি বলে গেলাম আমি মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, ভাবছি খাব না। তেমন খিদে নেই।

লিলি রাগ করিয়া বলিল, কথাটা আগে বললেই হ'ত, তা হলে আর রান্নার হাঙ্গামা পোহাতে হ'ত না।

মৃন্ময় কহিল, কেন তোমার জন্য—

লিলি হাসিল, কোন জবাব দিল না। কিন্তু আর দ্বিতীয় বার কোন অনুরোধ না করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই মৃন্ময় তাহাকে ডাকিল, দাঁড়াও লিলি, আমিও আসছি।

লিলি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খিদে না থাকলে জোর করে খাবার দরকার নেই মিনুদা। আমি বরং লছমিয়াকে সব দিয়ে দিচ্ছি।

মৃন্ময় কহিল, তা দিতে হয় দাও, কিন্তু তোমার ক্ষীরের লুচি আর সরপুরিয়া থাকে ত খানকয়েক দিয়ে যেও।

লিলি হাসিয়া প্রস্থান করিল। কিছু পূর্ব্বে তার চতুর্দ্দিকে যে খণ্ড মেঘের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মৃন্ময়ের শেষ কথায় তাহা এক নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

একটু বেলায় আজ মৃন্ময়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। এমন বড় একটা হয় না। প্রত্যূষে ঘুম ভাঙাটা তার নিয়মিত, যদিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন দিন সে শয়ন করে না। পড়াশুনা আছে—মাঝে মাঝে রাত জাগিয়া চুপচাপ বসিয়াও থাকে। কাল সারারাত অত্যধিক গরম গিয়াছে। শেষ রাত্রে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

লিলি ইতিমধ্যে বারকয়েক খোঁজ করিয়া গিয়াছে। মৃন্ময় দরজা খুলিতেই তাহার পুনরাবির্ভাব ঘটিল। সে কহিল, তোমার শরীর খারাপ নয় ত?

মৃন্ময় নিদ্রালস চোখে ক্ষণকাল লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, অসুখ হবে কেন—ঘুমটা সময়মত ভাঙে নি।

লিলি চলিয়া গেল এবং অল্প পরেই চা লইয়া উপস্থিত হইল। চায়ের পেয়ালা টিপয়ের উপর রাখিয়া মৃন্ময়ের হাতে একখানি চিঠি দিল। বলিল, কাল বিকেলের ডাকে এসেছে, লছমিয়া দিতে ভুলে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ নান্টুবাবুর চিঠি। লিলি প্রস্থান করিল।

চিঠিখানি নান্টুই লিখিয়াছে। মৃন্ময় তখুনি পড়িতে বসিল।

'মিনু'

তোমার দ্বিতীয় চিঠিও আমি যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু কিছুদিন ধরে নিজেকে নিয়ে একটু বেশী ব্যাপৃত থাকায় অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর হয় নি। কিন্তু মনে হচ্ছে জবাবটা এখন যদি না দিই তা হলে ভবিষ্যতে আবার কবে সময় পাব সে একটা সমস্যার কথা।

লীলা রাওয়ের সঙ্গে আমার শেষ পর্য্যন্ত বনল না। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলাম না। কি বিপুল অর্থের মালিক সে হয়েছে তা কল্পনা করতেও পারবে না। বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ের উপর তার নূতন বাড়ি হয়েছে। শুনতে পাই দশ লাখের বেশী তাতে খরচ পড়েছে। কিন্তু লীলা বলে, দশ লক্ষ টাকায় যে বাড়ী হ'ল তাকে নিরাভরণ রাখতে পারি না নান্টু— উপযুক্ত ভূষণের ব্যবস্থা করো।

তাকে জবাব দিলাম, এত পয়সা খরচ করে ওর দেহে যে সুষমা ফুটিয়ে তুলেছ, সে কি অলঙ্কারে ঢেকে রাখবার জন্যে? থাক না যেমন আছে তেমনি।

লীলা বুদ্ধিমতী, কথার ইঙ্গিতটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিয়েছে, এর পরে আর একটি কথাও সে আমায় না বলে নিঃশব্দে চলে গেল। আবার নূতন করে সুরু হ'ল আমার দেখাশুনার পালা। দশ লক্ষের মহিমা বৃদ্ধি করার জন্যে তাকে আরও লাখ দুই ব্যয় করতে হ'ল। কথা বলার পথ নিজেই যখন বন্ধ করে দিয়েছি, তখন চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে হ'ল, কিন্তু মন আমার বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। পয়সার এত বড় অপচয় ইতিপূর্বে আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। বিদেশী চিত্রকরদের ছবির প্রতিলিপি এল অনেক। ইটালিয়ান শিল্পী পিরে দি কসেমোর 'প্রোক্রিসের মৃত্যু', আলবার্ত্তানিলের 'সাক্ষাৎ', জেনতিল বেল্লেনির 'ম্যাহমেট', ক্রিভেল্লির 'ম্যাডোনা এবং শিশু', রাফায়েলের 'ম্যাডোনা ডি স্যান সিষ্টো' আজ লীলার ড্রয়িং রুমের শোভা বর্দ্ধন করছে। শুধু কি এই—নেদারল্যাণ্ডসের শিল্পী ভ্যানডাইক, জার্ম্মানীর ক্রানাথ, স্পেনের থামো এবং পুজিন, ফ্রান্সের দাভিদ ও করোত, ইংরেজ শিল্পী হগার্থ এবং উইলসনের ছবিও বাদ

পড়ে নি। আর এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবপত্র পাঠিয়েছে এক বিদেশী নামকরা কোম্পানী।

লীলাকে ডেকে বললাম, তোমার বয় বাবুর্চির এলাকায় আর একখানা ঘর পাওয়া যায় না লীলা ?

লীলা বিস্মিত ভাবে চেয়ে থাকে। এতটা হয়তো সে আশা করতে পারে নি। বললাম, নইলে একেবারেই যে হারিয়ে যাব।

লীলার চোখ মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল তীব্র শ্লেষ। বললে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমি কিছুই করি নি নান্টু।

বাধা দিয়ে একটু হেসে জবাব দিলাম, ঠিক সেইজন্যেই আমিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করতে চাইছি না লীলা।

লীলা রাগে অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সত্যিই আমি ওকে অপমান করতে চাই নি। কেনই বা করব। শুধু নিজের সত্তাকে আমি প্রাচুর্য্যের এই জঞ্জালের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাই না। এতে যদি কেউ ভুল করে রাগ করে তা হলে আমি নাচার। লীলা কিন্তু আমার কথায় এতই রেগে গিয়েছিল যে, পর পর দু'দিন আমার সঙ্গে কথাই বললে না। কতটুকু সময় সে বাড়ীতে থাকে। তৃতীয় দিনে তাকে সামনাসামনি পেয়ে গেলাম। আর নয়। তাকে ডেকে বললাম, আজ এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি লীলা। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'ল না। মনের সায় পেলাম না। তোমার দেওয়া ময়ূরপুচ্ছ আমার অসহ্য ঠেকছে।

মনে হ'ল লীলা যেন একটু চমকে উঠেছে, পরমুহূর্ত্তেই তার চোখমুখের ভাব বদলে গেল। রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে আমার মুখের পানে চেয়ে পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি কি আমায় ভয় দেখাতে চাও নান্টু ?

হেসে জবাব দিলাম, তুমি কি তাই মনে করো লীলা ?

লীলা পুনরায় দৃঢ় স্বরে বললে, যাচ্ছ যাও, কিন্তু আমাদের সম্পর্ক যেন এই-খানেই চিরদিনের মত শেষ হয়ে যায়।

বড় হাসি পেল লীলার শেষ কথাটায়। জবাব দিলাম, আমি মুক্তিই চাইছি লীলা।

লীলার মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল, বললে, দয়া করে এখানে না এলেই হ'ত। আমি নিশ্চয় তোমায় ডেকে আনি নি। ভাল না লাগে চলে যাও, তাই বলে তোমার জন্যে আমার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তিকে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ

করতে পারব না।

জবাবটা হাসিমুখেই দিলাম, তা সম্ভব নয় বলেই তো আজ আমার চলে যাবার প্রয়োজন হয়েছে লীলা। তুমি আরও বড় হও, আরও ঢের বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করো। আমি দূর থেকে শুনেই আনন্দ পাব। কাছে থেকে অংশীদার হতে আমি চাই না।

তখনকার মত লীলা চলে গেলেও বেরিয়ে পড়বার সময় সে এসে আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল। ওর চোখ মুখের ভাব কেমন থমথমে। কিন্তু লীলা অভিনেত্রী, একথা ভুলে যাই কেমন করে। স্মিতমুখে বিদায় চাইলাম।

লীলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে, এ কর্ত্তব্যবোধ তোমার এতক্ষণ কোথায় ছিল? সাবাস নান্টু—তোমার তুলনা মেলা ভার। মানুষের কৃতজ্ঞতা বলেও একটা বস্তু থাকা উচিত।

হাসিমুখেই জবাব দিয়েছি, কৃতজ্ঞতা বোধটা একটু বেশী মাত্রায় আছে বলেই এমন করে চলে যাচ্ছি লীলা।

মনে হ'ল লীলা একটু দমে গেছে। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যেতে না দিলে তুমি চলে যেতে পার?

এবারে আমার বিস্মিত হবার পালা। বললাম, এটাতো তোমার উপযুক্ত কথা হ'ল না। তুমি আমার চলে যাওয়ায় বাধা দেবে কিসের জন্য আর আমিই বা সে বাধা মানব কেন লীলা!

লীলা সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলে, কেন আমি কি তোমার কেউ নই? অন্ততঃ বান্ধবী বলেও কি দাবি করতে পারি না?

জবাব দিলাম, অবশ্যই পার লীলা, কিন্তু তারও একটা সীমা থাকা উচিত।

লীলা পুনরায় বললে, যখন কোন কথাই তুমি শুনবে না তখন আমি আর কি করতে পারি, কিন্তু এমন রিক্ত নিঃসম্বল অবস্থায় এই বিদেশে বিভুঁয়ে বিপদে পড়বে যে। না হয় কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যাও—

বললাম, না লীলা, তাও নেব না। আমার আদর্শকে বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাই না।

লীলার চোখ দুটি সহসা জ্বলে উঠল। সে তার আর এক মূর্ত্তি। আমি তার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথের মানুষ আবার পথেই এসে দাঁড়িয়েছি। আবার নূতন করে সুরু হ'ল একলা পথ চলা। কোথায় কখন

থাকি, কোথায় যাই তার কিছুই নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের কথাই লিখে গেছি। তোমার চিঠির জবাব এখনো দেওয়া হয় নি।

তোমার পাঠশালার পরিকল্পনাটি ভাল হলেও আমার মনে হয় এ কাজে তোমার হাত না দেওয়াই উচিত হবে। লোকে তোমায় ভুল বুঝবে। তা ছাড়া যে কাজের মধ্যে সত্যিকারের প্রেরণা থাকে না, তা কখনও সার্থক হয়ে ওঠে না। ওসব তোমার আমার জন্যে নয়। মিথ্যে শুধু জল ঘাঁটাই সার হবে—কাজ কিছুই হবে না। শুনতে পাই মঞ্জুও নাকি তোমারই মত কি সব কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। তোমাদের আজও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি মিনু। মনে মুখে তোমরা সম্পূর্ণ আলাদা। এর কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে? এর সার্থকতা কতখানি!

মনে হচ্ছে লিলির বেশ বুদ্ধি আছে। তাকে জানবার চেষ্টা করো না। তাতে খানিকটা বিপদ আছে। মানুষ সব সময়ই দোষ গুণ, সবলতা দুর্ব্বলতা নিয়ে মানুষ—যখন আত্মরক্ষা করবার আর কোন পথ থাকে না তখন তার বুদ্ধিকে ছাপিয়ে আর একটি বস্তু বড় হয়ে ওঠে—আমার এ কথাটা মনে রেখো মিনু।...

তোমার কাছে যাবার জন্য লিখেছ। কথা দিতে পারছি না। তবে পথ চলতে চলতে যদি ও রাস্তায় গিয়ে পড়ি সে আলাদা কথা।

আজ এই পর্য্যন্ত। খুব শীঘ্রই আবার চিঠি দেব।

ইতি—নান্টু'

চিঠিখানি শেষ করিয়া মৃন্ময় সযত্নে তাহা বাক্সে রাখিয়া দিল।

লিলি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মৃন্ময়কে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনুযোগ দিয়া কহিল, এখনও বসে আছ—চা খেতে হবে না?

মৃন্ময় একটু হাসিয়া কহিল, শুধু চা খাব?

লিলি কহিল, খানকয়েক ক্ষীরের লুচি এখনও আছে। খাও ত নিয়ে আসি।

মৃন্ময় বলিল, এ আবার একটা জিজ্ঞেস করবার কথা হ'ল নাকি। তোমার পেটুক মিনুদাকে আজও চিনলে না?

বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছে। আকাশ মেঘে ছাইয়া আছে। এখনো সূর্য্যের মুখ দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। মৃন্ময়

পুনরায় শুইয়া পড়িল। আজ আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। বিছানায় বসিয়াই মৃন্ময় চায়ের পাট শেষ করিয়া ফেলিল, লিলিকে বলিল, তোমার লছমিয়াকে দিয়ে মহীপালকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও, নইলে এসে আবার বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাবে।

লিলি হাসিয়া কহিল, আজ কি সত্যিই কোথাও বেরুবে না ঠিক করেছ?

মৃন্ময় কহিল, ঠিক তাই—

লিলি প্রস্থান করিল এবং খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। শরীর খারাপ তাই যেতে পারবে না এই কথা বলতে বলে দিলাম, কিন্তু ভাবছি এতে কি রেহাই পাবে? বরং আমার মনে হচ্ছে এতে তাকে আরও যেচে ডেকে আনা হচ্ছে।

মৃন্ময় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ লিলি। দেখ ত লছমিয়াকে ফেরাতে পার কিনা?

লিলি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তা হলে তোমাকেই উঠতে হবে। এতক্ষণে সে বহু দূরে চলে গিয়েছে। ছুটে না গেলে নাগাল পাওয়া যাবে না।

মৃন্ময় পুনরায় শুইয়া পড়িল। বলিল, তা হলে আর গিয়েও কাজ নেই। কিন্তু মহীপালের ভার তুমিই নিও। যা হোক কিছু বলে বিদায় করে দিও।

মৃন্ময়ের কথায় লিলি খানিক হাসিয়া অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হইল, বলিল, কি লিখেছেন তোমার নান্কুদা—ভাল আছেন ত? সত্যিই এই খাপছাড়া লোকটিকে মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে হয়। জান মিনুদা সংসারের ভিড়ের মধ্যে বহু লোকের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার কোন দিন হয় নি, কিন্তু যাদের সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানবার সুযোগ আমার হয়েছে তাদের পাশাপাশি রেখে মাঝে মাঝে আমি বিচার করে দেখি। বড় আশ্চর্য্য লাগে।

মৃন্ময় কহিল, হঠাৎ একথা কেন লিলি?

লিলি বলিল, এই ধরো সুনির্ম্মল, তার পরে তুমি, তোমার মুখ থেকে শুনে জানলাম নান্কুবাবুকে। কোন দিক দিয়ে এদের মধ্যে কি এতটুকু মিল আছে। সুনির্ম্মলকে চেনা সহজ, তুমি দুর্জ্ঞেয় না হলেও সহজবোধ্য নও, আবার নান্কুবাবু একেবারেই ধরাছোঁয়ার বাইরে। যতটুকু তার কথা শুনেছি তাতে মনে হয় আশ্চর্য্য মানুষ তিনি।

মৃন্ময় বলিল, আমার মনে হয় অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক এবং খাঁটি মানুষ এই নান্কুদা। জীবনের সুখদুঃখ ভালমন্দকে সহজভাবেই সে মেনে নিতে

পেয়েছে। তাকে কোন দিন চোখে দেখ নি বলেই তাকে আশ্চর্য্য মনে হয়। নইলে দেখতে তার সম্বন্ধে আমি এক তিল বাড়িয়ে বলি নি।

লিলি বলিল, এখানে আসবার জন্য লিখেছিলে না?

মৃন্ময় জবাব দিল, তা লিখেছিলাম, কিন্তু জানিয়েছে ঘটনাচক্র টেনে নিয়ে গেলে হয়ত এক দিন যেতেও পারি। লীলা রাওয়ের বাড়ী থেকে সে চলে গেছে। লিখেছে পথের মানুষ আবার পথেই এসে দাঁড়ালাম।

লিলি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলিল, বল কি মিনুদা। লীলা কেমন মেয়ে যে তাকে ছেড়ে দিলে!

মৃন্ময় কহিল, ধরে রাখবার শক্তি না থাকলে রুখবে কিসের জোরে লিলি। বাধা সে ঠিকই দিয়েছিল, কিন্তু নাঙ্কু হাসিমুখে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। আদর্শের যেখানে অপমান নাঙ্কু সেখানে নিয়তির মতই নিষ্ঠুর অথচ এমনি আশ্চর্য্য যে অনাবশ্যক রূঢ়তা তার কোন আচরণেই প্রকাশ পেতে দেখা যায় না। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, যে এই ভবঘুরে লোকটির যথার্থ মর্য্যাদা হয়তো কোনদিনই হবে না।

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বর সহসা আবেগপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে বলিতে লাগিল, প্রথম ছাত্রজীবনে বছর পাঁচ ছয় আমাদের একসঙ্গেই কাটে। আমাদের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। যেদিন সে কাউকে কিছু না বলে গৃহত্যাগ করেছিল, সেদিন থেকে তাকে দেখতাম কৃপার চক্ষে। কিন্তু এর পিছনে কারণ কিছু ছিল কি না সে খোঁজ পর্য্যন্ত আমরা কেউ নিই নি।

মৃন্ময় সহসা থামিল। বলিল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াবে লিলি?

লিলি উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া দিল। মৃন্ময় এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমাকে মিথ্যে বলব না লিলি। নাঙ্কুদা চলে যাবার পর তাকে ভুলে যেতে আমার খুব বেশী দেরি লাগে নি। জীবনের ছোট বড় নানা উৎসবের মধ্যেও তার কথা তেমন করে কোনদিন অনুভব করি নি। কিন্তু নাঙ্কু আমাকে এক দিনের জন্যও ভোলে নি—তার দুঃখের দিনেও নয়, সুখের দিনেও নয়। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে কোন বন্ধনকেই সে আজ পর্য্যন্ত পুরোপুরি স্বীকার করে নিতে পারলে না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তার সত্য পরিচয় হয়ত আজও আমি পাই নি।

মৃন্ময় থামিল। খানিক কি চিন্তা করিল। হয়ত এই অল্প সময়ের মধ্যে সে একবার তার অতীতের দিনগুলির কথাও একটু ভাবিয়া লইল। মৃদু কণ্ঠে

পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ এবং লজ্জা যে নান্টুদাকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম রূপার চোখে। তার চরম উত্তরও সে আমায় দিয়ে গেছে। মঞ্জুষাকে সে স্নেহ করত এ কথা আমি জানতাম, কিন্তু তা যে কত গভীর, এ কথা সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, তাকে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও মুক্তি দিয়ে। তাই তো আমার মধ্যে দেখা দিল দ্বিধা। একটা বিরাট সমস্যা এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল। আমি না পারলাম এগিয়ে যেতে, না পারলাম পিছিয়ে আসতে। সব দিক দিয়ে আমার ঘটল পরাজয়।

লিলি নিঃশব্দে শুনিতেছিল। বাহিরের থমথমে প্রকৃতির সহিত ঘরের আবহাওয়ারও যেন চমৎকার মিল হইয়াছে। মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, নিজেও সুখী হতে পারলাম না—অপরকেও সুখী করতে সক্ষম হলাম না। স্থির হয়ে একটা পথও বেছে নিতে পারি নি। কেমন যেন থেমে গেলাম। ঘরকেও স্বীকার করে নিতে সক্ষম হলাম না, পথে এসে দাঁড়াতেও ভয় পেলাম। মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি বোধ করি তাই কাজের জন্যে ক্ষেপে উঠি, কিন্তু এর পিছনে কোন প্রেরণা না থাকায় অল্পেই আবার দমে যাই। কথাটা নান্টুদা ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু আমি বাঁচি কি করে বলতে পার লিলি।

লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, তোমাকে এই মধ্যপথ ছাড়তে হবে মিনুদা। নইলে তোমার মনের জড়ভাব কোনদিন কাটবে না।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, কথাটা কি আমি বুঝি না মনে কর লিলি, তবুও কোন নির্দ্দিষ্ট পথে আমি অগ্রসর হতে পারছি না। চেষ্টা করে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসি। শেষ পর্য্যন্ত সবই মিথ্যে হয়ে যায়।

নিজের অজ্ঞাতেই লিলির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তোমার মনের উৎস মঞ্জুষা। তাকে বাদ দিয়ে তুমি নির্জ্জীব—তোমার দেহে রক্তের প্রবাহ নেই। কিন্তু এরই নাম কি বেঁচে থাকা মিনুদা? তোমার চারিদিকে শুধু পাষাণ-প্রাচীর—হয় সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে এসো নয় অযথা বিলাপ করো না।

লিলির সব কথা মৃন্ময়ের কানে গিয়াছে কিনা তাহা বোঝা গেল না, শুধু একটা কথাই সে বার বার আওড়াইতে লাগিল, মঞ্জুষাই তোমার মনের উৎস—

বাহিরে বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মৃন্ময় একটু নড়িয়া চড়িয়া স্থির হইয়া বসিল। লিলি উঠিয়া গিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে

লাগিল। শিয়রের দিকে আসিতেই মৃন্ময় বাধা দিয়া কহিল, ওটা খোলাই থাক লিলি—বড় ভাল লাগছে। জান তুমি ছেলেবেলায় বৃষ্টির সময় কেউ আমায় ঘরে আটকে রাখতে পারত না। মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে কতদিন যে লুকিয়ে ভিজেছি তার কি কোন হিসেব আছে। বলিয়া মৃন্ময় হাসিল।

লিলি বলিল, আজ আর সে মনও নেই, সে উৎসাহও নেই, শুধু অভ্যাসের দোষে জানালাটা বন্ধ করতে দিলে না মিনুদা।

জানালা-পথে বাহিরের বর্ষণক্লান্ত আকাশের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া মৃন্ময় বলিল, তুমি মিথ্যে বলো নি। তবুও মাঝে মাঝে কেন জানি না আমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করি। ক্ষণস্থায়ী একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েই মনটা অবসাদে আরও বেশী করে ভেঙে পড়ে। নান্তুদার মত ভাবতে চেষ্টা করি—যেখানে যার শেষ করে দিয়েছি সেইখানেই তার শেষ হয়ে যাক। কিন্তু পেরে উঠি না, বরং জের টানতে গিয়ে মন আরও বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

লিলি বলিল, যে ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ তার জন্যে অনুতাপ না করে হাতের পাশে আরও যে রয়েছে তার থেকে তুলে নিলেই পার মিনুদা—

মৃন্ময় বার বার মাথা নাড়িতে লাগিল, বলিল, এ তোমার উপযুক্ত কথা হ'ল না লিলি। এই যদি তোমার মনের কথা তবে কেন পড়ে আছ এখানে, কেন তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির এমন করে অপচয় করছ। যা নিজে পারছ না তা অপরের কাছে আশা করতে নেই।···

লিলির মুখে বড় বিচিত্র একটুখানি হাসি ফুটিয়া উঠিল। এ হাসি চোখে পড়িলে মৃন্ময় চমকিত হইত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি তখন বাহিরে নিবদ্ধ ছিল। মৃন্ময় মুখ ফিরাইতেই লিলি বলিল, এ একটা কথাই না। আমি পারি নি বলে আর কেউ পারবে না এ যুক্তি নয়। তা ছাড়া স্থান কাল এবং পাত্র ভেদে বিচার করা উচিত। কিন্তু এটা সব আলোচনা এখন থাক। বৃষ্টি থেমে গেছে—দেখি লছমিয়া ফিরে এল কি না। রান্নার ব্যবস্থা করতে হবে ত।

মৃন্ময় কহিল, তোমার এই বড় কাজটা আর কাউকে দিয়ে হয় না লিলি?

লিলির কণ্ঠস্বরে খানিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। মৃন্ময় বিস্মিত হইল। লিলি বলিল, আমারও সময় কাটাতে হয় যে—এই বড় কাজটাই বরং আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

বলিয়াই আর কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া দ্রুত ঘর হইতে চলিয়া গেল। মৃন্ময় শুধু তার চলার পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কোন জবাব

দিল না।

আরও কয়েক মাস গত হইয়াছে। মঞ্জুষার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা আজকাল রাধু বোষ্টমই করে। বড়ি আর পাঁপড়ের কাজ সে সুরুতেই বন্ধ করিয়াছে। সেলাই ফোঁড়াই এবং বহুবিধ মাটির মূর্ত্তি সেখানে তৈরি হইতেছে। কিন্তু তাদের উদ্যম প্রধানতঃ অন্য কাজে ব্যয়িত হইতেছে। মঞ্জুষার উৎসাহ সেইদিকেই বেশী। রাধুর ত কথাই নাই। এমন কি জীবানন্দ পর্য্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলেন, এতদিনে তোমরা ঠিক রাস্তায় চলতে সুরু করেছ। আজকের দিনে দেশের ও দশের জন্যে এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। মঞ্জুষার কাজের দিকে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। শহরের উপকণ্ঠে তাঁহার কয়েক বিঘা জমিতে আজ সোনা ফলিতেছে, এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন।

মঞ্জুষাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে। জীবানন্দ আজকাল প্রায়ই মেয়ের সহিত কাজকর্ম্ম দেখিতে আসিয়া থাকেন। সময় সময় নানা উপদেশও দেন।

মঞ্জুষা এবং রাধুর চেষ্টায় অভাবগ্রস্ত বহু পরিবারের অন্নসংস্থান হইয়াছে। যাহারা অকারণে ভিড় করিয়াছিল তাহারা বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। রাধু বোষ্টম তাহাদের চলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। উহারা কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছিল।

মঞ্জুষা উহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিয়াছিল, কোথায় যাবে ওরা বোষ্টমদা, থাক না যে ক'দিন একটা ব্যবস্থা করে নিতে না পারে। বিপদে পড়েছে যখন—

বাধা দিয়া রাধু জবাব দিয়াছিল, পরের পয়সায় দয়া দেখাবার লোভ যখন আমি সম্বরণ করেছি তখনই তোমার বোঝা উচিত যে, ওরা নিতান্তই অপাত্র। আমি শুধু আগাছা সাফ করছি। ওরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত নয়, অথচ যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। শুধুই কি তাই— এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়াটাকেই যেন বিষাক্ত করে তুলেছিল। কিন্তু অপাত্রে কৃপা দেখানও পাপ দিদি। তুমি কি মনে কর যাদের আমি বিদায়

করে দিয়েছি তারা সত্যিই বিপদে পড়ে এসেছিল? তা নয়, বরং বিপন্নদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্যই সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ইহার কোন জবাব মঞ্জুষা খুঁজিয়া পায় নাই। রাধু মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল—মঞ্জুদিদি কি ভাবিল কে জানে। তবে এ কথাও ঠিক যে, রাধু তার নিজের জন্য একটা কথাও বলে নাই।

কিছুদিন যাবৎ কোনকিছুতেই মঞ্জুষার তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। যতই সে প্রতিষ্ঠানের নানা কাজের খুঁটিনাটি তলাইয়া দেখিতেছে ততই মানুষের মনের একটা অতি কদর্য্য নোংরা দিক তার কাছে প্রকাশ পাইতেছে। অথচ একথা বলিবে সে কাহাকে। তাহার চোখে পৃথিবীর চেহারাটাই যেন বদলাইয়া যায়—মানুষের উদগ্র লোভ, উৎকট স্বার্থপরতা তার মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। রাধু বলে, তোমার প্রতিষ্ঠান ত তাদেরই জন্যে দিদি যারা কতকগুলো অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়।

মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু দেখে শুনে যে নিজের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলছি বোষ্টমদা। এ সব কি দেখছি—

রাধু খুব একচোট হাসিল। বলিল, নূতন কিছুই নয়। পাপ চিরদিন এমনি ভাবে ছিদ্রপথ দিয়েই প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। তোমার চোখে এই ঘটনাগুলো অভিনব বলেই তুমি বেদনা পাচ্ছ। তা ছাড়া সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশেরই এ সব কাজে সায় আছে, কিন্তু আসল কথা হ'ল এটা যাতে না বাড়তে পারে সে চেষ্টা করা।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু যেদিকে তাকাই আশার আলো ত কোথাও চোখে পড়ে না বোষ্টমদা। এত নীচাশয়তা হীনতার মধ্যে মুষ্টিমেয় ক'জন তোমরা কতক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

রাধু শান্ত কণ্ঠে বলিল, তুমি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখছ দিদি। ভুলে যেও না যে, এই মন্দ লোকগুলোও এক দিক দিয়ে সমাজের উপকার করে। এরা মানুষকে নীচে টেনে আনবার চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু এদের অত্যাচার উৎপীড়নে অনেকে আবার আত্মনির্ভরশীলও হয়ে ওঠে। আজ যে ক'টি মেয়ে তোমার আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে তারা নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখবে—জীবনযাত্রার একটা সুষ্ঠু পথও নিজেরাই বেছে নেবে এ তুমি দেখে নিও।

মঞ্জুষা কহিল, তোমার এসব কথা আমি মেনে নিতে পারছি না।

রাধু বলিল, সেটা তোমার দোষ নয়—দোষ আমার। আমি হয়ত ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারি নি, কিন্তু চোরের উপর রাগ করে ঘরের দরজা খুলে রাখার যুক্তিকেও মেনে নেওয়া যায় না দিদি।

মঞ্জুষা হাসিল, বলিল, রাগ অভিমানের কথা এটা নয়, তা ছাড়া তুমি জান যে, আজকের এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম শুধু সাময়িক প্রয়োজনে নয়, সেকথা তোমরা এখন বিশ্বাস করবে না, কিন্তু মিনুদা জানে আমার মনের কথা। কত স্বপ্নই না দেখেছি···মঞ্জুষা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

রাধু বলিল, অথচ আজ যখন তোমার সেই স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠতে চলেছে, তখনই তুমি পিছিয়ে পড়বে দিদি।

—মঞ্জুষা নীরব।

রাধু একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আজকের দিনে সাহায্যের প্রয়োজন যাদের সবচেয়ে বেশী তাদের তুমি প্রতিপালন করছ। যারা এদের এমন ক'রে সর্ব্বহারা করেছে, তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

মঞ্জুষা ধীরে ধীরে বলিল, পিছিয়ে পড়া ঠিক নয় বোষ্টমদা। তোমার কথা যে ঠিক বুঝতে পারছি না তাও নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় কোন কিছুতেই যেন আমার প্রয়োজন নেই। মনটা অবসাদে ভেঙে পড়ে। কোন প্রশ্ন করো না, আমি জবাব দিতে পারব না বোষ্টমদা।

রাধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, প্রশ্ন করে সব কথা জানতে হবে কেন মঞ্জুদিদি, কিন্তু থেমে গেলে ত তোমার চলবে না। ওদের চলার পথ থেকেই পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে আমাদেরও যে চলতে হবে।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি—

মঞ্জুষা মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিন্তু পাথেয় নিয়ে মন যে ভরে উঠছে না বোষ্টমদা, বরং অন্তরের শূন্যতা দিন দিন আরও অতলস্পর্শ হয়ে উঠছে যে।

রাধু চুপ করিয়া রহিল—কথা কহিল না।

মঞ্জুষা বলিতে লাগিল, মন যখন পরিপূর্ণ ছিল, তখন মনে কত পরিকল্পনা করেছি, সবকিছুকেই সুন্দর বলে মনে হয়েছে, কিন্তু আজ আর কিছুই মনকে আকর্ষণ করতে পারছে না। বরং মনে হচ্ছে সবই যেন নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাধু যখন মুখ তুলিল তখন নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সে মৃদু কণ্ঠে কহিল, অথচ তুমিই

তাকে দিলে ফিরিয়ে। মুখের উপর দরজাটা চিরদিনের জন্য দিলে বন্ধ করে। এর কি সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল? কি বলব তোমায় দিদি—তোমাদের মত লেখাপড়াও শিখি নি, তেমন করে ভাবতেও জানি না, তবুও মনে হয় জেনে শুনে কাজটা তুমি ভাল কর নি। তাকেও ঠকালে নিজেও ঠকলে।

মঞ্জুষা তেমনি শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, ঠকা জেতার কথা এটা নয় বোষ্টমদা। কিন্তু এ ছাড়া আমার যে আর কোন পথ ছিল না।

রাধু বলিল, এটা তোমার অহঙ্কারের কথা।

কোথা দিয়া কি হইল বোঝা গেল না, কিন্তু মঞ্জুষা সহসা বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, কেনই-বা থাকবে না আমার অহঙ্কার। আমি কি তার কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু কেন সে অমন করে আমায় এড়িয়ে চলে গেল। এর পর যদি তার ফিরে আসার পথ আমি বন্ধ করে দিয়ে থাকি সেটা কি অন্যায় করেছি! না, আমার অপরাধ হয়েছে?

তার এই আকস্মিক উষ্মায় প্রথমটা রাধু একটু বিস্মিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাব কাটাইয়া উঠিয়া স্বাভাবিক সুরে কহিল, অপরাধ করেছ এমন অনুযোগ তো তোমায় কেউ দেয় নি দিদি, শুধু তোমার মনের কথাটাই আমি বলবার চেষ্টা করেছিলাম।

এ কথার মানে বোষ্টমদা? মঞ্জুষা বলিল।

রাধু তেমনি মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলিল, সে কথাও কি আমাকেই বলে দিতে হবে?

তোমার নিজের অন্তরের কাছে নিজেরই আচরণের সায় নেই বলে আজ ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নটা তোমার মনে দেখা দিয়েছে। মিছিমিছি আমারই উপর না হয় রাগ করলে, কিন্তু তাতে সত্য কখনও চাপা পড়বে না।

মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিয়া বলিল, আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না দিদি—

মঞ্জুষা যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিতে লাগিল, তোমাকে মাঝে মাঝে বড় অদ্ভুত মনে হয় আমার। মনে হয় তোমার জীবনে কি যেন একটা গভীর রহস্য রয়ে গেছে যার কোন খবরই আমরা জানি না।

রাধু জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, হঠাৎ এতদিন পরে একথা তোমার মনে উঠল কেন দিদি?

মঞ্জুষা কহিল, তা তো জানি না বোষ্টমদা—মনে প্রশ্ন জাগে তাই বললাম। যে

রাধু বোষ্টম ভিক্ষে করে দিন কাটাত, দিনরাত গান গেয়ে জগৎ-সংসার ভুলে থাকত তাকে যেন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

রাধুর চোখে মুখে যেন একটা চাপা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। প্রকাশ্যে বলিল, কাজের সময় তো বোষ্টম কোন দিন অকাজে মন দেয় নি দিদি। তা ছাড়া গানটা ছিল তখন পেশা আর নেশা দুই-ই।

হয় তো তাই হবে। মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমার মন বলে এ কখনও সত্য হতে পারে না। তুমি যেন মুখোস পরে তোমার আসল রূপটাকে লুকিয়ে রেখেছ।

রাধু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তা হলে নিশ্চয় কোন পলাতক খুনী আসামী।

মঞ্জুষা বলিল, তুমি হাসছ। রহস্য করে নিজেকে খুনী আসামীও বলছ, অশিক্ষিত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টাও কিছু কম কর নি, কিন্তু তোমার নিজের আচরণই তোমার উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

রাধু তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল, সঙ্গগুণে অনেক কিছুই সম্ভব হয় দিদি। এত দিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও যদি দুটো চারটে ভাল ভাল কথা শিখতে না পারি তা হলে আর হ'ল কি! পরশপাথরের ছোঁয়া পেলে লোহাও যে সোনা হয়ে ওঠে!

মঞ্জুষা কহিল, ওটা গল্প মাত্র—কোন প্রমাণ নেই। কোন ক্ষেত্রে এরূপ হয়েছে বলে অন্ততঃ আমার ত জানা নেই।

রাধু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যত অপরাধ বুঝি রাধুবোষ্টমের। তার বেলায় কোন প্রমাণের দরকার হয় না?

মঞ্জুষা কহিল, তার প্রমাণ ত তুমি নিজেই বোষ্টমদা। দেখতেও পাচ্ছি শুনতেও পাচ্ছি। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল—তোমাকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে এ কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি বোষ্টমদা। কথাটা প্রায়ই আমি ভাবি, আজ হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছি—সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্যে নয়। মঞ্জুষা থামিল।

রাধু কোন জবাব না দিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর এক সময় রাধু মুখ তুলিয়া চাহিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, আমার একটা কথার জবাব দেবে দিদি?

মঞ্জুষা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

রাধু বলিতে লাগিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আমার মধ্যে যে রহস্য আছে, এ সন্দেহ তোমার মনে জাগল কেন ?

মঞ্জুষা কহিল, এ কৌতূহল আজকের নয়—বহু দিনের। তোমার নানা কাজ দেখে এবং কথা শুনেই মনে হয়েছে তুমি যে রূপে আমাদের কাছে পরিচিত তার চেয়ে তুমি সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি নিজেকে গোপন করে রেখেছ।

রাধু বলিল, সন্দেহ নিছক সন্দেহই দিদি।

অনেক ক্ষেত্রে আবার তা সত্যও হয়—মঞ্জুষা বলিল, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধু বোষ্টমের আসল পরিচয়টা কি তা জানবার জন্যে মনে একটা কৌতূহল ছিল এইমাত্র। সে কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও কোন আপশোষ থাকবে না।

মঞ্জুষা থামিল।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মনে হইল রাধু কিছু ভাবিতেছে। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিল। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। ইস! অনেক বেলা হয়ে গেল যে। বলিয়া মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং রাধুকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিল, এ নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। কিন্তু ওকি তুমিও উঠছ যে? এতখানি বেলায় তোমাকে না খাইয়ে তো ছাড়া হবে না বোষ্টমদা।

রাধু বিব্রত হইয়া বলিল, সে কেমন করে হয় দিদি? ঘরের লোক যে আবার আমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবে।

মঞ্জুষা হাসিয়া বলিল, তা থাকলেই বা খানিক বসে। তার চোখে মুখে হাসি দেখা দিল। বলিল, মেয়েদের ওতে কষ্ট হয় না। আর বল তো না হয় নিতাইকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিই।

রাধু একটু কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, আমি বলছিলাম—কি দরকার খামোকা হাঙ্গামায়।

জীবানন্দের আহ্বানে মঞ্জুষা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সে ভাবনা তোমার নয় বোষ্টমদা। নিতাইকে আমি এক্ষুণি তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জুষা দ্রুত প্রস্থান করিল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাধু বোষ্টমকে মঞ্জুষার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে প্রায় একটা বাজিল। রাধু বলিল, এমন খাওয়া ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এত যে খেতে পারি তাই কি ছাই আগে জানতাম।

মঞ্জুষা মৃদু হাসিয়া বলিল, জানলে তবেই কিন্তু তোমার ভোলার প্রশ্ন আসে বোষ্টমদা।

রাধু প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও পরমুহূর্তেই হাসিমুখে কহিল, তা ঠিক। যদি নাই জানলাম তবে ভুলব কেমন করে? কিন্তু কথাটা আর একটু খুলেই বল দিদিমণি। তুমি কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মঞ্জুষা বলিল, এমন কিছু দুরূহ কথা আমি বলিনি বোষ্টমদা, যে না বোঝার ভান করছ।

একটু থামিয়া পুনরায় সে বলিল, আচ্ছা বোষ্টমদা, তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে?

রাধু বোষ্টমের চেহারা অকস্মাৎ যেন বদলাইয়া গেল। তার চোখের দৃষ্টি গভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে চোখ বুজিল, তার সমস্ত সত্তা যেন কোন গভীর অতলে ডুবিয়া গেছে। মঞ্জুষা বিস্ময়ভরা চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, কোন কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু রাধু চোখ চাহিতেই মঞ্জুষার মুখ হইতে আপনিই বাহির হইয়া আসিল, তোমার হ'ল কি বোষ্টমদা?

রাধুর মুখখানি স্নিগ্ধ হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মৃদু কণ্ঠে বলিল, পড়ে বৈকি দিদি। বড় বেশী করেই মনে পড়ে।

মঞ্জুষা কহিল, কিন্তু ভুলেও ত তাদের কথা কোন দিন তুমি বল না।

রাধু একটুখানি হাসিল, বলিল, এমন আগ্রহের সঙ্গে কোন দিন শুনতে চাও নি বলেই হয়ত বলি নি দিদি।

রাধু খানিক কি চিন্তা করিয়া লইল, তারপর মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, আমার মাতৃ-পিতৃ-পরিচয়ের দুটো দিক আছে। তা একদিকে যেমন গর্ব্বের অন্যদিকে তেমনি লজ্জার। আমার বাপ মা দু'জনেই ছিলেন খাঁটি মানুষ, কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট যে, এমন পিতামাতার সন্তান হয়েও সংসারে নিজের

সত্য পরিচয় দিতে পারলাম না। এইটে আমার মায়ের অমোঘ আদেশ। ফলে না হতে পারলাম একান্তভাবে মায়ের, না পেলাম বাবাকে। অথচ বিচার করে দেখতে গেলে তাঁরা কেউই কারুর চেয়ে ছোট নন। কিন্তু আমি ভুলতে পারি নে যে, আমি মা এবং বাবা উভয়েরই সন্তান। না না, চমকে উঠো না দিদি—আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না।

রাধু মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মায়ের কাছে তথাকথিত ধর্ম্মের অনুশাসন এবং সমাজই হয়ে উঠল বড়। সমাজকে উপেক্ষা করে পারলেন না তিনি বাবাকে মেনে নিতে—এইখানেই জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। আমার বয়েস তখন কতই বা হবে। শুনেছি বছর ছয়-সাত। মা আমার বাবাকে মেনে নিতে না পারলেও আমাকে ছাড়তে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে বাবার হ'ল চিরবিচ্ছেদ—বাবাকে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হ'ল। কিন্তু কাউকে তিনি অনুযোগ দিলেন না। সকল অপমান আর লাঞ্ছনা প্রাপ্য হিসেবেই মাথা পেতে নিলেন।

তারপর কত দিন, কত বছর চলে গিয়েছে, কিন্তু আমার আজও সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বাবার মুখে সর্ব্বস্ব হারানোর যে ছবি ফুটে উঠেছিল আমার পরবর্ত্তী জীবনে তা একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

রাধু থামিল। তার মুখখানি যেন বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হয়তো অতীত জীবনের কথা নূতন করিয়া ভাবিতে গিয়া তার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। মঞ্জুষা তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, না বুঝিয়া সে রাধু বোষ্টমকে না জানি কত বড় আঘাত করিয়া বসিয়াছে।

মঞ্জুষা স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, বোষ্টমদা—

রাধু বোষ্টম সাড়া দিল। তার কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হইয়া উঠিল।

মঞ্জুষা পুনরায় বলিল, থাক বোষ্টমদা। ওসব শুনে আমার দরকার নেই।

রাধু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে দিদি। সবটুকু না শুনলে হয়তো আমার মা বাবার উপর অবিচার করে বসবে। কিন্তু আগে তোমার নিতাইকে এক গ্লাস জল দিতে বল দিদি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মঞ্জুষা ডাকিয়া বলিয়া দিতেই নিতাই এক গ্লাস জল দিয়া গেল। রাধু এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছি যে, আমরা মামার বাড়ীতে আছি। মামাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। তাঁদের পয়সায় এবং তত্ত্বাবধানে আমার পড়াশুনো চলতে লাগল। মা

সারাদিন তাঁর পাথরের বিগ্রহ গোবিন্দকে নিয়েই [illegible]
সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া। কত জননীকেই দেখেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আমার মায়ের একতিল মিলও খুঁজে পাই নি। আমার কাঙাল মন মায়ের দুটো মিষ্টি কথা শুনবার জন্য সব সময় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। সময় পেলেই তাঁর ঠাকুর-ঘরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম। বেশ মনে পড়ে, এক দিন ধরা পড়ে গেলাম। যেন একটা অন্যায় কাজ করেছি এমনি কুণ্ঠিতভাবে মায়ের মুখের পানে তাকিয়েছিলাম। মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। তার পর সে কি কান্না তাঁর! বিস্মিত হয়েছিলুম, তখন বুঝি নি, কিন্তু এখন বুঝি জীবনের কত বড় ব্যর্থতা নিয়ে তিনি ঐ ঠাকুরঘরে দিন-রাত পড়ে থাকতেন। আজীবন মা শুধু পাথরের মধ্যেই সত্যের সন্ধান করে গেলেন, আসল সত্যকে আর পেলেন না।…

রাধু একটু থামিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, মার মনের দুর্ব্বলতা তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাই সত্যকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরে গেলেন। আমার বাবা মায়ের কাছে থাকবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর ভদ্র মন, ব্যক্তিত্ব এসবকে কেউ উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলে না। জ্ঞান হয়ে কতবার মাকে বাবার বিষয় প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোন উত্তর পাই নি। তিনি শুধু অসহায় দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে চোখের জল ফেলেছেন আর আমি দিনের পর দিন অধীর আগ্রহে পাগলের মত হয়ে উঠেছি। দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি তিনি বাবার সম্বন্ধে গোটাকয়েক অসম্মানসূচক উক্তি করে আমায় বিদায় করে দিয়েছেন। প্রতিবাদ করলে পাছে আরও কটূক্তি করেন এই ভয়ে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে আমাকে পালাতে হয়েছে।

রাধু থামিল। মঞ্জুষার মুখ দেখিলে মনে হয় সে স্বপ্ন দেখিতেছে। মুখে তার কথা নাই, শুধু দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, মনে রূঢ় আঘাত পেয়ে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করতে মায়ের কাছে গেলাম। দাদু বাবার সম্বন্ধে যে সকল অপমানকর কথা বলেছেন সেগুলোর উল্লেখ করলাম।

মা আমার প্রশ্নের জবাবে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তোমার বাবাকে ওঁরা জানেন না বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত বড় অসম্মানসূচক কথা বলতে পেরেছেন। তোমার বাবা নিন্দা-সুখ্যাতির অনেক উপরে সাধু।

এর পরে পারতপক্ষে আমি আর মার কাছে বাবার কথা তুলি নি। আমি লক্ষ্য করেছি বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। তাই তো আজও মাঝে মাঝে ভাবি যে, এত বড় শ্রদ্ধা, এতখানি গভীর ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষে রেখেও কেমন ক'রে বাবাকে মা বিদায় করে দিতে পেরেছিলেন। এ প্রশ্নের উত্তর আজও আমি পেলাম না।...

রাধু কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বাবা আমার ঠাকুরদাদার ঔরসজাত হলেও তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যময়।...

বোষ্টমদা—মঞ্জুষা আর্ত্তকণ্ঠে বাধা দিল।

রাধুর মুখে খানিক ব্যথামিশ্রিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলিল, বাধা দিও না দিদি। আমাকে বলতে দাও। আরম্ভ যখন করেছি তখন শেষ করতে দাও। রাধু থামিল, একটু দম লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, মোটের উপর ঠাকুরদাদার বিবাহিতা স্ত্রী বাবাকে লালনপালন করেছিলেন মায়ের ভূমিকা নিয়ে। সত্য বৃত্তান্ত জানতেন আমার ঠাকুরদাদা, তাঁর স্ত্রী আর বাবার গর্ভধারিণী। দাদু আর যাই হোন, একথা সত্য যে, তাঁর বিচার-বিবেচনা ছিল। তিনি বাবাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন তাঁকে রীতিমত উচ্চ শিক্ষা দিয়ে। কিন্তু গোল বাধল দাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে। ঠাকুরমার স্বার্থবুদ্ধি আমাদের চরম সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করে দিলে। বাবার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সমস্ত বিশ্বসংসারের কাছে তিনি ঘৃণা ও কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ালেন।

মঞ্জুষা সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার মা আর দশ জনের মত বিমুখ হয়ে সরে দাঁড়ালেন কোন যুক্তিতে বোষ্টমদা। তিনি ত তোমার বাবাকে জানবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।

রাধু শান্তকণ্ঠে বলিল, এর উত্তর তিনিই দিতে পারতেন দিদি। কথাটা জানবার সুযোগ আমার কোন দিন হয় নি। তাই আজও এটা একটা জটিল প্রশ্ন হয়েই আমার মনে জেগে আছে। তবে মনে হয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অথবা অন্ধ সংস্কারের মোহে তার আসল সত্তার অপমৃত্যু ঘটেছিল। এর জন্যে দায়ী আমার দাদামশাই আর আমার বড়মানুষ মামারা। কথাটা যেদিন বুঝতে পারলাম তার পর আর একটি দিনও আমি সেখানে থাকি নি। মাকে প্রণাম করে বললাম, এবারে আমাকেও বিদায় দিতে হবে মা। আমার আসল

পরিচয় যাকে নিয়ে তাঁর যেখানে স্থান হ'ল না, আমারও সেখানে থাকবার অধিকার নেই। কাজেই আমার যথাযোগ্য স্থান আমায় খুঁজে নিতে হবে। মা ভাবলেশহীন চক্ষে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ছুটে গেলেন ঠাকুরঘরে। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। বহুক্ষণ মা নিস্পন্দভাবে পড়ে রইলেন পাষাণ-বিগ্রহের পদতলে—তার পরে নির্ম্মাল্য হাতে উঠে এলেন। আমার মাথায় ঠেকিয়ে পুনরায় গিয়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকলেন। একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল না, শুধু মনে হ'ল যেন কিছু বলতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। আমি মায়ের মৌন আশিস সম্বল করে বেরিয়ে পড়লাম।

আবেগে রাধুর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। মুখের ভাব কেমন করুণ বিমর্ষ।

মঞ্জুষাও নির্ব্বাক বিস্ময়ে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছে।

রাধু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থির পদক্ষেপে একবার গিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। মাথার ভিতরটা তার যেন একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছে। বাহিরে রাস্তা জনবিরল। একটা চকচকে মোটরগাড়ী হাওয়ার বেগে ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই শব্দ হইল ঠং ঠং। রাস্তার মোড়ে একটা রিক্সা গাড়ী দেখা দিয়াছে। পাশের বাড়ীর ছাদে একটা চিল থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

রাধু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। মঞ্জুষার মুখের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, আমি চলে যাচ্ছি শুনে দাদা-মশাই অনেক কথাই বললেন।

আমাকে চুপ করে থাকতে হ'ল মায়ের কথা ভেবে। কথার জবাব দিতে গেলে মায়ের অশান্তিকেই আরও বাড়িয়ে তোলা হবে। মুখে তাঁর লাগাম নেই। কথার কোন শ্রী ছাঁদ নেই। কি বলতে আবার কি বলে বসবেন—

কিন্তু শেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন বাবার সাক্ষাৎ পেলাম তখন বিস্ময় আমার সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনিও আমায় নিজের কাছে রাখতে রাজী হলেন না। কাছে বসিয়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি এখন বড় হয়েছ, তোমার বুদ্ধিবিবেচনা হয়েছে। হয়তো সব কথা শুনেও থাকবে, তাই বলছিলাম তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও সানু।

আমি সোজা হয়ে বসে তাঁর মুখের পানে তাকালাম। কি গভীর তাঁর দুই

চোখের দৃষ্টি। কিন্তু সেখানে কারুর বিরুদ্ধে তিলমাত্র অভিযোগ নেই। আমি যা বলতে উদ্যত হয়েছিলাম তা আর বলা হ'ল না। তিনি একটু হেসে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কিছু বলতে চাইছ সানু? স্পষ্ট এবং সত্য কথা শুনতে আমি খুব ভালবাসি।

আমি বললাম, আমি তো ফিরে যাবার জন্যে আসি নি বাবা। তা ছাড়া যেখানে আমার বাবাকে অপমান করা হয়েছিল, যেখানে তাঁর কথা নিয়ে চলে ব্যঙ্গবিদ্রূপ সেখানে আমার থাকা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে ও আদেশ করবেন না।

বাবার মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল। তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, কিন্তু অন্যের উপর রাগ করে তুমি নিজের মাকে এত বড় শাস্তি দিতে চাইছ কোন বুদ্ধিতে সানু। তোমার মায়ের বুক একেবারে খালি হয়ে যাবে যে। নইলে আমারই কি ইচ্ছে করে না আমার ছেলেকে নিজের কাছে রাখি। এর পরে বাবা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে তিনি বললেন যে, যদি তোমার মা রাজী হন তো আমরা কলকাতায় আলাদা ভাবেই থাকতে পারি। খরচপত্র তিনিই চালাতে পারবেন। তিনি আরও বললেন, তুমি মানুষ হয়ে ওঠ। মনুষ্যত্বকে মর্য্যাদা দিতে শেখ। সাময়িক উত্তেজনাবশে কোনকিছুর উপর অকারণে বিরূপ হয়ে উঠ না—যদি হও, তা হলে সে হবে মস্ত বড় ভুল।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, একথা কেন বাবা? আমার আন্তরিকতায় কি আপনার বিশ্বাস নেই?

তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায়ই বললেন, সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এমন কথাও বলতে পারি নে সানু। তুমি দুঃখ পেতে পার কিন্তু··· এই পর্য্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন।

ফিরে এসে দেখি মামার বাড়ীর দরজাও আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে দেখা করা প্রয়োজন। অথচ তা যে সহজসাধ্য নয়, একথা ভেবে চিন্তিত হলাম।

রাধু বোষ্টম থামিল, সে উত্তেজনায় হাঁপাইতেছিল। খানিক দম লইয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিল, প্রথমে কথাকাটাকাটি, তার পরে রীতিমত উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি সুরু করে দিলাম। সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর শুনেই মা ব্যস্তভাবে ছুটে বাইরের মহলে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নিঃশব্দে কাঠের পুতুলের মত

দাঁড়িয়ে থেকে দাদামশায়ের বক্তব্য শুনলেন, তার পরে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের জন্যে একে একে সকলকে আমি হারাতে পারি না বাবা। আমার ছেলের যদি এ বাড়ীতে স্থান না হয় তা হলে আমাকেও তুমি বিদায় দাও।

দাদামশাই চিৎকার করে উঠলেন, তবু তোর ছেলের অন্যায়টা চোখে পড়ল না নারায়ণী ?

মা তেমনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, ন্যায় অন্যায়ের কথা এখানে না তোলাই ভাল বাবা, তা হলে আমার নিজের কাজের বিচার সবার আগে হওয়া উচিত। সান্নু আমার চেয়ে বেশী অন্যায় করে নি। তিনি ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। বুঝলে মঞ্জুদিদি এই হ'ল আমার মা—

রাধু চোখ বুজিল, সম্ভবতঃ সে তার মাকে মনে মনে স্মরণ করিল। মঞ্জুষা আগ্রহভরে রাধুর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধু পুনরায় বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, কিন্তু দিদি মানুষ ভাবে এক হয় আর। আমার স্বপ্ন, আমার কল্পনা সব দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কট-সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত বাবার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম।

অজ্ঞাতেই মঞ্জুষার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তিনি মারা গেলেন।···

রাধু বোষ্টম শান্ত স্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ মারা গেলেন, কিন্তু এইখানেই সব শেষ হ'ল না। মা কেমন আশ্চর্য্যরকম বদলে গেলেন। সেই যে লালপেড়ে শাড়ী আর মাথাভরা সিন্দুর নিয়ে তিনি ঢুকলেন ঠাকুরঘরে আর বেরুলেন না। মা জীবন দিয়ে হয়তো তাঁর আজীবনের সাধ মিটিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি বাঁচি কি করে—কোথায় যাই—রাজ্যের যত প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে এসে আমাকে বিহ্বল করে ফেললে। কর্ত্তব্য হিসেবে খবরটা দাদামশাইকে চিঠিতে জানালাম।

রাধু থামিল।

মঞ্জুষা বলিল, তার পর বোষ্টমদা ?

রাধু জ্বালাময় কণ্ঠে জবাব দিল, জীবনে দেখা দিল বিপর্য্যয়। আশ্রয়হীন, সহায়-সম্পদহীন আমি—কোথায় যাই, কি করি।

মঞ্জুষা বলিল, তোমার দাদামশাই আর কোন খবর নেন নি ?

রাধু একটুখানি হাসিল। বলিল, না তা নেন নি, কিন্তু তিনি আমাকে

নিতে চাহিলেও আমি রাজী হতাম না দিদি। যেখানে এত বড় আদর্শগত পার্থক্য সেখানে গিয়ে মানুষের মত বাঁচা সম্ভব নয়। একবার মায়ের পাষাণ-বিগ্রহের পানে চেয়ে দেখলাম। মা আমার সারাজীবন ঐ পাথরের দেবতাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কি শান্তি পেয়েছেন তিনি ওঁর দোরগোড়ায় দিনরাত পড়ে থেকে। আমি ত পাঁচ মিনিটও চোখ বুঁজে ঐ বিগ্রহের সামনে বসে থাকতে পারি নি। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ভগবানকে ঐ পাথরের মধ্যে খুঁজে পাই নি। মন বলেছে, ভগবান ওখানে নেই···আছেন মানুষের মধ্যে। যুগে যুগে ভগবান তো মানুষের মধ্যেই দেখা দিয়েছেন। তাই বুঝি মা আমার শুধু খুঁজেই গেলেন—তাঁর পাওয়া আর হ'ল না।

রাধু কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা আমার হাতে এল। বাইরে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মনটা খুশী হয়ে উঠল। একটা মস্ত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে আপাততঃ নিস্তার পেলাম। অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা এই যে, সেই মুহূর্ত্তে আমি কপর্দ্দকশূন্য নই। অকস্মাৎ মনে পড়ল বাবাকে আর মনে পড়ল আমাদের সেই শেষ সাক্ষাতের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলির কথা। মনে পড়ল তাঁর উপদেশ। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত কোথাও যাওয়া আমার হ'ল না। আমার সাময়িক বৈরাগ্য কেটে যেতে দেরি হ'ল না। সত্যিই তো যেখানেই যাই না কেন নিজের কাছ থেকে কোথায় পালিয়ে যাব। কিন্তু শহরের কোলাহলের মধ্যেও আমার মন হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখানকার সমাজে আমার সহজ প্রবেশাধিকার থাকবে না অথচ—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাধু থামিল। ঈষৎ দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আভাস তার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য, পরমুহূর্ত্তেই সোজা হইয়া বসিয়া সে পুনরায় বলিতে লাগিল, মানুষ এমনি করে কত দিন বাঁচতে পারে দিদি? একটা আশ্রয় যে তার চাই-ই। অবশেষে আমার জীবনে দেখা দিল সেই পরম ক্ষণ। আমার চলার পথে নারীর আবির্ভাব ঘটল, তাকে অবলম্বন করে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতে চাইল। মনে পড়ল বাবার কথা, মনে পড়ল মায়ের কথা। জীবনের ঋণ কি ভাবে তাঁরা পরিশোধ করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। এর পরেও আমার পক্ষে স্বপ্ন দেখার কোন সহজ অর্থ থাকতে পারে না। কিন্তু আমার ভিতরকার মানুষটি কোন যুক্তি মানলে না। কতই বা তখন আমার বয়স—তবুও সব কথা তাকে আমি খুলে বললাম। সে

জবাব দিলে, যে আসল মানুষটিকেই সে চিনেছে। এ ছাড়া কোন পরিচয় সে জানতে চায় না—এর বেশী সে কোনকিছু ভাবতেও পারে না। ঠিক আমারই মনের কথাটি সে বলেছে। বুক আমার ভরে উঠল। হাতে আমি স্বর্গ পেলাম।

আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

মঞ্জুষার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, বিয়ে হয়ে গেল।

রাধু বলিতে লাগিল, গেল বৈ কি—কিন্তু ফলে সে হারাল বাপের আশ্রয় আর আমি ধীরে ধীরে খোয়াতে লাগলাম সহসালব্ধ পিতৃবিত্ত। আর সেই সঙ্গে স্বপ্নের মাদকতাও টুটে যেতে লাগল, কিন্তু হেরে গেলে আমার চলবে না—আমাকে বাঁচতে হবে।

স্ত্রীকে বললাম, দুঃখকষ্ট সইতে পারবে তো ?

তিনি হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ পেল।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, এরই নাম কি স্বর্গ ? তার পরেই তোমাদের গ্রামে গিয়ে ঘর বাঁধলাম। ভেবেছিলাম হয় তো গ্রাম্য পরিবেশে স্ত্রীর মনটা স্থির হবে ; কিন্তু চঞ্চলা নারী তার স্বভাবধর্ম্মকে ভুলতে পারলে না। ···একদিন এক দুর্য্যোগের রাত্রে আমার কুঁড়ে ঘরখানির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও হারালাম।···

রাধু একটু থামিল, ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, বড় আঘাত পেলাম। সে আঘাত আমার জীবনের ধারাকে আগাগোড়া বদলে দিলে। মায়ের সেই পাষাণ-দেবতার কাছে আবার গিয়ে দাঁড়ালাম। এর পরেই গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিবিড় পরিচয় ঘটতে লাগল রাধু বোষ্টমের। সানু চিরদিনের জন্য মরে গেল।

রাধু বোষ্টম স্তব্ধ হইয়া গেল। মঞ্জুষা ডাকিল, বোষ্টমদা।

রাধু সাড়া দিল, কি দিদি ?

মঞ্জুষা বলিল, এ কথা এত দিন বল নি কেন ভাই।

রাধু বলিল, রাধু বোষ্টমের সুখদুঃখের কথা এতদিন এমন করে ত কেউ জানতে চায় নি দিদি ? তা ছাড়া আমার এই দুর্ভাগ্যের কথা কি বলবার মত।···

বহুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, তোমার সেই স্ত্রীর আর কোন খবর পাও নি বোষ্টমদা ?

রাধুর মুখে পুনরায় বড় মধুর একটু হাসি দেখা দিল। সে বলিল, পেয়েছি

কিন্তু বড় দেরিতে। তার জন্যে অবশ্য কারুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। ভুল করে সে-ই কি দীর্ঘকাল কম কষ্ট পেয়েছে। ফিরে পেয়ে তাই আর নূতন করে তাকে অপমান করতে পারলাম না।

মঞ্জুষা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, তুমি মহৎ···তুমি প্রণম্য বোষ্টমদা।

রাধু শান্ত হাসিয়া বলিল, এই ভয়েতে তোমাকেও এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। আমি আর কোন দিন সানু হতে চাই না ভাই। আমার মাতৃপিতৃ-পরিচয়ও আজ অতীতের কথা। আমার বোষ্টম-জীবন সার্থক হয়েছে। মানুষকে সেবা করবার যে অধিকার আমি পেয়েছি তা আর কোন দুর্লভ বস্তুর পরিবর্ত্তে কিছুতেই আমি ছেড়ে দিতে রাজী নই। কিন্তু আজ আর নয় দিদি, আমাকে এবারে বিদায় দাও।

বলিয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া রাধু দ্রুত ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মঞ্জুষা কিন্তু বহুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিল। রাধুর কাহিনী যেন জীবন্ত হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। মঞ্জুষা যেন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্ন দেখিতেছে সে সানুকে—তার বাবা আর মাকে। যাঁরা শুধু মাত্র সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে যথার্থ মানুষের মত মানুষ হইয়াও একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখিয়া দিন কাটাইয়া গেলেন। জীবনে কিছুই পাইলেন না। যোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে···

নিতাইয়ের আহ্বানে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। নিতাই বলিল, চা আর জলখাবার দেওয়া হয়ে গেছে। বড়বাবু আপনার জন্যে বসে আছেন।

মঞ্জুষা উঠিল এবং তার বাবার ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, রাধু চলে গেল বুঝি? এতক্ষণ ধরে কি এত গল্প করছিলে মা?

মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল। সে বলিল, হ্যাঁ চলে গেছে। কিন্তু জান বাবা, আসলে রাধু বোষ্টম নয়। ওর কথাবার্ত্তায় মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হলেও এতটা কোন দিন ভাবতে পারি নি।

জীবানন্দ মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, আমি জানি মঞ্জু মা।

মঞ্জুষার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। অবাক হইয়া সে তাহার বাবার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

জীবানন্দ বলিলেন, জমিদারি চালাতে গেলে অনেক খবরই রাখতে হয় মা।

রাধুর সব খবরই আমি রাখতাম।

বাধা দিয়া মঞ্জুষা কহিল, সে কথা ত একদিনের জন্যও আমায় বলনি বাবা।

জীবানন্দ কহিলেন, সব কথা কি সব সময় বলা চলে মঞ্জু। তাতে হয় তো রাধু চলার পথে বাধা পেত। ওর বাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি জানতাম। অমন অমায়িক, চরিত্রবান, সদাশয় লোক বড় একটা দেখা যায় না। বিনয় বাগচীর কথা তোমাকে বোধ হয় গল্পচ্ছলে বহু বার আমি বলেছি।

মঞ্জুষা অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। কথাটা সে মনে করিতে পারিতেছিল না।

জীবানন্দ বলিলেন, একটা চরের মামলা ওঁরই হাতে ছিল। আমার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে মোটা টাকা পাঠান হ'ল। তিনি কি জবাব দিয়েছিলেন জান মা? বলেছিলেন, টাকা দিয়ে সবাইকে কেনা যায় না।

মঞ্জুষা কহিল, এত খবর তুমি কোথায় পেলে বাবা?

জীবানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, জমিদারিটাও একটা ছোটখাট রাজত্ব মা। চোখ বুজে বসে থাকলে রাজত্ব থাকে না। আমার কথাটা বুঝেছ মঞ্জু?

মঞ্জুষা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে—

জীবানন্দ পুনশ্চ বলিলেন, খবরটা পেলাম আমার অনুচরের মুখে। বিনয় বাগচী সম্বন্ধে মনে একটা কৌতূহল জন্মাল। ফলে দিনের পর দিন আরও অনেক নূতন খবর পেতে লাগলাম। তাতে মন আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। একটা সত্যিকারের মানুষের পরিচয় পেলাম।

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে বলিল, অথচ এদের আমরা চিরদিন ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখি। ওদের যোগ্য সম্মান দেখাতে পারি না…

জীবানন্দ বলিলেন, সব সময় সেটা সম্ভব হয় না মঞ্জু মা। তাতে শৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। স্বেচ্ছাচারিতা বেড়েই চলে। বিনয় বাগচী অথবা রাধুর মত লোকের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। কিন্তু এদের সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও একেবারে বর্জ্জন করতেও আমরা পারি নি মঞ্জু। নইলে রাধুকে কি আজ আমার বাড়ীতে বসিয়ে এমন করে আদর-আপ্যায়ন করতে পারতে? আমিই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতাম। মোদ্দা কথা আমাদের মনকে তৈরি হবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে বৈকি মা। এ যত দিন না হবে তত দিন কিছুতেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে না।

কথাটা মঞ্জুষার মনের কোন দুর্ব্বল স্থানে গিয়া আঘাত করিল। তার বাবা

সত্য কথাই বলিয়াছেন। মঞ্জুষা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।...

জীবানন্দ তাহার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, মন যেদিন তৈরি হবে মঞ্জু দেখবে কোন বাধাই সেদিন পথরোধ করে দাঁড়াবে না। কিন্তু চা যে এতক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কখন আর দেবে মা?

মঞ্জুষা একটু লজ্জিত হইল।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, তোমাকে আর বলব কি মঞ্জু—কথা পেলে আমারই কি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। কিন্তু তোমার কোকোটা ঢেলে নিলে না? একটু থামিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, ভাবছি চা আমিও ছেড়ে দেব।

মঞ্জুষা প্রশ্ন করিল, হঠাৎ এ কথা কেন বাবা?

জীবানন্দ জবাব দিলেন, হঠাৎ না মা, কথাটা অনেক দিন ধরেই ভাবছি।

মঞ্জুষার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটু হাসি দেখা দিয়াই পুনরায় মিলাইয়া গেল। সে কহিল, বেশ তো বাবা চায়ের চেয়ে যদি কোকোটাই তোমার পছন্দ হয়, না-হয় সেই ব্যবস্থাই কাল থেকে হবে, কিন্তু আজকের চা-টা নষ্ট করো না।

জীবানন্দ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।



আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত মঞ্জুষার চোখে ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া তার বাবার কথাটাই মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে লাগিল। সত্য কথাই তিনি বলিয়াছেন। মনকে তৈরি করাই হইল সকলের চেয়ে বড় কথা। কিন্তু হঠাৎ তিনি আজ একথা বলিতে গেলেন কিসের জন্য। রাধুকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি কি মঞ্জুষাকে তার নিজের কথাটাই ভাবিয়া দেখিবার নির্দ্দেশ দিলেন? যদি দিয়াই থাকেন তবে নিতান্ত অকারণে নয়। মন তার অকস্মাৎ এতগুলি অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের সম্মুখীন হইবার জন্য তৈরি ছিল না বলিয়াই সে নিরন্তর অন্ধের মত একটার পর আর একটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। নির্দ্দিষ্ট কোনকিছুকে স্থির চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

আকাশে অসংখ্য তারা দেখা যাইতেছে। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মঞ্জুষা নির্নিমেষ নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া আছে। আজকাল সময় তাহার যেন কাটিতে চাহে না। রাধু বোষ্টমের সজীব ক্ষেতে

সারাদিন কাটাইবার মত ধৈর্য্য তাহার নাই। মাটির পুতুল গড়া দেখিতে গেলে সে ক্লান্তি বোধ করে। সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজে কোন আকর্ষণ নাই। সবই কেমন যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। নিতান্তই প্রাণহীন।

রাধুর উৎসাহের অন্ত নাই। সে বলে, কাজের আবার ভাবনা। এই সব আশ্রিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা ছোটখাটো স্কুল গড়ে তোলো। সময়ও কাটবে মনেরও খোরাক পাবে।

মঞ্জুষা একটুখানি হাসিল, কোন জবাব দিল না। এই কয় বছরে সে নিজেকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছে। যে মূল বস্তুটিকে আশ্রয় করিয়া তার বহুবিধ কল্পনা ডালপালা মেলিয়াছিল, তার আজ অস্তিত্ব নাই। সেই মূল বস্তুটিই আশ্রয়চ্যুত হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। শত চেষ্টা করিয়াও নাগালের মধ্যে আনিতে পারিতেছে না। তারপরে কতকিছুকেই সে দুই হাত বাড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সবই সরিয়া গিয়াছে তার আয়ত্তের বাহিরে। সে যেমন একলা তেমনি একলাই আছে। শুধু প্রতিদিনের ব্যর্থতাটাই আরও বেশী করিয়া অনুভব করিতেছে।

নিজের মনকে সে বার বার প্রশ্ন করিয়াছে—কি সে চায়? কোন্ পথে চলিলে তার সত্যকার কল্যাণ হইবে? উত্তর সে পায় নাই।

চলিতে হইবে তাই সে চলিতেছে। দুই পা অগ্রসর হইলে তিন পা পিছাইয়া আসে। ফলে একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

মঞ্জুষা জানে না মৃন্ময় আজ কোথায় আছে এবং কেমন আছে। তার জীবনের গতিকে কোন্ পথে মোড় ফিরাইয়াছে।

এক ঝলক দমকা হাওয়া বহিয়া গেল। খোলা জানালাটা সশব্দে বন্ধ হইয়া যাইতেই মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। বন্ধ জানালা পুনরায় সে খুলিয়া দিল। আকাশে খণ্ড চাঁদ উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষ। কিছুদিনের ব্যবধানে পুনরায় কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব হইবে। মঞ্জুষা ভাবে—প্রকৃতির পরিবর্ত্তনটা নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ, কিন্তু তার জীবনের কৃষ্ণপক্ষের অবসান কি কোনদিনই ঘটিবে না!

মৃদু বাতাসে ভর করিয়া ভারি মিষ্ট একটা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। মঞ্জুষার ফুলের বাগানে ফুল ফুটিয়াছে—তারই সুবাস। তার মনের বনে কিন্তু সুগন্ধি ফুল ফোটে নাই, ফুটিয়াছে রক্তরাঙা পলাশ। দেবতার অর্ঘ্যে কোনদিন লাগিবে না, শুধু তার চলার পথকেই যেন বেদনার রঙে রাঙাইয়া দিল।

বহুদিন পরে মঞ্জুষা ট্রাঙ্ক খুলিয়া অনেক দিন আগে লেখা মৃন্ময়ের খানকয়েক চিঠি বাহির করিল। এতদিন সে এগুলিকে সযত্নে সংগোপনে রাখিয়া দিয়াছিল। আজ তাহার কি মতি হইল কে জানে, সহসা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটির পর একটি করিয়া চিঠিগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে সুরু করিল। অকারণে এই মিথ্যার বোঝা বহিয়া বেড়াইবার কিসের প্রয়োজন তাহার! চিঠিগুলি একের পর এক পুড়িয়া কালো হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইতেছে। তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে মঞ্জুষার একটি নিঃশ্বাস পড়িল। পুনরায় এক ঝলক দমকা হাওয়া আসিয়া দগ্ধ চিঠির ছাই ঘরময় ছড়াইয়া দিল।

এই চিঠি কয়খানির উপর মঞ্জুষার মমতার অন্ত ছিল না। কতদিন কত ছলে চিঠিগুলি বাহির করিয়া সে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিয়াছে। প্রতিটি পংক্তি তার কণ্ঠস্থ।···

মঞ্জুষা সহসা চমকাইয়া উঠিল। কয়খানি চিঠি পোড়াইয়া ফেলিয়াই কি সে মৃন্ময়ের সকল স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছে। সে পাগলের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিঠিগুলির ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল—স্পর্শমাত্রেই তাহা গুঁড়া হইয়া গেল।

নিজের এই আকস্মিক পাগলামিতে মঞ্জুষা নিজেই বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু চিন্তার হাত হইতে সে যে কিছুতেই অব্যাহতি পাইতেছে না। তার বাবা ঠিকই বলিয়াছেন। মনকে তৈরি করাই হইল সব চেয়ে বড় কথা। এই উক্তি যে কত সত্য তাহার প্রমাণ সে নিজেই। নহিলে এই রাত বারোটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া দুশ্চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইত না। অথচ মৃন্ময় কেমন নিঃশব্দে চলিয়া গেল, এমন কি মঞ্জুষার বাবা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতেছেন। রাধু বোষ্টম তার জীবনের এত বড় একটা শোচনীয় অধ্যায়কে অগ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে! নান্তুর কথা আলাদা। জীবনকে সে অন্যভাবে দেখিয়াছে, অন্যভাবে বুঝিয়াছে।

মঞ্জুষা দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চতুর্দ্দিক সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন, একটা নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল, মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। চোখে পড়িল অদূরে এক বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে দুটি তরুণ-তরুণী। উহাদের সে চেনে। কিছু দিন পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছে।

মঞ্জুষাও বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল ওখানকার চাঁদের

আলোর রূপ আলাদা। সে পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

দগ্ধাবশিষ্ট চিঠির টুকরাগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। মঞ্জুষা কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা বসিয়া পড়িল। পোড়া কাগজের টুকরাগুলি সযত্নে তুলিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিল। এগুলি যে তার অতীত স্মৃতির চিতাভস্ম। মঞ্জুষা চমকাইয়া উঠিল। তাহার ঘরের দরজার পাশ হইতে কেহ যেন সন্তর্পণে সরিয়া গেল। একটা খস খস শব্দ তার কানে আসিল। সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া পর্দা সরাইয়া বাহিরে আসিল। কোথাও কিছু চোখে পড়িল না। শুধু তার বাবার ঘরের আলোটা চোখের সম্মুখেই নিভিয়া গেল। মঞ্জুষা আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরায় ঘরে ফিরিয়া আসিল। একবার ভাবিল তাহার বাবাকে গিয়া বলে যে, এমনি করিয়া অষ্ট-প্রহর তাহাকে চোখে চোখে রাখিলেই কি তার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু তখনকার মত সে তার ইচ্ছাকে দমন করিল।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া মঞ্জুষা কথাটা তুলিল। জীবানন্দ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এমনি ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

মঞ্জুষা মুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমার এ কাজকে আমি কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করতে পারি না। এতে শুধু নিজেকেই তুমি দুঃখ দিচ্ছ বাবা।

জীবানন্দ গভীর স্নেহে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া বার বার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, যুক্তি-বিচার দিয়ে সমর্থন পাবে না সে আমি জানি মঞ্জু, কিন্তু এ পথে যেও না। তা হলে তুমি নিজেও ভুল করবে, আমাকেও ভুল বুঝবে। হেসে কথা বলি—গল্প করি, কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু ভুলে যাস নে যে, এই জগতে যা-কিছু চোখে দেখা যায় সেইটেই শেষ নয়···চোখের আড়ালেও অনেক কিছুই থেকে যায়।

মঞ্জুষা কথা কহিল না। জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, তোমরা হয়তো বলবে এ সব বাড়াবাড়ি, কিন্তু যারা ভুক্তভোগী তারা বুঝবে এর কতটুকু মূল্য। কিসের আশায় এমন করে ব্যাকুল হয়ে উঠি। সব কথা তুমি বুঝবে না—বোঝা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয় মঞ্জু। কেমন করে আমার সব স্বপ্ন নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে তা ত আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।

জীবানন্দ ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,তোমার দাদা করলে আমার সঙ্গে বেইমানী। আমার সকল আশা, আমার স্বপ্ন সে চূর্ণ করে

দিলে। সে আঘাতকেও আমি ভুলবার চেষ্টা করেছি শুধু তোমার মুখের পানে চেয়ে। ভাবতাম আমি অপুত্রক। মঞ্জুই আমার পুত্র, আমার কন্যা। তাকে নিয়েই আমার শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব—আমার ভাঙ্গা হাট আবার ভরে উঠবে। কিন্তু তা হ'ল কি? পেলাম কতটুকু।

মঞ্জুষা এতক্ষণে কথা কহিল, শান্ত ভাবে বলিতে লাগিল, আমি কোন-কিছুকেই ছোট করে দেখতে চাইনি বাবা। কোন দিন দেখিও নি। কিন্তু দুশ্চিন্তা করে যখন কোন লাভই হচ্ছে না তখন—কথাটা মঞ্জুষা শেষ করিল না। ইহার পরে তার বাবা যদি পাল্টা একই প্রশ্ন করিয়া বসেন তাহা হইলে কি জবাব সে দিবে।

জীবানন্দ বলিলেন, সবই বুঝি মঞ্জু, কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা ত সব সময় হিসেব করে চলে না মা; তার পথ আলাদা। একথা বোধ করি তুমিও স্বীকার করবে।

মঞ্জুষা মস্তক নত করিল। জীবানন্দ তার লজ্জাবনত মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, অথচ দেখ মঞ্জু, সব জেনে শুনে বুঝেও আমরা কত অসহায়। জান মা, এই ধরনের দুর্ব্বলতা সব সময় শুধু দুঃখই দেয় না, সময়-বিশেষে মনে শান্তনার প্রলেপও বুলিয়ে দেয়।

মঞ্জুষা নীরব। জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন, আমার কথা আমি ভাবি না। কতদিন আর বাঁচব, কিন্তু তোমার মুখের দিকে চাইলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় মরেও বোধ হয় আমি শান্তি পাব না।

মঞ্জুষা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, বাবা—

জীবানন্দ সাড়া দিলেন, কি মা—

মঞ্জুষা বলিল, আমার কথা নিয়ে ভাবতে তোমায় না আমি বারণ করে দিয়েছি বাবা। কেন তুমি ভাবতে পার না যে, আমি তোমার ছেলে, আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করবার কোন কারণ নেই।

জীবানন্দ বড় অদ্ভুতভাবে একটু হাসিলেন। কহিলেন, তা যদি সম্ভব হ'ত তবে আর দুঃখ ছিল কি মা। নিশ্চিন্ত আরামে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিতে পারতাম। ওরে মা তোর বাপ কি এতই বোকা যে, সে দেখেও কিছু বুঝতে পারে না? কিন্তু এমনি করে ত আর চলছে না মঞ্জু। একটা কিছু সমাধান আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। নইলে ওখানে গিয়ে তোর মাকে আমি জবাব দেব কি? বলিয়া তিনি উর্দ্ধে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন।

মঞ্জুষা একটু যেন সচকিত হইয়া উঠিল। তার হৃদযন্ত্রটা হঠাৎ যেন অতি দ্রুত চলিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু সে একটি কথাও কহিল না। শুধু নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল। তাহার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার বাবার মনে এই যে ঝড় দেখা দিয়াছে ইহাকে যেমন করিয়া হোক শান্ত করিতে হইবে। এমন জানিলে সে গত রাত্রের কথা তুলিত না। সে ভাবিয়াছিল বেশী রাত জাগার জন্য বাবাকে অনুযোগ করিবে। কিন্তু সব কেমন গোলমাল হইয়া গেল।

মঞ্জুষার আনত মুখের পানে খানিক সস্নেহে চাহিয়া থাকিয়া সহসা জীবানন্দের মনে হইল কথাটা এ ভাবে না বলিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তিনি আবহাওয়াটা খানিক হালকা করিয়া লইবার জন্যই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সংসারে কিসের আশায় আমি বেঁচে থাকব মঞ্জু?

মঞ্জুষা মৃদু কণ্ঠে কহিল, মানুষের সব আশা ত সকল সময় পূর্ণ হয় না বাবা।

জীবানন্দ বলিলেন, সে ত নিজের চোখেই দেখে আসছি, তুমি আর নূতন করে কি বলছ মা। কিন্তু কথাটা তা নয়; আমি ভাবি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভগবান আমায় দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন! তাঁর বিধান মেনে না নিয়ে উপায় নেই, কিন্তু প্রতিদিন নিজের মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে মানুষ আর কত দিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ভাবনা শুধু কি আমার একটা—

মঞ্জুষার চোখে জল আসিয়া পড়িল এবং তাহাই গোপন করিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা জীবানন্দর দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু না দেখার ভান করিয়া তিনিও অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মঞ্জুষা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।



কিছুদিন হইতে লিলির চলাফেরায়, তার কথা বলায় এবং ছোট-বড় নানা কাজের ভিতর দিয়া যে জিনিষটি নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহাতে মৃন্ময় রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহা লইয়া খোলাখুলি আলোচনা করাও যেমন সম্ভবপর নয়, এখান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া পড়াও তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত। কোথায় যেন তাহার আটকাইতেছে। ঐ যে মেয়েটি তার

সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দর প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহে সেবায় তাহাকে সারাক্ষণ ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিবার ক্ষমতা না থাকিলেও তাহাকে অবহেলা করিবে সে কোন্ অধিকারে। লিলির জন্য সে বেদনা বোধ করে। তাই সে দেখিয়াও কিছু দেখে না, বুঝিয়াও না-বোঝার ভান করে। ইহা ছাড়া আর কোন সহজ পথই আপাততঃ তাহার চোখে পড়িতেছে না।

ইদানীং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সে বড় একটা বাড়ীতে থাকে না। রাজাবাবুর গ্রন্থাগারে পাঠানুশীলন করিতে এবং মহীপালের সহিত শিকারে যাওয়াতেই তাহার আগ্রহ বেশী। তা ছাড়া প্রত্যহ বিকালে বেড়াইতে বাহির হওয়াও তার একটা নিয়মিত কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহীপাল রোজই তার সঙ্গে থাকে। কোন কোন দিন লিলিও তাহাদের সঙ্গে যায়। মোটের উপর বাহ্যিক আচরণে মৃন্ময়ের মনের কথা বুঝিবার উপায় নাই। শুধু মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া তার মুখের উপর দেখা যায়। কিন্তু তাহাও মুহূর্ত্তের জন্য। লিলি সব কথা অনুমান করিতে না পারিলেও কোথাও যে একটা কিছু ঘটিয়াছে ইহা যেন সহজাত সংস্কার-বশেই টের পায়, কিন্তু প্রকৃত সত্যকে উদ্ঘাটিত করিতে সে ভয় পায়। তাই সে চুপ করিয়া থাকে।

ভিতরে ভিতরে সে অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। লিলি নিজেকে ধিক্কার দেয়। এই অসহায় অবস্থার জন্য লিলি নিজেকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিতে চায়, কিন্তু তার মন রুখিয়া দাঁড়ায়—বলে, জীবনের যে কয়টা বছর সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে তার কোন মূল্য নাই—একটা মিথ্যা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কিন্তু মজা এমনি যে, মিথ্যা দুঃস্বপ্নের বোঝা-ই সে আজও বহিয়া চলিয়াছে—প্রকৃত সত্যকে হাতের মুঠার মধ্যে পাইলেও বোধ করি গ্রহণ করিতে পারিবে না। জীবনে ইহার চেয়ে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি থাকিতে পারে।

কিছুদিন হইতেই মৃন্ময় যেন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। হাসিমুখে কথাও বলে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লিলিকে পূর্ব্বের ন্যায় জ্বালাতনও করে, কিন্তু তার মধ্যে যেন প্রাণের যোগ নাই। নিতান্তই যেন অভ্যাসের বশে করিয়া যাইতেছে। গল্প করিতে বসিলে আজকাল মৃন্ময় উৎসাহের সঙ্গে শিকার-কাহিনী বলিতে থাকে, নতুবা কেমন করিয়া সে ধীরে ধীরে এখানকার সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে সক্ষম হইয়াছে এই সব নিতান্ত বাজে-কথায় সময় কাটাইয়া দেয়। অথবা এমন সব দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা সুরু করিয়া দেয় যে, শেষ পর্য্যন্ত লিলিকেই বাধ্য হইয়া আলোচনা বন্ধ করিয়া

দিতে হয়।

লিলি বলে, তোমার এই গুরুগম্ভীর আলোচনা থামাও মিনুদা। এসব শুনতে আমার ভাল লাগে না।

মৃন্ময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, লাগে না বুঝি ? বেশ আর বলব না। কিন্তু শিকার-কাহিনী আবার তত্ত্বকথা হ'ল কবে থেকে ?

লিলি জবাব দিল, তা নয় মানি, কিন্তু ওসব শুনতেও আমার ভাল লাগে না। সে মুহূর্ত্তকাল থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, তোমার এই এক স্বভাব। যখন যেটা মাথায় ঢুকল তাই নিয়ে এমন ডুবে থাকবে যে, আশেপাশের আর সবকিছুই একেবারে মুছে যায়।

মৃন্ময় লিলির আসল কথার ধার দিয়াও গেল না। হাসিয়া কহিল, যায় বুঝি কিন্তু এটা দোষ নয়—একাগ্রতা। এ না থাকলে কোন কাজই সফল হয়ে ওঠে না। একথা তোমায় স্বীকার করতেই হবে।

লিলি চড়া গলায় বলিল, তুমি থাম মিনুদা। এগুলো যদি তোমার কাজ হয় তা হলে অকাজ আবার কাকে বলে ?

লিলির রাগ দেখিয়া মৃন্ময় কৌতুক বোধ করিল। হাসিয়া বলিল, কেন তোমার রান্না করাকে, আর মিনুদাকে যত্ন করে কাছে বসে খাওয়ানোকে।

লিলি গম্ভীর হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের চোখে মুখে তখনও হাসি লাগিয়া আছে।

লিলি কহিল, তুমি ঠাট্টা করছ বটে, কিন্তু মেয়েদের কাছে এর চেয়ে বড় কাজ আর নেই।

মৃন্ময় মৃদু হাসিয়া কহিল, তুমি তো বি-এ পাস করেছ লিলি।

লিলি পুনশ্চ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তুমি বলতে চাও কি ? লেখাপড়া শিখলেই বুঝি মেয়েরা তাদের স্বভাব-ধর্ম্মকে ভুলে যাবে ! মেয়েদের কাজ শুধু সৃষ্টি করাই নয় মিনুদা, সে সৃষ্টিকে লালন এবং পালন করবার দায়িত্ব ত তাদেরই।

মৃন্ময় আজ যেন কিছুতেই গম্ভীর হইতে পারিতেছে না। পুনরায় সে মুচকি হাসিয়া বলিল, ঠিক হচ্ছে না লিলি। এও সেই বড় বড় তত্ত্ব কথায়ই এসে যাচ্ছ, তার চেয়ে বরং সহজ ভাষায় বল যে, মেয়েরা সব সময়ই মেয়ে, তার চেয়ে একটুও বেশী নয়, একটুও কম নয়। পুরুষ খেতে ভালবাসে আর মেয়েরা খাওয়াতে ভালবাসে। তাই তোমার মিনুদাকে তুমি রান্না করে খাওয়াও আর

সে প্রাণ ভরে খায়। এ সত্যকে আমায় মানতেই হবে লিলি। তাইতো বাইরের শত আকর্ষণও কোথাও আমায় আটকে রাখতে পারে না, ঠিক সময়টিতে এসে হাজির হই। আর মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তুমি না থাকলে আমার কি দুর্দ্দশাই না হ'ত।

মৃন্ময় থামিল। এতক্ষণের আলোচনার লঘু পরিবেশ সহসা ধাক্কা খাইয়া যেন ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরে একটা গভীর আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠিল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, আমি বড়লোকের ছেলে নই লিলি। অর্থের চেয়ে স্নেহ-ভালবাসাটাই বেশী করে চেয়েছি, আর জ্ঞান হবার পর থেকেই তা এত বেশী পরিমাণে পেয়েছি যে, হঠাৎ এক দিন তার একান্ত দুষ্প্রাপ্যতায় আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাত পেতেছি, কিন্তু হাত আমার শূন্যই রয়ে গেছে, কেউ এক কণা দিয়ে তা পূর্ণ করে দেয় নি।

মৃন্ময় একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সেদিনের সে বিরাট শূন্যতাকে সাধ্যমত ভরে দিতে তুমি এগিয়ে এলে। আমার একটা দিক পূর্ণ হয়ে উঠল।...

লিলির চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ের তাহা নজরে পড়িল না। সে বলিয়া চলিল, কিন্তু আর একটা দিকের শূন্যতা আমার দিন দিন বেড়েই চলল। রাজাবাবুর বিরাট গ্রন্থাগারের রাশি রাশি গ্রন্থও আমার সে অভাব পূরণ করতে পারে নি—শুধু মনের উপর সাময়িক একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেই সক্ষম হ'ল। কথাটা সেদিনই অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি যেদিন নান্কুর ডাক এসে আমার কাছে পৌছল।

লিলির মুখখানি পুনরায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। ইহা চোখে পড়িলেও সে থামিতে পারিল না, বলিয়া চলিল, সে ডাকে সাড়া দিল আমার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু—

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি বলিল, তবুও তুমি মঞ্জুকে গ্রহণ করতে পারলে না মিনুদা? কিন্তু মেয়েরা এক্ষেত্রে সব ছেড়েছুড়ে যাকে একান্ত মনে কামনা করে তার হাত ধরে বেরিয়ে আসত। তোমাদের সমাজ আর তার অনুশাসনকে গ্রাহ্য করত না।

মৃন্ময় কহিল, কথাটা কি আমিও ভেবে দেখি নি মনে করছ লিলি। তাইতো আজও আমার মন বলে যে, মানুষ আগাগোড়াই এক একটি সামাজিক

সংস্কারে আচ্ছন্ন কাঠের পুতুল।

লিলি বলিল, কাঠের পুতুল হতে যাবে কেন মিনুদা। তোমাদের মাত্রাতিরিক্ত স্বার্থপরতাই সব কিছুর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে এত বেশী সজাগ অথচ অপরের বেলায় তোমাদের সঙ্কীর্ণতার অন্ত নেই।

মৃন্ময় বলিল, হয়তো ঠিক কথাই তুমি বলেছ।···

বাধা দিয়া লিলি বলিল, হয়তো নয় একেবারে খাঁটি সত্য কথা বলেছি। চিন্তাধারা তোমাদের একটা দিক মাত্র লক্ষ্য করেই চলে, অপর একটা দিকও যে থাকতে পারে এ কথা তোমরা স্বীকার করো না। তোমাদের চলার পথে কেউ যদি নিষ্পিষ্ট হয়েও যায় তাতেও তোমরা ভ্রূক্ষেপ করো না।

মৃন্ময় বলিল, লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে গেলে এর প্রয়োজন আছে লিলি—

লিলি বলিল, আছে বৈকি—যাক না তাতে আর কারুর অস্তিত্বই লোপ পেয়ে। এই কথাই তুমি বলতে চাইছ তো?

মৃন্ময় বলিল, বলতে আমি কোন কথাই চাই না লিলি। কথাটা তুমি তুললে বলেই একটা জবাব দেবার চেষ্টা করছি। নইলে এ কথা না জানে কে যে, চলার পথে একাগ্রতা না থাকলে লক্ষ্যে পৌছান যায় না।

লিলি বলিল, তুমি লক্ষ্যস্থল বলতে কি বোঝাতে চাইছ মিনুদা? কোন্টা তোমার লক্ষ্যস্থল ছিল? সে কি তোমার মঞ্জুকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা, না তাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে নিঃশব্দে সরে পড়া! মুখেই শুধু তোমরা বড় বড় কথা বলতে জান, আসলে তোমাদের কোন নীতি নেই—আন্তরিকতা কোথাও নেই। এক একটি কথার ফানুস তোমরা।

আন্তরিকতা নেই—কথাটা মনে মনে মৃন্ময় একবার আবৃত্তি করিয়া বলিল, যে জিনিষ একটা লোককে আগাগোড়া বদলে দিলে তাকে তুমি কি বলতে চাও লিলি?

লিলি মৃদুকণ্ঠে বলিল, বদলে যদি সত্যই তোমায় দিতে পারত মিনুদা তা হলে এ কথা আমার বলবার কোন প্রয়োজনই হ'ত না।

মৃন্ময় বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার কথা আমি সব সময় বুঝতে পারি না লিলি।

লিলি কহিল, তার কারণ হয় তুমি কোনদিন বুঝবার চেষ্টা করো নি অথবা আমি তোমায় ঠিকমত বোঝাতে পারি নি।

লিলি থামিল, মৃন্ময় নীরব।

কিছুক্ষণ মৃন্ময়ের মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া লিলি পুনরায় বলিল, তোমার মনের কথা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তা নিছক পাথরে তৈরি নয়। রক্তমাংসের মানুষ তুমি—তোমার মনটাও তাই সজীব। সে মনে ঢেউ আছে, গতি আছে আর আছে সূক্ষ্ম অনুভূতি। কিন্তু এইটেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে মিনুদা যে, যার চোখে সূক্ষ্মতম বস্তুও কত সহজে ধরা পড়ছে তারই দৃষ্টিতে অতিস্থূল বস্তুও ধরা পড়ে না কেন ?

মৃন্ময় মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এর উত্তরও আমি আগেই দিয়েছি। লক্ষ্যবস্তু যেখানে অতি সূক্ষ্ম, স্থূল বস্তু সেখানে স্বভাবতঃই পরিত্যজ্য—নইলে সূক্ষ্মবস্তু যে চোখেই পড়বে না লিলি।

কিছুক্ষণ উহাদের নীরবে কাটিল।

লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, যখন কোন কিছুই তোমার মনকে স্থির হবার সুযোগ দিলে না তখন এমন কিছু করো যাতে তোমার সত্যিকারের মনের আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হতে পারে। বুকের মধ্যে এমনি একটা হাহাকার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি মিনুদা ?

কোন্ কথায় কি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। মৃন্ময় সহসা লিলিকে বাধা দিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, লাভ-লোকসানের হিসেব আজও আমি করে দেখি নি লিলি, কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় তোমার কোথাও মারাত্মক ভুল হচ্ছে। আমার মনের আসল রূপটা তোমার চোখে পড়ে নি। তা হলে আজ এ কথা তুমি বলতে না। মাঝে মাঝে তুমি দুজ্ঞের্য় হয়ে ওঠো। হয়তো এর প্রয়োজন আছে বলেই তোমায় এই পথে চলতে হচ্ছে, কিন্তু আমি যে লিলিকে জানি সে স্বচ্ছ, তার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। দুজ্ঞের্য় লিলি আমার কাছে দুর্ব্বোধ্যই থাক, তার মনের গহনে প্রবেশাধিকার আমার নেই—আর সে অধিকার আমি কোন দিনই চাই নি। আমাকে নিজের মত করে চলতে দাও লিলি। আমার চোখের সামনে ধুলোর ঝড় তুল না তুমি।

লিলি অভিভূতের মত মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মৃন্ময় থামিল।

আরও কিছুক্ষণ এমনি কাটিতে লিলি মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, মিনুদা…

মৃন্ময় স্নিগ্ধ কণ্ঠে সাড়া দিল, আমাকে কিছু বলবে লিলি ?

লিলি আরও কিছুক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, ভুল সত্যই আমার হয়েছে। চলার পথে দৃষ্টি তোমার ঠিকই আছে। অমিই শুধু বোকার মত বিচার করেছি, কিন্তু

বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি একদিনের জন্তও ঠকাই নি—ঠকেছি আমি নিজে। তার ফল ভোগও আমাকেই ক'রতে হবে। ধুলোর ঝড়ে আমার পথকেই অন্ধকার ক'রে দিয়েছে মিনুদা।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিল। সে হাসি লিলিকে লজ্জা দিল। মৃন্ময় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমার আজ কি হয়েছে আমি জানি না। আমার লজ্জা এবং বেদনার কথা কাউকে বলবার নয়, ওটা একান্তই আমার নিজস্ব—কিন্তু তোমার ত এতটা বিচলিত হওয়া শোভা পায় না লিলি।...আর সত্য সত্যই যখন এর কোন সঙ্গত কারণ নেই।...

লিলি বলিল, মানুষের মন নিয়ে যেখানে কথা সেখানে সঙ্গত-অসঙ্গতের প্রশ্ন না তোলাই ভাল মিনুদা। তবুও কথাটা যখন তুললে তখন এর একটা জবাবও শুনে রাখ। ভুল তুমিও যেমন একদিক থেকে করেছ, আমিও তেমনি করেছি। জান মিনুদা, অল্পবয়সে ঠাকুরমাকে যখন শিবপূজো করতে দেখেছি তখন ভাবতাম এ অনুষ্ঠানের কিসের প্রয়োজন। ঠাকুর ত কোনদিন কথা কইবেন না—আজ কিন্তু মনে হচ্ছে এর কোন কিছুই মিথ্যে নয়। অন্ততঃ যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর ভক্তি নিয়ে পূজো করে তার পক্ষে ত নয়ই। কিন্তু এ সব আলোচনা এখন থাক—তোমার মহীপাল আসছে। আমি বরং তোমাদের জন্তে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লিলি দ্রুত প্রস্থান করিল। সেইদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মৃন্ময়ের একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

মহীপাল ততক্ষণে আসিয়া মৃন্ময়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

মৃন্ময় বলিল, বসো মহীপাল। তোমাকেই আমি চাইছিলাম।

মহীপাল বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, আমাকে! কিন্তু আমার ত আজ আসবার কথা ছিল না মাষ্টার মশাই।

মৃন্ময় অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, ছিল মহীপাল। তুমি জানতে না, কিন্তু আমি অনুভব ক'রতে পেরেছি।

মহীপাল তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, আপনি কি অসুস্থ মাষ্টারমশাই?

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তুমি ঠিকই বলেছ মহী। আমি বোধহয় খুবই অসুস্থ।

মহীপাল বলিল, তাহলে আর এখানে বসে থেকে কাজ নেই। চলুন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন।

সহসা মৃন্ময় সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া বলিল, সত্যিই আমার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। বড় ক্লান্ত আমি। চল মহী ঘরেই যাই।

আজ বহুদিন পরে পুনরায় নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। মৃন্ময় মহীপালের সহিত বাহির হইল না। শরীর খারাপ এই ওজুহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দিল। এই মুহূর্ত্তে তাহার একলা থাকিবার প্রয়োজন আছে। মনে হইতেছে লিলি সম্বন্ধে তাহার এতটা উদাসীন থাকা উচিত হয় নাই। নিজের মনোভাবকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রচ্ছন্ন রাখিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সব সময় সে সফলকাম হয় নাই—সময়-সময় মনের কথাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মৃন্ময় গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, মানুষ সব সময়ই দোষেগুণে মানুষ—পাথরের দেবতা নয়, তার প্রাণ আছে, অনুভূতি আছে। সে বোবা নয়—তার আত্মপ্রকাশের ভাষা আছে। মৃন্ময়ের সত্যই লিলির জন্য দুঃখ হয়। উহাকে কাছে টানিয়া লইতেও সে পারিতেছেনা, দূরে সরাইয়া দিবার কথা ভাবিতে গেলেও হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে। এই এক ধরণের দুর্ব্বলতা···

মৃন্ময় অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছে। জানালাটা খুলিয়া দিয়া সে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পাইয়াছে। আজ পূর্ণিমা। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই। জ্যোৎস্না অজস্র ধারায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গাছের মাথায় মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। জানালার ফাঁকে সে আলো মৃন্ময়ের শয্যার উপরও আসিয়া পড়িয়াছে। ভারি চমৎকার মিষ্টি হাওয়া দিয়াছে। মৃন্ময় বাহিরে দৃষ্টি ফিরাইল। ভাল লাগে না।

লছমিয়া ঘরে ঢুকিল চা আর কিছু জলখাবার লইয়া। মৃন্ময় জানাইল, তার চায়ের প্রয়োজন নাই।

লছমিয়ার চলিয়া যাইবার অনতিকাল মধ্যেই লিলি আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, চা জলখাবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

মৃন্ময় জবাব দিল, শরীরটা ভাল ঠেকছে না—

লিলি খানিক কি চিন্তা করিয়া মৃন্ময়ের শয্যার একাংশে বসিল, মৃদু কণ্ঠে

বলিল, রাত্রে খাবে তো ?

মৃন্ময় খানিকক্ষণ লিলির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছ কেন লিলি ?

লিলি তেমনি স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বলছিলাম এই জন্যে যে, তা হলে আর অযথা আমাকে পণ্ডশ্রম করতে হবে না।

সে একটু থামিয়া যেন আত্মগতভাবেই বলিতে লাগিল, বিকেলে চা জলখাবার খাওয়া ত অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছ। মহীপাল চলে যেতে ভাবলাম, আজ যখন বাড়ীতেই রয়েছ তখন হয়তো—লিলি কথাটা শেষ না করিয়াই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

মৃন্ময় বাধা দিল, যেও না লিলি—

লিলি পুনরায় বসিল।

মৃন্ময় বলিল, আমার চা জলখাবার না খেতে চাওয়াটাকে এত বড় করে দেখো না তুমি। আমার অন্যান্য কাজের কথা অবশ্য আলাদা, তা নিতান্ত অকারণে আমি করি নি লিলি, আমার এ কথাটা একটু চিন্তা করলেই তুমিও বুঝবে। তোমাকেও আমি বুঝি আবার নিজেকেও আমি চিনি। সব দিকে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার চেষ্টাই আমি বরাবর করে আসছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। সব দিক দিয়েই আমি হেরে গেছি।

লিলি সহসা রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কহিল, এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই মিনুদা। অন্ততঃ তুমি একথা কোনমতেই বলতে পার না—কিছুতেই না।

মৃন্ময় লিলির কথাটাকে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া কহিল, ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষটাকেই আমি সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলাম—তাকে ছোট করেও দেখি নি, বড় করেও নয়। কিন্তু তুমি এত রাগ করছ কেন ? উত্তেজিত হয়েই বা উঠছ কিসের জন্যে লিলি ? আমি কি কোন অন্যায় কথা বলেছি !

মৃন্ময়ের অনুতপ্ত হৃদয়ের এই অনুযোগে লিলি লজ্জা পাইল। সে মাথা নত করিল।

মৃন্ময় তেমনি শান্তভাবে বলিতে লাগিল, তা বলে তোমার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই লিলি। মানুষ কখনই তার স্বভাব-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে

পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে···সহসা সে কথার মাঝখানে থামিল।

দরজার সম্মুখে লছমিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতে তার একখানি চিঠি। লছমিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিঠিখানি মৃন্ময়ের হাতে দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। মৃন্ময় চিঠিখানি বিছানার একপাশে রাখিয়া দিয়া পূর্ব্বকথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, হ্যাঁ, একথা একটুও মিথ্যে নয় লিলি — সত্যই সে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

মৃন্ময় চোখ বুজিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। লিলি একটু নড়িয়া চড়িয়া পুনরায় স্থির হইয়া বসিল। চোখ-মুখের ভাব তার ক্ষণে ক্ষণে বদলাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে মৃন্ময় চোখ খুলিল। লিলির মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে গোপনতার বাহ্যিক আবরণ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাতে হয়তো আবার নূতন ক'রে ভুল বোঝার সুযোগ থেকে যাবে—তুমি কি বল লিলি?

লিলি কোন জবাব দিল না। তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিতে লাগিল, বহুদিন তোমার উক্তি এবং আচরণের মধ্যে, অকুণ্ঠ সেবার মধ্যে সে আভাস আমি বহু বার পেয়েছি। তুমি অস্বীকার করতে পার—তর্ক করতেও পার, কিন্তু আমি যা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি সে ত মিথ্যে হতে পারে না। এ তুমি কি করলে লিলি! আমার এত বড় একটা আশ্রয়-স্থলে, এত বড় একটা ভরসার ক্ষেত্রেও আজ আর আমি নিশ্চিন্ত নই—সুখী নই···আমাকে এত বড় লজ্জা, এত বড় সঙ্কোচের মধ্যে কেন তুমি ফেললে লিলি!

লিলি এতক্ষণে মুখ তুলিয়া চাহিল, সে মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সে উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, তুমি যত ইচ্ছা অনুযোগই আমায় দাও না কেন তার কোন জবাব আমি দেব না, কিন্তু মনে রেখো মিনুদা ভুল করেও কোন দিন কোন কারণে তোমার চলার পথে আমি বাধার সৃষ্টি করি নি। তোমার সুখী হতে না পারার জন্য তুমিই দায়ী, কিন্তু তোমার লজ্জা অথবা সঙ্কোচের কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পার এ নিশ্চয়তা তোমাকে আমি দিচ্ছি মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, সেইখানেই তো আমার আরও বেশী ভয়—মনে হয় বোঝা আমার দিন দিন শুধু ভারী হয়েই উঠছে। তোমাকে মিথ্যে বলব না—মাঝে

মাঝে আমার মনে হয় কেন আবার এখানে ফিরে এলাম। নান্তুর মত অদৃষ্টের উপর ভরসা করে আমারও পথেই বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল। তাতে অন্ততঃ আমায় এমন করে দোটানায় পড়তে হ'ত না। আমার জীবনে আবার নূতন করে জট পাকিয়ে উঠত না।

মৃন্ময় থামিল।

সহসা একখণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া আসিয়া চাঁদকে আড়াল করিল। হয়তো বাতাসের বেগে পুনরায় তাহা সরিয়া যাইবে—আবার জ্যোৎস্না হাসিয়া উঠিবে। লিলির একটি নিঃশ্বাস পড়িল, সে কোন কথা কহিল না। মৃন্ময় তার আনত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, অনেক দিন ধরেই প্রশ্নটা আমার মনে দেখা দিয়েছে—এখন কি করি? এখান থেকে চলে যেতেই চেয়েছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু এখন ভাবছি সেইটেই আমার উচিত ছিল।

লিলি সহসা সোজা হইয়া বসিল। স্থির অকম্পিত কণ্ঠে ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় বলিল, আমায় কিছু বলবে লিলি?

লিলি শান্তভাবে কহিল, বলতে আর তুমি দিচ্ছ কোথায়। শুধু নিজের কথাই এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছ। অনেক কিছুই তুমি বলেছ—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু একে অন্যায় বলেই যদি গোড়া থেকে তুমি জেনেছিলে তা হলে প্রশ্রয় দিয়েছিলে কিসের জন্য। আমি না হয় ভুল করে অপরাধ করেছি, কিন্তু সে ভুলকে জেনে শুনে প্রশ্রয় দিয়ে তুমি আরও বেশী অন্যায় করেছ।

মৃন্ময় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে ডাকিল, লিলি—

লিলি তেমনি উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিল, আমাকে বলতে দাও মিনুদা, কি মনে কর তুমি আমাকে?…কিছু বুঝি না আমি? গোড়াতেই যদি এখান থেকে চলে যেতে চেয়েছিলে কেন গেলে না জানতে পারি কি? আমি তোমায় ডেকেও আনি নি, থাকবার জন্যে সাধাসাধিও করি নি। তবু তোমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতা কেন দেখা দিয়েছিল? না সেটাও আমার ভুল—আমার অন্যায়।

একসঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া লিলি হাঁপাইতে লাগিল।

মৃন্ময়ের মুখে ভারী স্নিগ্ধ একটু হাসি দেখা দিল। সে সস্নেহে কহিল, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। এ সময় কোন কথা তোমায় না বলাই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তবুও আমায় বলতে হবে, নইলে এর পরে আর হয়তো কোন

দিন সুযোগই পাব না।

লিলি ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিল।

মৃন্ময় বলিয়া চলিল, তুমি যে অভিযোগ আজ করলে, এর জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না,তাই বলে একে অস্বীকার করবার উপায়ও আমার নেই। তবুও আমার মনে হচ্ছে এ তো লিলির সত্যিকার মনের কথা নয়। সে কি তার মিনুদাকে এক দিনের জন্যও চিনতে পারে নি। তার জীবনের কোন কথাই যে লিলির অজানা নয়। কিন্তু যাক এসব কথা। অভিযোগ সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তা সব সময় মনকে পীড়া দেয়। তাই ভাবছি এখানে ত আর কোন-ক্রমেই আমার থাকা চলবে না। এর পরে যে নিজের কাছেও কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারব না লিলি।

আকাশে সেই যে কালো মেঘ জমা হইয়াছিল তাহা এখনও সরিয়া যায় নাই। ঈষৎ আর্দ্র বাতাস বহিতে সুরু হইয়াছে। হয়তো এখনই বৃষ্টি আরম্ভ হইবে।...

লিলির চোখেও জল দেখা দিয়াছে। সে তাহাই গোপন করিতে অপর দিকে মুখ ফিরাইল।

মৃন্ময় সেইদিকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি পার তবে এসব ভুল-ভ্রান্তি এবং অভিযোগ থেকে দূরে সরে থেকো। তোমার জীবনের এই অধ্যায়কে বরং একেবারে ভুলে যেতে চেষ্টা করো। তোমার মিনুদা আর কোন দিন কোন কারণে তোমার সামনে আসবে না। জীবনে সে অনেক ভুল করেছে। আর একটা না হয় তার সঙ্গে যোগ হ'ল, কিন্তু একটা কথা আমার তুমি বিশ্বাস করো যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার এখানে আমি আসি নি, কিন্তু থাক্ সে সব কথা। মৃন্ময় থামিল।

লিলি এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। সে শান্তকণ্ঠে ডাকিল, মিনুদা—

মৃন্ময় সাড়া দিল।

লিলির দুই চোখের কোল বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়া আসিয়াছে। সে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি কি সত্যিই চলে যাবে?

মৃন্ময় কহিল, এ ছাড়া অন্য কোন পথই চোখে পড়ছে না যে—

লিলি কহিল, আর কোনদিন কোন ছলে আমার সামনে আসবে না?...

মৃন্ময় মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল, না আসাই তো উচিত—

লিলি সহসা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, মৃন্ময়ের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া

বলিল, আমি তোমায় যেতে না দিলেও তুমি এখান থেকে চলে যেতে পার মনে করো?

মৃন্ময় বাধা দিল না—হাতখানি মুক্ত করিয়াও লইল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমনি ভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটিল। লিলি ইতিমধ্যে নিজের দুর্দ্দমনীয় আবেগকে সামলাইয়া লইয়াছে। মৃন্ময়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সে একটু সরিয়া বসিল।

মৃন্ময় চেষ্টা করিয়া খানিকটা স্বাভাবিক ভাব ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, তুমি যেতে দেবে না কিসের জন্যে। আমার চলে যাওয়ার প্রয়োজন তো শুধু আমার একলার জন্যেই নয় লিলি, আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্যে এ ছাড়া আর পথ নেই।

লিলি যেন আপন মনেই বলিয়া চলিল, তা বটে—আমার কল্যাণের জন্যেই তোমাকে আমার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, আবার আমার মঙ্গলের জন্যেই তোমাকে চিরদিনের মতন আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে। বেশ কথা, তোমার কাজে বাধা দেবার আমি কে—কতখানি অধিকার আমার আছে! কিন্তু এক দিন হয়তো বুঝবে যে, কত সামান্য কারণে কত বড় নিষ্ঠুর শাস্তি তুমি আমায় দিলে।

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল—একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, পরমুহূর্ত্তেই মুক্ত দ্বার-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল। একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। তার চলার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া মৃন্ময়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। কিন্তু সে চলিয়া যাইতেই সহসা মৃন্ময়ের মনে হইল যে, কাজটা হয় তো ভাল হইল না। তাহা ছাড়া যে কথা লিলি বলিয়া গেল যুক্তি-বিচারের দিক দিয়া তাহা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

বাহিরে তুমুল ঝড় উঠিয়াছে—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। মৃন্ময় উঠিয়া জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিতেই তার চোখে পড়িল টেবিলের উপর সযত্নে রক্ষিত একখানি চিঠি। আশ্চর্য্য, এতক্ষণ চিঠিখানির কথা একেবারে ভুলিয়াই ছিল। মৃন্ময় সাগ্রহে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। লিখিয়াছে নান্টু—

মৃন্ময়,

এত শিগ্‌গীর যে আবার তোমায় চিঠি লিখতে পারব তা আমার নিজেরই ধারণা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্র আবার এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছে যে, খবরটা তোমাকে না জানিয়ে সোয়াস্তি পাচ্ছি না। শুনে আশ্চর্য্য

হবে যে, পথের পাশ থেকে আবার আমাকে গৃহকোণে আশ্রয় নিতে হয়েছে। না নিয়ে আমার উপায় ছিল না। মুখে যত বড়াই করি না কেন এটা সত্য যে, মাঝে মাঝে আমার মত ভবঘুরেও স্থির হয়ে বসতে চায়। এমন সময় আসে যখন একটু আরাম আর নিরুপদ্রব জীবনযাপন করাটা নেহাত অপছন্দও করি না। তাইতো আবার ফিরে আসতে হ'ল। নিজের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততঃ আর একটি মেয়ের জন্তে আমাকে মত বদলাতে হয়েছে, কিন্তু সেই থেকে ভাবছি যে, এই মেয়েজাতকে আজও আমি চিনতে পারলাম না। ওরা কখন যে কি বলে আর কখন যে কি করে তার অন্ত পাওয়া ভার। ওরা মনে মুখে সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষ করে আমার জীবনপথে যে কয়টির আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সম্বন্ধে একথা আমি বলতে পারি। বুঝতেই পেরেছ বোধ হয় যে, লীলা রাওয়ের হাত থেকে আজও আমি মুক্তি পাই নি। বিদায়বেলার সেই দুটি জলন্ত চোখের আড়ালে যে এত জল লুকানো থাকতে পারে তা কেমন করে জানব ভাই। আমার সকল অহঙ্কার, সকল দম্ভ ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মাত্র সাতটি দিন—এরই ব্যবধানে কি পরিবর্ত্তন! ওকে আর চিনবার উপায় ছিল না। ষ্টুডিওতে যাওয়া বন্ধ করে শুধু নাকি দিনরাত গাড়ী নিয়ে আমায় খুঁজে ফিরেছে।

নিরালা পথ ধরে চলেছিলাম। পাশে এসে দামী গাড়ীটা ব্রেক কষলে। গাড়ীর সে জৌলুস নেই। ধূলায় আচ্ছন্ন, কিন্তু তার চেয়েও শোচনীয় অবস্থা মনে হ'ল গাড়ীর মালিকের। অবাক বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাইতেই সে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বলে উঠল, কোন কথা নয়—ভেতরে এসো।

বললাম, কিন্তু···

লীলা ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, রাস্তার মাঝে এত লোকের সামনে পায়ে ধরতে বলছ নাকি—

বিচলিত হলাম। ওকে ঠিক ধাতস্থ মনে হ'ল না। বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলাম। লীলা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার একখানা হাত নিয়ে ছেলেমানুষের মত খেলা করতে লাগল। বাধা দিলাম না। মনে হচ্ছিল, লীলার পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সহসা লীলা বলে উঠল, কি করে যে এই সাতটি রাত আর সাতটি দিন আমার কেটেছে সে তুমি বুঝবে না নান্টু। তুমি যে কি তা আজও আমি বুঝলাম না।

হেসে উত্তর দিলাম, সম্ভবতঃ ইস্পাত—

ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে লীলা জবাব দিলে, উহুঁ—আঘাতে সেও বেঁকে যায়। কিন্তু তোমার তুলনা শুধু তুমি।

লীলার মুখের পানে চোখ তুলে চাইলাম। ওর দু'চোখে জল টল টল করছে। মুখে কিন্তু চমৎকার একটু হাসি লেগে রয়েছে। অনেক দিন পরে আবার সেই লীলাকে ফিরে পেলাম যাকে আর একদিন পেয়েছিলাম ওয়াল-টেয়ারে। যে স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমাকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছিল। ডাকলাম, লীলা—

ও সাড়া দিলে, উম্। লীলা চোখ বুজে একান্ত নির্ভরতায় আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে বসে ছিল।

বললাম, তুমি কি পাগল হয়েছ লীলা।...লীলার মুখে পুনরায় তেমনি মিঠে হাসি দেখা দিল। ওর হাতের মধ্যে আবদ্ধ আমার হাতখানায় একটু চাপ অনুভব করলাম। খানিক নড়ে চড়ে আরও ঘন হয়ে বসে লীলা সাড়া দিলে, হুঁ—মুখের হাসিটি কিন্তু তখনও তেমনি অম্লান। আমি মানুষ ত বটে। আমার অহঙ্কার এমনি করেই চূর্ণ হ'ল। আমি হেরে গেলাম, কিন্তু এ পরা-জয়ে আনন্দ আছে, অনির্ব্বচনীয় সে আনন্দ।...

চিত্রাভিনয় লীলা আর করবে না। বলে, ওতে নাকি প্রাণের খোরাক মেলে না। প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু বাইরের মিথ্যা জৌলুসে আসল জিনিষটাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এবং এই মিথ্যার জন্যে সে নাকি সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে পারবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, সত্য তুমি কাকে বলছ লীলা? তার সন্ধান ত এখনও পেলাম না।

লীলা ফিস ফিস করে বললে, তা কি তুমি জান না নান্টু? চোখে না দেখা গেলে বুঝি তাকে অনুভব করা যায় না!

জবাব দিলাম, সব সময় কি তা যায় লীলা?

লীলা ছেলেমানুষের মত ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, মিথ্যে বল নি নান্টু। আমি নিজেই কি এমন করে এর আগে অনুভব করতে পেরেছিলাম। কি ছাই ঐশ্বর্য্য, কিসের আবার মর্য্যাদা-প্রতিপত্তি। এর মোহ থেকেই যদি নিজেকে না মুক্ত রাখতে পারলাম তবে...কথাটা শেষ না করেই লীলা আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।...

ভাবছিলাম, লীলা কি সত্যিই বদলে গেছে আজ। এতখানি আবেগ, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করবার এমন আকুল আগ্রহ এর আগে কোন দিন তার দেখি নি। কিন্তু আমি বাধা দিতেও পারি নি। আমার রক্তের মধ্যে একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার জেগে উঠল। ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। দু'হাতে ওর মুখখানাকে তুলে ধরে দেখতে গেলাম। চোখে চোখ পড়তেই লীলা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বড় অপূর্ব্ব সুন্দর লাগল তাকে। লীলা আরও গভীরভাবে আমায় বেষ্টন করে রইল। মুখ সে কিছুতেই দেখাবে না। কথা বলে এই দুর্লভ মুহূর্ত্তটিকে অপচয় করতে পারলাম না। আমার সমস্ত দেহ, মন উন্মুখ হয়ে অনুভব করছিল এই নিঃশব্দ সমর্পণের মাধুর্য্যকে। ইস্পাতকে গলাতে বুঝি এমনি উত্তাপেরই প্রয়োজন হয় মিনু।

ধীরে ধীরে মুখ নীচু করে বললাম, এবারে ওঠ লীলা। বাড়ী এসে পড়েছ যে। লীলা উঠে বসল। মনে হ'ল, ওর এতক্ষণের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে। দ্রুত সে তার অবিন্যস্ত চুলগুলিকে যথাসম্ভব ঠিক করে নিলে। বিস্মিত হলাম —লীলার চোখে জল!

বড় আশ্চর্য্য লাগল। এর আগেও এমনি ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এত চাঞ্চল্য কোন দিন লীলার মধ্যে দেখি নি। কথাটা তাকে বললাম। ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললে, এ প্রশ্ন আমার মনেও দেখা দিয়েছে নান্টু। তার উত্তরও আমি পেয়েছি, কিন্তু কথাটা আমার মুখ থেকে নাই-বা শুনলে। দ্বিতীয় বার তাকে আর আমি প্রশ্ন করি নি।

বাড়ীতে পা দিয়েই লীলা বললে, চেহারা ত এ ক'দিনে খুবই চমৎকার হয়েছে। এবারে দয়া করে স্নানের ঘরে চলে যাও দেখি সুবোধ ছেলেটির মত।...তার পরে কিছু খেয়ে নাও। যতদূর মনে হচ্ছে খাওয়ার সঙ্গেও অসহযোগ চলেছিল।

লীলার আজকের অনুযোগ দেবার ভঙ্গীটিও বড় মিষ্টি লাগছে।

সেই থেকেই আমি ভাবছি জীবনের ধারা এ আবার কোন নূতন খাতে বইতে সুরু হ'ল। লীলা আজ আর অস্পষ্ট নয়। খোলাখুলি সে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমাকে তার চাই। একান্ত দৃঢ়তার সহিত সে তার দাবি জানিয়েছে—এর নড়চড় হলে নাকি খণ্ডপ্রলয় দেখা দেবে।

হেসে বলি, মন্দ কি জীবনের আর একটা নূতন দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে!

লীলা জ্বলে ওঠে।

আমি বলি, আমি পথের মানুষ—আমাকে ঘরে বাঁধবার চেষ্টা করো না লীলা। পথই আমার যথার্থ স্থান।

লীলা জবাব দেয়, বেশ ত ঘরের চেয়ে পথই যদি তোমার কাম্য হয় ত সেই-খানেই নূতন করে ঘর বাঁধব।

হেসে বলি, পথের বৈশিষ্ট্য তা হলে রইল কোথায়। এ যে নিছক বাড়ীবদল করা লীলা।

লীলা এবারে আর রাগ করে না, বলে, অতশত আমি বুঝি নে নাস্কু—

আমি বলি, কিন্তু বোঝা তোমার উচিত ছিল, তুমি কি মনে কর এমনি আরাম আর আয়েসের মধ্যে থাকলেই পোষ মানব। আমাদের স্বভাবই যে আলাদা। সুযোগ পেলে চলে যেতেও পারি—

লীলা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি কি মনে কর আমি তা পারি না। না এই সম্পদের লোভে পিছনে পড়ে থাকব। যে ভুল একবার করেছি কোন-কিছুর বিনিময়ে তা আর দ্বিতীয় বার করব না। তোমার পথেই আমার স্বর্গ রচনা ক'রব।

হেসে বলি, উত্তরটা কিন্তু ঠিক হ'ল না লীলা। তুমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ মনে হচ্ছে। শুধু নিজের কথাটাই বলে যাচ্ছ।

লীলা কথাটা স্বীকার ক'রে বললে, না হারালে কি ফিরে পেতাম নাস্কু?

হেসে জবাব দিলাম, খুব বেশী হ'য়ে যাচ্ছে না কি লীলা—

লীলা আমার একথায়ও কান দিলে না। সহসা সে আমার সামনে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল—কাঁধের উপর দুখানা হাত রেখে গভীর আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, তাকাও তো আমার মুখের পানে নাস্কু। হ্যাঁ এইবার বল পারবে আমায় ফাঁকি দিতে।

ওর কণ্ঠস্বরে একটা করুণ মিনতি ফুটে উঠেছে। আমার জবাবের উপর যেন ওর জীবন মরণের সমস্যা নিহিত রয়েছে।

আমি একটু হাসলাম, কিন্তু জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। লীলার নিজের যুক্তির উপর নিজেরই আস্থা নেই, তাই এমনি করে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অধীর আগ্রহে আমার প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করছে।

লীলা আবার বললে, তুমি হাসছ নাস্কু। তুমি কি ভেবেছ আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমায় শাস্তি দিতে পারবে? এত ছোট তুমি কিছুতেই

হতে পার না।

কি যে আমি পারি, আর কি যে পারি না এই মুহূর্ত্তে সেইটেই বড় প্রশ্ন নয়—বড় হয়ে উঠেছে আর একটি দুর্লভ বস্তু!

লীলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে জবাব দিয়েছি, মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। আমার চলার পথ দেখছি আপাততঃ তোমার ঘরেই এসে থেমে গেছে।

লীলা খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, তুমি আমায় বাঁচালে নান্টু—আজ আমি নিশ্চিন্ত। ও যে কি করবে, কি বলবে তা যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। এক বার বললে, আজ আমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবে, পরমুহূর্ত্তে বলে, একটা গান শুনবে নান্টু যে গান তুমি আমায় ওয়ালটেয়ারে শিখিয়েছিলে? যে গান শুনতে শুনতে তোমাকে আমি—লীলা কথাটা শেষ ক'রলে না।

আমার জীবনপথে লীলা প্লাবন নিয়ে এসেছে। জানি না এর প্রচণ্ড বেগ সব ভেঙে চুরে আবার কোথায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যেখানেই নিয়ে যাক্ আর আমি বাধার সৃষ্টি করব না। এতদিন ত নিজের মত করে চলে দেখেছি তাতে জমার ঘরে আজও শূণ্যই রয়ে গেছে। দেখা যাক লীলার কাছে আত্মসমর্পন করে জীবনে নূতন কিছু সঞ্চয় করতে পারি কিনা।—ভাল আছি।

ইতি—

নান্টু।

পুনশ্চ—দিনকয়েকের জন্য কোথাও যাব ঠিক করেছি। লীলা বলছে তোমাদের ওখানে যাবে এবং দু'এক দিনের মধ্যেই রওনা হবে। ওর সব-কিছুতেই অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো।

এই মাত্র আর একটা খবর পেলাম যে, মঞ্জুষা নাকি অত্যন্ত অসুস্থ। অবস্থাটা খুব জটিল বলেই সংবাদ পেলাম। যাবার পথে সঠিক খবরটা নিয়ে যেতে হবে। সময় মত তোমাকে তার পাঠাব। ষ্টেশনে থেকো।

নান্টু

চিঠিখানা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল লিলি নিঃশব্দে অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

লিলি বলিল, রাত্রে কি খাবে তাই জানতে এলাম।

মৃন্ময় অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, সেটা তুমিই ঠিক করে নিও।

লিলি আর দাঁড়াইল না।

মৃন্ময় খাইতে বসিয়াও বার বার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। লিলি তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিতে কোন খারাপ খবর নেই তো ?

লিলির প্রশ্নে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল এবং কোন কিছু না ভাবিয়াই জবাব দিল, না—

তেমনি মৃদু কণ্ঠেই লিলি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবে ঠিক করলে মিনুদা ?

মৃন্ময় মুখ তুলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে লিলিকে উপলক্ষ্য করিয়া এত কথা হইয়া গিয়াছে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মৃন্ময় একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু সেই ভাব যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিল, সেটা এখনও ঠিক করি নি। বাধ্য হয়ে হয়তো আরও দিনকয়েক থেকে যেতে হবে।

লিলির মুখে একটুখানি হাসি দেখা গেল। বলিল, এত কথার পরেও তুমি কোন ভরসায় আরো কিছুদিন থাকতে চাও মিনুদা ? তোমার সাহস তো কম নয়।

কথাটা গায়ে না মাখিয়াই মৃন্ময় পুনরায় বলিল, নান্টু লিখেছে সে লীলা রাওকে নিয়ে এখানে আসছে। ভাবছি যদি এখনও সে রওনা না হয়ে থাকে তা হলে একটা তার করে তাদের এখানে আসতে বারণ করে দেব—

লিলি চমকাইয়া উঠিল। বলিল, এ কথা আমায় এতক্ষণ বল নি কেন তুমি। তা ছাড়া বারণ করতেই বা তোমায় আমি দেব কেন। তোমার কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে মিনুদা। একথা তুমি ভাবতে পারলে কি ক'রে …ছিঃ ছিঃ…

লিলির এ যেন আর এক নূতন রূপ। মৃন্ময় বলিল, তুমি যদি ভরসা দাও তা হলে আমি কালই বেরিয়ে পড়তে পারি। ওরা এলে ওদের সকল ভার যদি তুমি নাও—

শুনিতে শুনিতে লিলির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, বাধা দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল— মানুষের নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত মিনুদা। তোমার নান্টুদা কিংবা লীলা আমার কেউ নয়। শুধু তোমার জন্যেই তোমার ব্যবস্থাকে আমি মেনে

নিতে রাজী হইনি। নইলে তাদের নিয়ে আমার সত্যিই মাথা ব্যথার কোন কারণ নেই।

মৃন্ময়ের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, আমার মনের ভারসাম্য খুব সম্ভব হারিয়ে ফেলেছি তাই আগে পরে গোলমাল হ'য়ে গেছে। ঠিক গুছিয়ে সব কথা বলতে পারি নি। পদে পদেই হয় তো আমার দোষ-ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু তার বিচার পরে করো লিলি। আপাততঃ আমার বক্তব্যটা শেষ করতে দাও।

মৃন্ময়ের কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে লিলি বিস্মিত হইল। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিলে মৃন্ময় আবার বলিতে লাগিল, মঞ্জুর নাকি খুবই শক্ত অসুখ তাই···নইলে সব জেনে শুনে আবার নূতন করে আমি দেনার বোঝা বাড়াতে চাইতাম না লিলি। এতটা অকৃতজ্ঞ···

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই লিলি উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, নান্টুবাবু লিখেছেন বুঝি? সহসা সে হাত বাড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, দেখি কি লিখেছেন।

মৃন্ময় জবাব দিল, চিঠি তো আমি সঙ্গে করে আনি নি। পরে দেখো। তাই বলছিলাম, নইলে বাধ্য হয়ে আমাকেও তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

লিলি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়তার সহিত বলিল, তুমি বরং নান্টুবাবুকেই একটা টেলিগ্রাম করে এখন আসতে নিষেধ করে দাও। তার কাছ থেকে একটা উত্তর পেলে আমরাই এখান থেকে রওনা হব।

মৃন্ময়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"আমরা"!

লিলি কহিল, আমরাই—তুমি এবং আমি। তুমি ভেবেছ এই সময় তোমায় আমি একলা ছেড়ে দিতে পারব মিনুদা। সে হয় না—তাছাড়া আমি যতদূর জানি তাদের দেখাশুনা করবার জন্যে সেখানে আর দ্বিতীয় মেয়েছেলে নেই।

মৃন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি যাবে—

লিলি একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

মৃন্ময় বলিল, ক্ষতির কথা আমি ভাবছি না লিলি—

লিলি জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে কি ভাবছিলে তুমি মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল, ভাবছিলাম তোমারই কথা—

লিলির মুখে পুনরায় একটুখানি হাসি দেখা দিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল। 'আমার কথা'—বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল, আমার কথা নিয়ে দুর্ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই। আমার কথা আমাকেই ভাবতে দাও।···কিন্তু আপাততঃ এ সব থাক, তুমি খাও মিনুদা।

মৃন্ময় পুনরায় আহারে মনোযোগ দিল। এবং তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল।

লিলি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

মৃন্ময় তাহার ঘরে আসিতেই লিলি বলিল, দেখি তোমার নাস্কুদার চিঠি—

চিঠিখানি তাহার হাতে দিতেই লিলি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, স্পষ্ট করে কিছু না লিখলেও মনে হচ্ছে সংবাদটা সত্য। কিন্তু এত বেশী উতলা হবার কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। তবুও তুমি কাল সকালেই কলকাতার ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করে দিও।

লিলি আর অপেক্ষা করিল না।

সারারাত মৃন্ময়ের যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটিল। শুধু এই কথাই সে ভাবিয়াছে যে, এ অবস্থায় তার কর্ত্তব্য কি। ভোরবেলা লিলির সঙ্গে দেখা হইতেই সে বলিল যে, সেখানে তার উপস্থিতির কোনও প্রয়োজন আছে কিনা ইহা না জানিয়া সে ওমুখো হইবে না।

লিলি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমার আসল বক্তব্যটা কি ?

মৃন্ময় জবাব দিল, অত্যন্ত সাধারণ বিষয়—অপ্রয়োজনে সেখানে গেলে হয়তো তাদের ভাল করতে গিযে আরও মন্দ করে বসব লিলি। সেইজন্যেই আমি ভয় পাচ্ছি···

লিলি বলিল, যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আমার কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। মোটের উপর আমি হলে কি করতাম তাই তোমাকে জানিয়েছি।

লিলি চলিয়া গেলে মৃন্ময় আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নাস্কুকে তার করিয়া সে যেন কতকটা স্থির হইল।

ঐ দিনই নাস্কুর জবাব আসিল—'বিলম্ব করিও না। চলিয়া আসিও'।

মৃন্ময় নান্তুর টেলিগ্রামখানা লিলির হাতে দিতে সে কহিল, যাবার জন্তে লিখেছে এই তো? কিন্তু আজ আর কোন গাড়ী নেই। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়া যাবে। তুমি এই সংবাদটা নান্তুবাবুকে জানিয়ে দাও।

লিলির চলায়, বলায় একবিন্দু চাঞ্চল্য নাই। বন্ধুর মত উপদেশ দিতেছে। কিন্তু সে উপদেশ পালন করিবার জন্য কোন প্রকার অনুরোধ করিতেছে না। আজিকার লিলি মৃন্ময়ের কাছে কতকটা নূতন।

মৃন্ময় একবার লিলির পানে চাহিল। লিলি যেন বাস্তবিকই দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময় পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। একটা দম দেওয়া ঘড়ির মতই যেন সে চলিয়াছে। কি জানি কেন আজ তার বার বার মনে হইতেছে তার নিকট এ সবের কোনই প্রয়োজন নাই। অথচ আগামী কাল রওনা হওয়া তার অবধারিত এবং নান্তুর নিকট হইতে খবরটা পাইয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠার ভাবও সুপরিস্ফুট। এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

মৃন্ময় ফিরিয়া আসিতে লিলি বলিল, তুমি থামোকা দুশ্চিন্তা করছ মিনুদা একথা আমি জোর করে বলতে পারি।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কোন বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করা আমি বহু দিন ছেড়ে দিয়েছি। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা—

তাহাকে বাধা দিয়া লিলি কহিল, নিজেকে গোপন করবার এই বৃথা চেষ্টায় কি লাভ হয় তোমার বলতে পার? তোমার মনের কথা যে মুখের উপর ফুটে উঠেছে মিনুদা—

মৃন্ময় কহিল, গোপন করবার চেষ্টা তো কোন দিন আমি করি নি। আর একথা তুমি বেশ ভাল করে জান বলেই আমার বিশ্বাস।

লিলির মুখে একটু হাসি দেখা দিল। মৃন্ময়ের তাহা চোখে পড়িল। সে বলিতে লাগিল, জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে প্রথম যেদিনে প্রচণ্ড বাধা এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার এগিয়ে চলা বুঝি চিরদিনের জন্যই ব্যাহত হ'ল। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাটাও আমার মনে হলো যে, তা হলে ত চলবে না, একটা পথ রুদ্ধ হলেও ভিন্ন পথে চলতেই হবে। সে পথ খুঁজে পাচ্ছি না বলেই হয়তো এগিয়ে যাওয়া আজও সম্ভব হচ্ছে না।

লিলি বলিল, শক্তি নেই বলেই এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, নইলে সামনের ঐ মাটির বাঁধ এতদিনে তুমি ভেঙ্গেচুরে এগিয়ে যেতে পারতে। যাকে প্রচণ্ড বাধা

ভেবে ভয়ে পিছিয়ে পড়লে, এগিয়ে গেলে বুঝতে পারতে ওটা নিছক তোমার দৃষ্টি-বিভ্রম, কিন্তু এসব কথা এখন থাক মিনুদা। ধীরে সুস্থে কথাটা ভেবে দেখবার ঢের সময় এর পরে তুমি পাবে। তার চেয়ে জিনিষ-পত্রগুলো তোমার ঠিক করে নাও।...পরে হয়তো আর সময় পাবে না।

মৃন্ময় বলিল, একবার রাজাবাবুর কাছ থেকে—

বাধা দিয়া লিলি বলিল, তার প্রয়োজন হবে না। খবর তিনি ঠিক সময়ই পেয়েছেন। যেতে চাও তো পরে ধীরে সুস্থে এক বার ঘুরে এসো। এখন যা বলছি তাই করো।

কিন্তু মৃন্ময়ের যেন কোন কাজেই তেমন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না।... কেমন যেন একটা ঔদাসীন্য তাহাকে পদে পদে দমাইয়া দিতেছে।

নান্টুর সাক্ষাৎ ষ্টেশনেই পাওয়া গেল। সে একলাই আসিয়াছে। মৃন্ময়দের আসিবার কথা এক লীলা ছাড়া আর কাহাকেও সে জানায় নাই। নান্টুই প্রথমে হাসিমুখে তাহাদের প্রশ্ন করিল, পথে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি তো তোমাদের?

মৃন্ময় জানাইল, কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু মঞ্জুষা সম্বন্ধে সে ভালমন্দ কোন প্রশ্নই করিল না।

প্রশ্ন করিল লিলি, মঞ্জুষা কেমন আছেন সে কথা তো আপনি বললেন না?

নান্টু এতক্ষণে ভাল করিয়া লিলির মুখের পানে চাহিল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, দেখুন ইচ্ছে থাকলেও সেখানে আমি যেতে চাই না, তাতে ফল উল্টো হতে পারে এই আশঙ্কায়...

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ কহিল, আপনি সব কথা শুনেছেন বলেই বলছি। তার খবর আমি রোজই পাই। অবস্থাটা বেশ ঘোরালো বলেই তো সবাই বলছে, কিন্তু এসব কথা বাড়ী গিয়ে শুনবেন, তুই কি বলিস মিনু?...

মৃন্ময় কহিল, তোমার ওখানেই আমরা যাচ্ছি বোধ হয়।

নান্টু বলিল, আপাততঃ এই ব্যবস্থাই আমার সমীচীন মনে হ'ল। পরক্ষণেই

লিলিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—আপনি কি বলেন ?

লিলি কোন জবাব দিল না, একটুখানি হাসিল মাত্র।

নাঙ্কু বলিল, তবে এ ব্যবস্থা যদি তোমাদের ভাল না লাগে পরে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে—আপাততঃ ষ্টেশনে বসে এ সমস্যার সমাধান না করলেও ক্ষতি নেই।

মৃন্ময় কহিল, না না নাঙ্কুদা, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আবার কি হতে পারে। তা ছাড়া কোন কারণেই আর সে বাড়ীতে গিয়ে আমি সরাসরি উঠতে পারি না, তা কিছুতেই সম্ভবও নয়।

নাঙ্কু কতকটা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিল। সে দৃষ্টির সম্মুখে মৃন্ময় কেমন যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

নাঙ্কু বলিল, এর জবাব তোমায় আমি পরে দেব মিনু—দু'দিন ট্রেনে কাটিয়ে এইমাত্র তুমি নেমেছ। এখন কিছু বলতে চাই না।···

গাড়ীতে উঠিয়া কেহ আর একটি কথাও কহিল না। সকলেরই কণ্ঠ যেন মূক হইয়া গিয়াছে। অবশেষে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইতেই নাঙ্কু বলিয়া উঠিল, এটা লীলার বাড়ী, কিন্তু তাই বলে তোমাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের কারণ নেই। ঐ যে লীলাও তোমাদের প্রতীক্ষা করছে।

লিলি নিঃশব্দে গাড়ী হইতে নামিল। লীলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। মৃন্ময় নাঙ্কুর অনুসরণ করিল।

চা পানান্তে নাঙ্কুই প্রথম কথাটা পাড়িল। বলিল, আমার মনে হয় খাওয়া দাওয়ার পরে খানিক বিশ্রাম করে গেলেই চলবে। তোর কি মনে হয় মিনু ?

মৃন্ময় বলিল, কথাটা আগে ভেবে দেখি নি, কিন্তু এখন ভাবছি—এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন কিনা।

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, তুমি ভুল বুঝো না নাঙ্কুদা—আমি কোন কারণেই আর তাদের উত্তেজিত করতে চাই না।

নাঙ্কু ঈষৎ হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, তুই মঞ্জুর বাবার কথা ভাবছিস মিনু ? তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তোকে খবর পাঠাই নি। ভদ্রলোক একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পাছে আবার তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয় এই আশঙ্কাও আমি করছি। মাঝে তিনি বেশ ভালই ছিলেন। রাধু এখানে না থাকলে যে কি হতো আমি ভাবতেই পারি না। সেও বার বার তোকে

খবর দেবার কথা বলছিল।

মৃন্ময় আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। কহিল, রাধুও কি এখানেই আছে নাকি?

নাঙ্কু কহিল, কোন খবরই রাখ না দেখছি। বহুদিন ধরে ওরা এখানেই আছে। মঞ্জুর নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানটি এখান থেকে খুবই কাছে। রাধু সেখানেই সস্ত্রীক থাকে। মঞ্জুর অসুখ হওয়ায় তার দেখাশুনা করবার জন্যে তারা এখন ওদের বাড়ীতেই আছে।

মৃন্ময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, একবার বোষ্টমদাকে খবর পাঠানো যায় না? ওকে আমার সর্ব্বপ্রথম দরকার হয়ে পড়েছে নাঙ্কুদা।

দরকার হলে নিশ্চয় পাঠাব। বলিয়া নাঙ্কু সহসা স্থানত্যাগ করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, লীলাকে বলে এলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে।

মৃন্ময় নীরব। নাঙ্কু খানিকক্ষণ তার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ভেবে কোন লাভ হবে না মিনু। বরং আমার মনে হচ্ছে মঞ্জুর এমনি একটা শক্ত অসুখেরই প্রয়োজন ছিল। এতে হয়তো শাপে বরই হবে।

মৃন্ময় সহসা মুখ তুলিয়া চাহিল। শান্ত ভাবে বলিল, তা হয় ত হবে নাঙ্কুদা। কিন্তু আমি আজও মনস্থির করে উঠতে পারি নি।

নাঙ্কু এতক্ষণ সবদিক বাঁচাইয়া অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু মৃন্ময়ের শেষ কথায় একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, তোমার এ কথার মানে মৃন্ময়? তুমি আজও কি এতই ছেলেমানুষ রয়ে গেছ যে, অবস্থার গুরুত্বটা বোঝ না? তা হলে এসেছ কিসের জন্যে? না মৃন্ময়, তোমার এ সব কথা মোটেই সমর্থন করা যায় না।

মৃন্ময় নাঙ্কুর এই রূঢ় বাক্যে মোটেই রাগ করিল না। কহিল, তুমি অনর্থক রাগ করছ নাঙ্কুদা। তোমায় আমি একতিল মিথ্যে বলি নি। আমার সব কথা তুমি জান না বলেই একথা বলতে পারছ।

নাঙ্কু তেমনি উত্তেজিত ভাবেই বলিতে লাগিল, এর মধ্যে আবার জানা-জানির কি থাকতে পারে? না জেনে না বুঝে ভুল যদি করেই থাক তা হলে এখন তা শোধরাবার চেষ্টা করবে—এই হচ্ছে সার কথা। আমার অনুরোধ মিনু মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে আর ছেলে খেলা করো না।

মৃন্ময় কহিল, বুঝলাম, কিন্তু—আমায় বিশ্বাস কর তুমি, নিতান্ত অকারণে

আজ এ কথা বলছি না।

নাঙ্কু বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, সে কারণটা কি একবার শুনতে পাই? মঞ্জুকে তুমি ভালবাস এ কথাটা ত সত্য, অথচ যেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তারই জন্য সত্যকে তুমি মেনে নিতে পারছ না!

মৃন্ময় নির্ব্বিকার ভাবে জবাব দিল, আমি বুঝতে পারছি না তুমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কিসের জন্য?

নাঙ্কু কহিল, উত্তেজিত হব না মিনু? তুমি বল কি? এতেও মানুষ উত্তেজিত না হয়ে পারে?

নাঙ্কু থামিল এবং কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার সব কথা তোকে হয় ত ঠিকমত বোঝাতে পারি নি; কিন্তু বিশ্বাস কর মিনু যে, মঞ্জুর কথা ভাবতে গেলেই আমার নিজেকেই সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী বলে মনে হয়। তাই প্রতিকারের আশায় এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তা ছাড়া মঞ্জুকে সুখী দেখলে যে, আমি কত বেশী আনন্দিত হব তা তুই কল্পনা করতেও পারবি নে। তবুও হয় ত তার জন্যে তোকে অনুরোধ করতে যেতাম না, যদি তোর মনের সত্যকার ইচ্ছাটা আমার অজানা থাকত।

মৃন্ময় একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুমি এত কথা যে কেন বলছ তা কিন্তু বাস্তবিকই এখনও আমি বুঝতে পারছি না নাঙ্কুদা।

নাঙ্কুর মুখে কেমন এক ধরণের বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, তা হলে আসল কথাটা কি মিনু?

মৃন্ময় কহিল, কিছুই না। মঞ্জুর অসুখ মারাত্মক এই দুর্ভাবনাই যথেষ্ট, এর অতিরিক্ত তার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবি নি। সে ভাল হয়ে উঠুক এই কামনাই করি এবং সেই আশা নিয়েই ছুটে এসেছি, এর বেশী চিন্তা করবার অবকাশ পেলাম কোথায় নাঙ্কুদা। আমি শুধু বর্ত্তমানকেই দেখতে পেয়েছি।

নাঙ্কু বলিল, তোমার এ সব কথার কোন মানে হয় না। অতীত ছিল বলেই বর্ত্তমান তোমাকে টেনে আনতে পেরেছে মিনু।

মৃন্ময় বলিল, মানে হয় বৈকি নাঙ্কুদা—নইলে এ কথা আমি বলতাম না। আর আমার এ কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ ত আমি নিজেই। পথ হয় ত আজও আমাদের একই আছে, কিন্তু মত যে দুটো হয়ে গেছে এ কথা তুমি ভুলতে পারলেও আমার পক্ষে ভোলা সহজ নয়।...

মৃন্ময় থামিল।

নাঙ্কু এ সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, তার মন সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

মৃন্ময় পুনরায় বলিতে লাগিল, তা ছাড়া এমনও হতে পারে যে, নিতান্ত অকারণেই তুমি ভেবে মরছ। শেষ পর্য্যন্ত হয় ত দেখবে এর সবই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

নাঙ্কু বার বার মাথা নাড়িতে লাগিল। বলিল, অনাবশ্যক প্রমাণ হলেই ভাল।

মৃন্ময় চেষ্টা করিয়া মুখে খানিক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, তুমি মাথা নাড়ছো, সেই সঙ্গে আমার উক্তির প্রমাণও খুঁজছো, কিন্তু যেদিন আমার মুখের উপর মঞ্জু তাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তখন যদি তুমি সেখানে উপস্থিত থাকতে তাহলে আজ একথা আমাকে বলতে পারতে না নাঙ্কুদা।

তোর জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হয় মিনু, নাঙ্কু বলিল, আমি এখনও তোদের মত অতটা হিসেবী হয়ে উঠতে পারলাম না। যা মনে আসে তাই বলে ফেলি। অথচ যে সহজ এবং সাধারণ ব্যাপারটা আমার দৃষ্টি এড়াল না তোর চোখে তা পড়ে নি। আর একটু সাদা চোখে দেখতে চেষ্টা কর মিনু, দেখবি সব কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সব তোর ভুল বোঝার স্থূল পরিণতি। কথার মাঝে সহসা সে অন্য প্রসঙ্গে আসিল। ঐ যে তোমার বোষ্টমদা এসে পড়েছেন। তোমরা বস, আমি বরং দেখে আসি লীলা তোমাদের খাওদা-দাওয়ার কতদূর কি করেছে।

মৃন্ময় বুঝিল যে, নাঙ্কু ইচ্ছা করিয়া সরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে বাধা দিল না। রাধু ঘরে প্রবেশ করিতেই মৃন্ময় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

রাধু বসিল। কিন্তু কেহই বহুক্ষণ যাবৎ কোন কথা কহিতে পারিল না। মৃন্ময় কি জানি কেন অকারণেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আরও কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটিলে রাধু মৃন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, আজ সকালেই বুঝি তোমরা এলে?

মৃন্ময় বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু গাড়ী প্রায় দু'ঘণ্টা দেরীতে এসেছে।

রাধু বলিল, বড্ড কষ্ট হয়েছে তা হলে।

মৃন্ময় কহিল, না কষ্ট আর কি—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

রাধু পুনরায় বলিল, ডেকে পাঠিয়েছ কেন তা তো বললে না দাদাঠাকুর।

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এখানে আছ শুনে বড় দেখতে ইচ্ছে হ'ল। মনে হচ্ছে কত যুগ যেন তোমায় দেখি নি—

রাধু কহিল, বড় কম সময় তো নয়। প্রায় ছ'বছর তো বটেই।

মৃন্ময় মৃদু কণ্ঠে বলিল, ঐ রকমই হবে, কিন্তু এরই মধ্যে একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ।

রাধু হাসিল, কোন জবাব দিল না।

মৃন্ময় বলিল, বোষ্টমী সঙ্গে এসেছে ত?

রাধু বলিল, নইলে আর যাবে কোথায়? আমি ছাড়া ওর আর কে আছে ভাই···

মৃন্ময় প্রশ্ন করিল, ভাল আছে ত?

রাধু কহিল, প্রভুর কৃপায় একরকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মঞ্জুদিদির অসুখে সব গোলমাল হয়ে গেল। কি জানি ঠাকুরের কি ইচ্ছে।

রাধুর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। সে চোখ মুছিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, প্রাণটা না তার শেষ পর্য্যন্ত নিজের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়।···

মৃন্ময় নীরব।

রাধু বলিতে লাগিল, কি জানি কেন এমন হ'ল। একটা দিনের জন্যও কি শান্তি পেলে। অথচ গরীবের প্রতি কি· তার দরদ! দেশ ভাগ হ'ল। যাদের বিষয়-সম্পত্তি ছিল দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে মান ও প্রাণ বাঁচালে। বিপদে পড়লাম আমরা, যাদের অন্য কোনও উপায় ছিল না। দিদি গিয়ে উপস্থিত। বললে, একটা খবর পাঠালে পারতে বোষ্টমদা। তারপর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। শুধুই কি তাই—গ্রামের দুর্ভাগাদের সাহায্য করতে লাগল প্রাণপণে। তাদের সাদরে ডেকে এনে সাধ্যমত জায়গা জমি দিলে, বাড়ী ঘর তৈরি করিয়ে দিলে। তাদের বেঁচে থাকার একটা ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করলে। দিনরাত এই নিয়ে কি অমানুষিক পরিশ্রমটাই তাকে করতে হ'ল, কিন্তু সুখের শরীরে এত ধকল সইবে কেন?

রাধু থামিল। মৃন্ময় তেমনি চুপ করিয়া শুনিতেছে।

রাধু পুনরায় বলিতে লাগিল, শেষ পর্য্যন্ত আমিই হলাম তার অসুখের নিমিত্তের ভাগী। মঞ্জুদিদি বললে, সময় যে আর কাটে না বোষ্টমদা। পরামর্শ দিলাম, দুঃস্থ মেয়েদের জন্যে একটা স্কুল করতে। দিদি আমার নাওয়া-খাওয়া

ভুলে কাজে লাগল। কিন্তু রক্তমাংসের শরীর ত দাদাঠাকুর। এতটা সইল না।

রাধু থামিল। একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, কতবার বলেছি এমন করে দেহকে কষ্ট দেওয়া ত ঠিক হচ্ছে না মঞ্জুদি, একটা অসুখ-বিসুখ হলে কি হবে?

দিদি আমার হেসে জবাব দিলে, তুমি পাগল হয়েছ বোষ্টমদা—অসুখ আমার হয় না। আর যদি হয়ই তবে ভাবনা নেই। তোমরাই ত দেখবার জন্য আছ। তার পর সত্যিই দিদি অসুখে পড়ল। আমরা ত আছি সে কথা ঠিক, মানুষের সাধ্যমত করাও হচ্ছে সবই, কিন্তু কি জানি আমার যেন কেবলই মনে হচ্ছে, মঞ্জু দিদির আসল রোগের চিকিৎসা হচ্ছে না।

মৃন্ময় এতক্ষণে মুখ খুলিল, বলিল, এ কথা ডাক্তারকে জানালে পারতে বোষ্টমদা।

রাধুর মুখে কেমন যেন একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, জানিয়েছি বৈকি দাদা। তাই ত তোমার নান্টুদাকে কাছে পেয়ে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছি, ভগবান তোমার মহিমা না বুঝে কত অন্যায় দোষারোপ তোমার উপর করি—

রাধুর দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। আকুল কণ্ঠে সে বলিল, বললাম দাদাঠাকুর আমাদের বড় বিপদ। মঞ্জুদিদিকে বুঝি আর বাঁচাতে পারি না।

মৃন্ময় খুব নীচু গলায় প্রশ্ন করিল, এখন কেমন আছে মঞ্জু?

রাধু বলিল, ডাক্তার বলেন ভয়ের কিছু নেই, আমি কিন্তু ভরসাও পাচ্ছি না। আর তেমনি অবুঝ হয়ে উঠেছেন মঞ্জুদিদির বাবা। কখন যে কি বলেন আর কখন যে কি করেন তার কিছু ঠিক নেই। মেয়ের অসুখের কথা ভেবে ভেবে যেন তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠেছে।

রাধু থামিল। ক্ষণকাল চক্ষু বুজিয়া কি চিন্তা করিয়া পুনরায় মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, নান্টুদাকে না পেলে তোমাকেই কি খবর পাঠান সম্ভব হ'ত। তোমাদের কাছে পেয়ে কত যে ভরসা পাচ্ছি। তুমি অভয় দিলে দিদিকে হয় ত বাঁচাতে পারব।

মৃন্ময় কোন জবাব দিল না।

রাধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমার কথাটা কি শুনতে পাও নি

দাদাঠাকুর ?

মৃন্ময় শান্ত ভাবে জবাব দিল, শুনেছি বৈকি, মঞ্জু ভাল হয়ে উঠুক সে কি আমার কাম্য নয় বোষ্টমদা ? ভাল সে নিশ্চয়ই হবে। তোমরা তাকে অত্যন্ত ভালোবাস বলেই এতটা ঘাবড়াচ্ছ।

রাধু একটি নিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া বলিল, হয় ত ঠিকই বলেছ দাদা। কিন্তু ভয় কি আর সাধে পাই—তিন তিনটে দিন এক ফোঁটা জল গ্রহণ করে নি, একটা কথা বলে নি। বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল। জ্ঞান হতে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কেমন বোধ করছ দিদি ? ইশারায় চুপ করতে বললে। কিন্তু তাই কি পারি—বললাম, একটু ভাল বোধ করছ দিদি ? ঘাড় নেড়ে জানালে, ভালই আছে—আশান্বিত হয়ে উঠলাম। তার পরে একটি একটি করে পনের দিন কেটে গেল, কিন্তু ভাল লক্ষণ ত কিছুই দেখছি না। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই সে যেন অসুখটাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

মৃন্ময় কহিল, একথা তোমাদের মনে উঠছে কেন বোষ্টমদা ?

রাধু বলিল, মনে কি এমনিতে ওঠে দাদাঠাকুর—নিজের কোনো কথাই সে আজ পর্য্যন্ত কাউকে বললে না, শুধু মাঝে মাঝে তার দু'চারটে ভাসা ভাসা কথা থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারি, কারণ গোড়া থেকেই যে তোমাদের দু'জনকে আমি জানি। তাই ত ভাবি মনের মধ্যে এ আগুন পুষে রেখেও এমন সহজ ভাবে সে এতদিন চলতে পেরেছে কেমন করে।

মৃন্ময় ডাকিল, বোষ্টম দা—

সে যেন একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে মনে হইল।

রাধু স্মিতমুখে বলিল, তুমি কি রাগ করলে দাদাভাই—আমি ত কোন অন্যায় কথা বলিনি···

মৃন্ময় নিজের আচরণে নিজেই লজ্জিত হইল। কহিল, না না রাগ করব কিসের জন্যে। এতে রাগ করবার কি আছে।

রাধু বোষ্টম পুনরায় বলিতে লাগিল, তাই ত বহুদিন পরে আবার যেদিন তাদের গ্রামে ফিরে যাবার সংবাদ পেলাম সেদিন আকুল আগ্রহে ছুটে গেলাম। তোমাকে মিথ্যে বলব না দাদাঠাকুর, আমি তোমাকেও তাদের সঙ্গে দেখবার আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আশা সফল হ'ল না, মনে ব্যথা পেলাম। সব শুনে অনুযোগ দিয়ে বললাম, এ কাজ কেন করতে গেলে দিদি ? যখন জানতে না সে ছিল এক—কিন্তু জেনে শুনে তুমি কোন প্রাণে তাকে নিজের ঘর থেকে-

বিদায় করে দিলে—

মঞ্জুদিদির মুখে বড় বিচিত্রমধুর হাসি ফুটে উঠল। বললে, তুমি এত বোঝ আর এই সোজা কথাটা বুঝলে না। প্রাণ গেলেও মিনুদাকে আমি ছোট করতে পারব না। সে আমার সকল কাজের মধ্যে চিরদিন বেঁচে থাকবে বোষ্টমদা।…

মৃন্ময়ের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, তার পর বোষ্টমদা?

রাধু বলিতে লাগিল, ভাবলাম মঞ্জুদিদি হয় ত ঠিক কথাই বলেছে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওসব শুধু কথার কথা—স্রেফ মনভুলানো কথা। জানি মঞ্জুদিদির মত ভালবাসতে খুব বেশী মেয়ে পারে না, কিন্তু কই সে ভালবাসা ত তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারলে না।…

রাধু মুহূর্ত্তের জন্য থামিল এবং পুনরায় মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে যাইতেই নাক্কু আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাধুকে বলিল, এত বেলায় না খেয়ে যেও না ঠাকুর।

দেয়াল-ঘড়ির পানে চোখ তুলিয়া রাধু চমকাইয়া উঠিল, বলিল, ইস এতখানি বেলা হয়ে গেছে! দাদাঠাকুর আমাকে যদি খেয়ে যেতে হয় ওদিকে তা হলে মঞ্জুদিদির খাওয়া হবে না। আমি যাচ্ছি। সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

রাধু চলিয়া যাইতে নাক্কু মৃন্ময়কে বলিল, আশ্চর্য্য লোক এই বোষ্টমঠাকুর। কি ভালই না বাসে মঞ্জুকে।

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিল, কিন্তু তোকেও যে এখন উঠতে হবে মিনু। আমাদের জন্যে ওদের নইলে দেরী হয়ে যাবে।

মৃন্ময় নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নাক্কু ডাকিয়াছে—মৃন্ময় বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার সহিত চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আহারে তার প্রবৃত্তি ছিল না। রাধুর কথাগুলিই তখনও ওর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাধু মঞ্জুষার কেহই নহে, অথচ এখানে খাইতে বসিলে পাছে মঞ্জুষার দেরী হইয়া যায় তাই সে চলিয়া গেল।…কর্ত্তব্য…কঠিন

কর্ত্তব্য। কিন্তু শুধু কি তাই···

নান্কু তাকে অনুযোগ দিয়াছে—তার জন্য মৃন্ময় সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে। এগুলিকে সে তার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়াই আজকাল মনে করে। কিন্তু রাধু বোষ্টম এসবের ধার দিয়াও গেল না।···

মৃন্ময় খাইতে বসিয়াও কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে ভাত নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া রাধুর কথাগুলি তার কানের কাছে ধ্বনিত হইতেছে। মঞ্জুষা তার মিনুদাকে বিমুখ করিয়াছে, তাকেই সমাজের কাছে ছোট হইবার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য। প্রাণ গেলেও সে তার মিনুদাকে ছোট করিতে পারে না। তার নিজের জন্যও না।···

তা হয়তো পারে না, কিন্তু তার সেদিনের প্রত্যাখ্যান যে ধীরে ধীরে মৃন্ময়কে···

নান্কুর আকস্মিক আহ্বানে মৃন্ময় চমকাইয়া উঠিল। তার হাতের ধাক্কায় টেবিলের উপর হইতে কাঁচের গ্লাশটা ছিটকাইয়া ফ্লোরের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে লীলা দ্রুতপদে এঘরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কহিল, কি হলো তোমাদের—

মৃন্ময় অপ্রস্তুত হইলেও তার চেয়েও লজ্জা পাইল নান্কু। তার সামান্য আহ্বানে যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

মৃন্ময় অল্পেই সামলাইয়া লইয়া বলিল, আমারই হাতের ধাক্কায় আপনার গ্লাশটা গেল লীলা দেবী।

লীলা স্মিত হাস্যে কহিল, গ্লাশটার পরমায়ু শেষ হ'য়েছে তাই গেছে, কিন্তু আপনার হাতে লাগে নি ত?

মৃন্ময় একটুখানি হাসিয়া বলিল, ধন্যবাদ—আমার কিছুমাত্র লাগেনি।

লীলা চলিয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিজে এক গ্লাশ জল হাতে চাকর সহ ফিরিয়া আসিল।

জলের গ্লাশটি টেবিলের উপর রাখিয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাঙ্গা কাঁচের টুকরাগুলি পরিষ্কার করাইয়া লইল। তার পরে হাসিয়া বলিল, আবার যেন আমার আর একটা গ্লাশের পরমায়ু শেষ ক'রে দেবেন না মৃন্ময় বাবু।

নান্কু এতক্ষণ পরে কথা কহিল। সে পরিহাসের ভঙ্গীতে বলিল, চাল কলা

থেকো বামুনতো, তাই চেয়ার টেবিলে খেতে বসে তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারছে না···

লীলা ধমক দিল। বলিল, তোমার এই সস্তা রসিকতা আমার ভাল লাগে না নান্টু।···তুমি কি কোনদিনই একটু সিরিয়াস হ'তে শিখবে না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে মৃন্ময়ের পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া পুনরায় বলিল, আপনার বন্ধুর স্বভাবটাই এমনি। অকারণে মানুষকে অপ্রস্তুত ক'রেই ওর আনন্দ।

লীলা আর দাঁড়াইল না।

মৃন্ময় আশা করিয়াছিল যে লীলা চলিয়া গেলে হয়তো নান্টু তাহাকে কিছু বলিবে, কিন্তু তাহাকে শুধু খাওয়া সুরু করিতে বলিয়াই সে ক্ষান্ত রহিল। অগত্যা মৃন্ময়কেও মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইল।

উভয়ের খাওয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় পুনরায় লীলার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সহাস্যে বলিল, কিছু দরকার হ'লেই বলবেন মৃন্ময়বাবু।

একটু থামিয়া সে এবারে নান্টুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, তোমার চাল কলা খেকো বামুনের খেতে অসুবিধে হচ্ছে ব'লে ত মনে হ'চ্ছে না নান্টু—

নান্টু হাসিয়া জবাব দিল, সেটা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গগুনে সম্ভব হ'য়েছে লীলা—অসম্ভবকে সম্ভব ক'রতে তোমার যে জুড়ি নেই এ কথা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে—

লীলা অকারনেই একটু লজ্জা পাইল। কিন্তু এই লজ্জার সঙ্গে অনেকখানি অনুরাগ আর পরিতৃপ্তি প্রকট হইয়া উঠিল।

নান্টু একবার আড় চোখে লীলাকে দেখিয়া লইয়া পুনরায় বলিল, আর বোধ হয় জবাব দিতে পারলে না? দেবে কি ক'রে বলো—আত্ম প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে।

লীলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি এখানে থাকলে বোধ হয় তোমাদের খেতে অসুবিধা হয় নান্টু? তাই চলে যেতে ব'লছো?

মৃন্ময় এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল সহসা সে মুখ তুলিয়া কহিল, অসুবিধে আমাদের চেয়ে আপনাদের হচ্ছে এই কথাটাই বোধ হয় নান্টুদা বলতে চাইছে। বলিয়াই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নান্টুর মুখের পানে চাহিল।

নান্টু একটা জবাব দিবার জন্যই মুখ তুলিয়াছিল—লীলা তাহাকে থামাইয়া দিয়া মৃন্ময়কে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনার বন্ধুর কথা আর বলবেন না মৃন্ময়-

বাবু। নাঙ্কু কখনও ভেবে চিন্তে কোন কাজ করতে জানে নাকি ? না কোন দিন সে করেছে ? যে লোক নিজের বিষয় ভাবতে জানে না সে আবার ভাববে অপরের কথা ! তবেই হয়েছে।

লীলার এতবড় অনুযোগও নাঙ্কুকে লজ্জা দিতে পারিল না, সে হাসি মুখেই পুনরায় বলিল, বুঝলি মিনু তোর নাঙ্কুদার তো কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই, কিন্তু যিনি এতক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলেন তাঁর আক্কেলটাই একবার ছাথ—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ার তদারক করতে গেলে যে ওঁদের নিজেদের খেতে তিনটে বেজে যাবে সে হুঁশ নেই—

একটু থামিয়া সে পুনরায় বলিল, অথচ আমাদের চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে। তা ছাড়া লিলিও নিশ্চয় এখনও অভুক্ত আছে—

লীলা লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, সত্যিই কথাটা আমার স্মরণ ছিল না।

লীলা দ্রুত প্রস্থান করিল।

এই মাত্র চারিটা বাজিল। লীলা ও লিলি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

নাঙ্কু বলিল, এ কি এখনও তৈরি হতে পার নি মিনু। আমি যে কখন তোমায় বলে গেলাম।

মৃন্ময় যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে এমনি ভাবে চমকাইয়া সোজা হইয়া বসিল। সে জামাটা গায়ে দিয়া বলিল, আমি তৈরি নাঙ্কুদা। চলো।

মৃন্ময় উঠিয়া দাঁড়াইল।

মৃন্ময়ের আজিকার চালচলন, তার কথাবার্ত্তা নাঙ্কুর কাছে কেমন যেন রহস্যময় মনে হইতেছে। কিছুতেই যেন প্রাণের সাড়া নাই। এমনটি সে আশা করে নাই। তার মনে হইল যে, মৃন্ময়ের মনের কোথাও যেন এমন একটা সঙ্কোচের সৃষ্টি হইয়াছে যাহার প্রভাব সে সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু এমন হইলে তো চলিবে না। নাঙ্কু ইহাতে প্রাণপণে বাধা দিবে। একবার যে ভুল সে করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটে সেজন্য অত্যন্ত সাবধানে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

লিলি সম্বন্ধেও তার মনে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া

আসিতেছিল। তার সংশয় সম্পূর্ণ রূপে দূর না হইলেও অন্ততঃ লিলির দ্বারা যে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না একথা সে জানিতে পারিয়াছে।

লীলা তাহাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলে লিলি জবাব দিয়াছিল, একটা পাখী পুষলেও তার উপর ভালবাসা জন্মায়। এটা মানুষের স্বভাবধর্ম্ম। আজ ছ' বছর ধরে যে লোকটিকে সে আগলে আছে তার প্রতি একটুও মমতা থাকবে না এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে। তা ছাড়া মৃন্ময়ের জীবনের এই বিপর্য্যয় যে তাকেই কেন্দ্র করে, এ কথা ভোলা কি এতই সহজ!

লীলা হাসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, এটা কি নেহাত কৃতজ্ঞতার কথা হ'ল না?

লিলি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, কৃতজ্ঞতা তো বটেই। আর এই কৃতজ্ঞতা যে তাকে অন্ততঃ নূতন করে দুঃখ দেবে না এ বিশ্বাস আপনারা অনায়াসে করতে পারেন, এবং সেইজন্যেই মিনুদার সঙ্গে আমার এত দূরে ছুটে আসার প্রয়োজন হয়েছে।

ইহার পরে আর বলিবার কিছু থাকিতে পারে না। তথাপি লীলা প্রশ্ন করিল, তবুও দেখুন মৃন্ময়ের আচরণে নাঙ্কু নাকি ঝড়ের আভাস পাচ্ছে। সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

ইহার উত্তরও লিলি হাসিয়াই দিয়াছিল, নাঙ্কুবাবুর ভুলও হতে পারে। আপনারা অনর্থক ভাববেন না, মিনুদাকে আমিও খানিকটা জানি। কোন অন্যায় কাজ তিনি করবেন না—করতে পারেন না। আর ঝড় যদি সত্যিই দেখা দেয় তা হলেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ সে ঝড়ে লিলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও মৃন্ময় সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকবে। তার গায় এতটুকু আঁচড় লাগতে আমি দেব না।

কথা কয়টি লিলি হাসিতে হাসিতে বলিলেও লীলা নাকি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল। নাঙ্কুকে আড়ালে ডাকিয়া লীলা তাহাকে বলিল, ছিঃ ছিঃ নাঙ্কু ভুল করে এ তুমি আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে!

নাঙ্কু বলিয়াছিল, ভুল তো আমি করি নি লীলা। বরং আমার ধারণা যে অভ্রান্ত তারই প্রমাণ আমি পেলাম। আর আমার কোনো সংশয় নেই। এবার আমি পরম নিশ্চিন্তে পাড়ি দিতে পারব।

লীলা বলিয়াছিল, লিলি যে একতিল মিথ্যে বলে নি এ কথা আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি।

নাঙ্কু বলিয়াছিল, হলপ করবার প্রয়োজন নেই লীলা। লিলিও যেমন তোমায় মিথ্যে বলে নি, আমিও তেমনি ভুল করি নি। তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মৃন্ময় লিলির মনের এই গভীর ভালোবাসার কথা শুধু যে আভাসেই টের পেয়েছে তা নয়, তার প্রতি দিনের প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে এবং আজ যখন তার পুরনো অবস্থার মধ্যে ফিরে আসবার পথ উন্মুক্ত হয়েছে তখনই সে চমকে উঠেছে। নিজেকে যাচাই করে দেখতে গিয়ে সে তার দ্বিধাবিভক্ত মনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে না। দু'দিক থেকেই তাকে টানছে। কিন্তু এই দোটানার মধ্যে দোদুল্যমান থাকতে তাকে দেবে না বলেই হয়তো লিলি তার সঙ্গে এসেছে।

লীলা বলিয়াছিল, তা বলে তুমি কেন এ নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ নাঙ্কু?

ব্যস্ত যে সে কেন হইয়াছে, মঞ্জুষার দুঃখ যে তার কতখানি বাজিতেছে, তার সুখে যে সে কতখানি তৃপ্ত হইবে এসব লীলা জানে না তাই এই প্রশ্ন করিয়াছে। নাঙ্কুও সহজ ভাবেই উত্তর দিল, ঘটনাচক্র একদিন ওর ভাগ্যের সঙ্গে আমার জীবনকেও জড়িয়ে দিয়েছিল সেকথা তো তোমায় আমি বলেছি লীলা, সুতরাং দায় ঘাড়ে না নিলেও দায়িত্বটা একেবারে অস্বীকার করি কেমন করে!

লীলা বলিয়াছিল, সে তো নিতান্তই একটা অবাঞ্ছিত আকস্মিক ঘটনা নাঙ্কু।

নাঙ্কু জবাব দিয়াছিল, তা হলেও সেটা একটা বিশেষ ঘটনা লীলা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মঞ্জুষার একটা পাকা ব্যবস্থা করে দিতে পারি, ততক্ষণ ইচ্ছে করলেই তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। একটা নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়।

ইহার উত্তর লীলা বেশ গম্ভীরভাবেই দিয়াছে, তোমাকে যতটা অবুঝ এতদিন ভেবেছি দেখছি তুমি তা নও। কেজো বুদ্ধিও তোমার বেশ আছে।

নাঙ্কু ইহার কোন জবাব দেয় নাই।...

গাড়ীর দ্রুত গতির সহিত পাল্লা দিয়া ঘটনাগুলি একের পর এক নাঙ্কুর স্মৃতিপথে আনাগোনা করিতেছিল। গাড়ী আসিয়া মঞ্জুষাদের বাড়ীর সম্মুখে

দাঁড়াইতেই তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সে ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। একে একে আর সকলেও নামিল।

রাধু বোষ্টম সম্ভবতঃ কাছাকাছি কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে দ্রুত বাহির হইয়া আসিল এবং উহাদের সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হইল। রাধু কিন্তু তাহাদিগকে সরাসরি রোগীর ঘরে লইয়া আসিল না। বসিবার ঘরে আনিয়া বলিল, তোমাদের এখানে একটু বসতে হবে। ডাক্তার বলে গেছেন রোগী যেন কোন কারণে উত্তেজিত না হয়ে ওঠে।

নাঙ্কু বলিল, মঞ্জুর ঘরে কে আছেন? তার বাবা?

রাধু বলিল, আজ্ঞে না—নার্স। বড়বাবু এখন ঘুমুচ্ছেন।...

নাঙ্কু প্রশ্ন করিল, ঘুমুচ্ছেন?

রাধু বলিল, হ্যাঁ ঘুমুচ্ছেন। গত কয়েক রাত ধরেই তার চোখে ঘুম ছিল না। ডাক্তার ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেছেন।

নাঙ্কু আর কোন প্রশ্ন করিল না।

রাধু বলিতে লাগিল, বড় গোলমাল করছিলেন। ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা একে বলে না।··

লিলি বলিল, তার মানে দু' ঘরে দুটি রোগী?

লিলির কথায় সায় দিয়া রাধু বলিল, ঠিক তাই দিদি।

লীলা বলিল, মঞ্জুকে দেখে আসতে পারা যায় না রাধু?

রাধু বলিল, আপনারা বুঝি এখনি চলে যাবেন?

লীলা মৃদু কণ্ঠে বলিল, বসে থেকে তোমার তো কোন কাজে লাগতে পারব না বোষ্টম ঠাকুর।

রাধু বলিল, তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু কথাটা কি জানেন···আপনারা কাছে থাকলেও অনেকটা ভরসা পাই।

লিলি এতক্ষণে কথা কহিল, এত লোকের ত কোন দরকার নেই বোষ্টমদা। ওঁরা যাবেন বৈকি। আমি রইলাম, তোমার মিনুদাদা থাকবেন—আর কত লোকের দরকার?

রাধু বোষ্টম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তার দুই চোখ চকচক করিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে সে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, তুমি আমায় বাঁচালে দিদি। মনে হচ্ছে আজ ক'দিন পরে একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

লীলা বলিল, একটু আগেই যে বললে মঞ্জুর জন্যে নার্স রয়েছে—

রাধু বলিল, তা আছে বৈকি, কিন্তু ওরা হ'ল মাইনে করা লোক, ওদের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, মন খুঁত খুঁত করে···এই বুঝি অযত্ন হ'ল—

লীলা বলিল, সে যাই হোক্, তুমি বোষ্টমঠাকুর বরং একবার নার্সের কাছ থেকে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি নিয়ে এসো।

রাধু প্রস্থান করিতেই লীলা নাঙ্কুকে বলিল, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি?

নাঙ্কু অসম্মতি জানাইল, বলিল, না আমি আর যেতে চাই নে। তোমার সঙ্গে বরং লিলি যাক।

রাধু ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। নাঙ্কুর কথায় সেও সায় দিল, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লঘুপদে অগ্রসর হইয়া চলিল।

উহারা দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই নাঙ্কু মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, মিনু—

মৃন্ময় সাড়া দিল, কিছু বলবে নাঙ্কুদা?

নাঙ্কু তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, ভাবপ্রবণতা তোকে ছাড়তে হবে মিনু। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব কিছু দেখবার চেষ্টা করিস। নইলে ভবিষ্যতে হয়তো নিজের কাছেও কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবি নে ভাই।

মৃন্ময়ের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে জবাব দিল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে দেখতে গিয়েই তো নূতন সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে নাঙ্কুদা। নইলে তোমার কথায় সেদিন আমি রাজী হতে পারি নি কেন? আজকেই বা পথ আমার সমস্যাসঙ্কুল হয়ে রয়েছে কিসের জন্য?

নাঙ্কু বলিল, অবশ্য সকলে একই চোখে সব জিনিষ দেখে না। আমার কাছে যেটা ভাবপ্রবণতা তোমার কাছে হয়তো সেইটেই বাস্তব সত্য, কিন্তু কথাটা তা নয়—ও নিয়ে তর্ক করেও কোন মীমাংসা হবে না। কিন্তু এত দিনের এত শ্রম, এত সাধনার পর ফুলের যে কুঁড়িটি বের হয়েছে, দোহাই মিনু, তাকে ফুটে উঠবার সুযোগ তুই দিস। নির্ম্মমভাবে তাকে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে ফেলিস নে।

মৃন্ময় প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, ব্যবস্থাটা অবস্থার উপর নির্ভর করে নাঙ্কুদা। কিন্তু আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না তুমি কেন এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ। আমিও একটা মানুষ। স্নেহ-ভালবাসা আমার মধ্যেও আছে, কিন্তু তাকে আপনার বেগে এগিয়ে যেতে দেওয়াই আমার মতে সমীচীন। জোর

করে তাকে থামিয়ে দেওয়াও যেমন চলে না, ঠেলেঠুলে এগিয়ে দেওয়াও তেমনি সঙ্গত নয়। আমাকে নিজের মত করেই তোমরা চলতে দাও। অযথা আমায় বিব্রত করে তুলো না—এ আমার একান্ত অনুরোধ।

ইহার পর আর বলিবার কি থাকিতে পারে। তথাপি নান্টু নীরব থাকিতে পারিল না। সে বেদনাভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল, অকারণে কেউ দুঃখ পাক এ আমি সইতে পারি নে মিনু। যুক্তিতর্কের চেয়ে অন্তরের সত্যটাই আমার কাছে বড়, নইলে যা হবার সে তো হবেই তবু এ ব্যাকুলতা কিসের জন্য! কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়। এতে নিজেও আমি দুঃখ পাই, তোকেও হয়তো অকারণে উত্তেজিত করে তুলি।...

একটু থামিয়া সে পুনশ্চ বলিল, সম্ভবতঃ কালই আমি কলকাতা থেকে চলে যাব। বোধ হয় কিছুদিন ওয়ালটেয়ারে থাকব। অবশ্য এ ইচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত আমার টিকবে কিনা তা জানি না। আমাকে ত তুই জানিস মিনু। কোনদিনই ভেবে চিন্তে হিসেব ক'রে চলতে শিখলাম না।

মৃন্ময় বলল, কালই চলে যাবে?

নান্টু বলিল, এখানে থেকে ত কারুর কোন কাজেই আসতে পারব না মিনু। যাবার আগে আর হয়তো দেখা হবে না, তাই আমার যা-কিছু বলবার তা এখুনি শেষ করে ফেলি।...

একটু থামিয়া সে পুনরায় সুরু করিল, তুমি মানুষ, তোমার প্রাণ আছে এবং তা আর দশ জনার চেয়ে অনেক বড় এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন তোমাকে অনুরোধ করতে ভরসা পেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল আজ শিথিল হয়েছে। তার জন্যে কোন দিনই অন্তরের সঙ্গে তোমায় অনুযোগ দিতে পারি নি বরং নিজেকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করেছি। জীবনের এত জটিল সমস্যার সমাধান কেউ কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে করতে পারে না এ কথাটা আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আগাগোড়াই আমি দুনিয়াটাকে নিজের মত করে ভাবতে গিয়ে ভুল করেছি। তাই ব'লে আমার সদিচ্ছাকে তুমি ভুল বুঝ না ভাই।

কিন্তু থাক সে-সব কথা। আজ আর নূতন করে তোমায় অনুরোধ করতে যাব না এবং ভবিষ্যতে তোমাদের চোখের সামনেও আমায় আর পাবে না। কারণ তাতে করে শুধু নিজের দুঃখটাই বড় হয়ে ওঠে।

মৃন্ময় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তুমি যদি অকারণে দুঃখ পাও নান্টুদা তা

হলে আমি নাচার···

নান্টু সহসা সোজা হইয়া বসিল। মৃন্ময়ের মুখের পানে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা কেউ বুঝবে না। বোঝাতে আমি চাইও না, কিন্তু তোর এই উক্তির সঙ্গে আচরণের যদি সত্যিই সামঞ্জস্য দেখা যায় তা হলে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ হবে না। আমার এ কথাটা তুই বিশ্বাস করিস মিনু। কিন্তু আর নয়, ঐ যে লীলা ওরা ফিরে এসেছে। নান্টু উঠিয়া দাঁড়াইল। লিলির সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইতে বড় করুণ এবং মধুরভাবে একটু হাসিয়া বলিল, চলি বোন—

নান্টু আর অপেক্ষা করিল না, লীলাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল। লিলি নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া যাইতেই মৃন্ময়কে প্রশ্ন করিল, নান্টুবাবু এমন করে চলে গেলেন কেন মিনুদা?

মৃন্ময় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, জানি না।

লিলি আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিল না বটে, কিন্তু ঘণ্টাকয়েক পূর্ব্বেকার লালার কয়েকটি অপ্রীতিকর প্রশ্ন, এখন নান্টুর এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে চলিয়া যাওয়া এবং মৃন্ময়ের এই ছাড়া ছাড়া উত্তর, সর্বকিছুতে মিলিয়া তার মনে একটা সংশয়ের সৃষ্টি হইল। অবশ্য তার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানিলেন, বাহিরে কিছুই প্রকাশ পাইল না, কিন্তু সে আরও সজাগ হইয়া উঠিল।

লিলি ধীরে ধীরে আসিয়া মৃন্ময়ের পাশের চেয়ারে বসিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাধু বোষ্টম ঘরে প্রবেশ করিল।

নান্টু চলিয়া গেল। আর এক দিনও এমনি করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। একে একে কত কথাই মৃন্ময়ের মনে পড়িতেছে। সেদিন সে মনে একটা মস্ত বড় বিশ্বাস লইয়া গিয়াছিল আর আজ গেল ঠিক তার বিপরীত ভাব লইয়া। বাহ্যতঃ সে তাহাকে কোন অনুরোধ করিল না বটে, কিন্তু তার অন্তরের কাছে যেন সে ঐকান্তিক আবেদন জানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু কেন, কিসের জন্য নান্টু আজ এমন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে?

মৃন্ময় কারণ অনুসন্ধান করিতে বসিয়া ব্যথিত হইয়া উঠে।

মৃন্ময় মঞ্জুষার শিয়রের কাছে বসিয়া আছে। ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে। নার্স কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ঘণ্টাখানেকের জন্য বিদায় লইয়া গিয়াছে। মঞ্জুষা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছে। মৃন্ময়ের উপস্থিতির কথা সে এখনও জানিতে পারে নাই।

মঞ্জুষার বাবা পাশের ঘরে ঘুমাইতেছেন। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন যে, কাল পর্য্যন্ত এমনি গভীর নিদ্রা তাঁহার হইবে। দুশ্চিন্তা এবং অনিদ্রার জন্যই তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। পরিপূর্ণ বিশ্রামে ঠিক হইয়া যাইবে।

লিলি ইতিমধ্যে একবার মাত্র এ ঘরে আসিয়াছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তের বেশী দেরী করে নাই। নান্কুর চলিয়া যাওয়ার ধরনটা তাহাকে কেমন ভাবাইয়া তুলিয়াছে। ভিতরে ভিতরে একটা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার কেমন সন্দেহ হইয়াছে। মৃন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশ্য কোন উত্তর পায় নাই। মৃন্ময়ের মনের সঠিক খবর সে রাখে না। রাখিবার প্রয়োজনও তার ফুরাইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য সে খানিকটা চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আবার নূতন করিয়া জটিলতার সৃষ্টি না হয় এই ভয়ে সে সঙ্কুচিত হইয়া আছে।

মঞ্জুষার অসুখ সারিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, জীবানন্দও মনে হয়, অচিরেই ভাল হইয়া উঠিবেন। মৃন্ময়ের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল—সে আসিয়াছে। যাহার প্রয়োজন নাই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া নান্কুবাবু চলিয়া গেলেন কেন? এই রহস্যোদ্ঘাটন লিলিকে করিতেই হইবে। পুনরায় নিঃশব্দে সে আসিয়া মঞ্জুষার ঘরে প্রবেশ করিল। মৃন্ময় একাগ্র দৃষ্টিতে মঞ্জুষার রোগ-পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া আছে। লিলির আগমন সে টের পাইল না। মন তখন তার নানা চিন্তায় মগ্ন। মঞ্জুষার পানে চাহিয়া চাহিয়া বিগত দিনের কত কথাই না আজ তাহার মনে পড়িতেছে। আশপাশের সবকিছুই যেন একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। অতীতের নানা বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।··· পদ্মার ঢেউ প্রচণ্ড বেগে তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে—ঢেউয়ের তালে তালে কত নৌকা পাল তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পদ্মাতীরের বুড়া বটগাছতলায় দুই আত্মহারা তরুণ-তরুণী কলগুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আশেপাশে কোথাও বৌ কথা কও পাখীটাও কি সময় বুঝিয়া ডাকিয়া উঠিল।

লিলি একটু নড়িয়া চড়িয়া তার উপস্থিতির আভাস দিল। মৃন্ময় যেন ঈষৎ

চমকাইয়া উঠিয়াছে। আর একবার ভাল করিয়া সে মঞ্জুষার মুখের পানে চাহিল। ঐ লিলি আর এই মঞ্জু। লিলির কাছেও যে তার অনেক দেনা। মুখ ফুটিয়া কোন দিন কিছু চাহে নাই, হয়তো জীবনে কোন দিন চাহিবেও না। নিঃশব্দে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সে শুধু অঞ্জলি ভরিয়া দিয়াই গিয়াছে। আজ হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া তাই তো মৃন্ময় এমন করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। পুঁজি তার যৎসামান্য। কিন্তু লিলি চাহে নাই বলিয়াই সে নিতান্ত স্বার্থপরের মত আর এক জনের জন্য সব সরাইয়া ফেলিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে।

মৃন্ময় লিলির মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু তার মুখ দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। লিলি মৃন্ময়কে ইশারায় ডাকিয়া লঘুপদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মৃন্ময় তাহার অনুসরণ করিল।

কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া মৃদুকণ্ঠে লিলি বলিল, নান্টুদা অমন করে চলে গেলেন কেন, একথা তুমি জান এবং এর কারণটা আমাকেও জানাতেই হবে মিনুদা।

মৃন্ময় বলিল, যদি বলি আমি জানি না।

লিলি বলিল, তা হলে বুঝব তুমি আমায় মিথ্যে বলছ। সত্য কথা বলবার মত সাহসটুকুও তুমি হারিয়ে ফেলেছ।

মৃন্ময় শান্তকণ্ঠে বলিল, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। কিন্তু তোমায় আমি মিথ্যে বলি নি। তবে আমার অনুমানের কথা যদি জানতে চাও সে আলাদা বিষয়।

মৃন্ময় থামিল।

লিলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে পুনরায় বলিতে লাগিল, যে কোন কারণেই হোক নান্টুদা আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

লিলি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, আমাকে কিছু লুকিও না। তাঁর এই আস্থা হারানোর কি সত্যিই কোন কারণ ঘটেছে? তুমি কি তাঁকে এমন কোন কথা বলেছ যার জন্যে তিনি আর তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

মৃন্ময় একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, তোমার এ কথার উত্তর নান্টুই ঠিক দিতে পারত। তবে আমার মনে হয় আমাদের দু'জনকে কেন্দ্র করেই সন্দেহটা তার মনে জেগেছে। সব কথা সব সময় বলে দেবার দরকার হয় না

লিলি।

লিলি কিছুক্ষণ নত মস্তকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন সেখানে যেন রক্তের লেশমাত্র নাই। মৃন্ময়ের সেদিকে হুঁশ নাই। সে অন্যমনস্ক ভাবে উপরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। লিলির কণ্ঠস্বরে সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

লিলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল, আমি ভাবছিলাম, তাঁর মনে এ সন্দেহ পোষণ করবার সুযোগ করে দিলে কে মিনুদা? নিশ্চয়ই তুমি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি এমনি করে অপমান আমায় না করলেই কি তোমার চলত না? তা ছাড়া কতটুকু তুমি জান আমার—এত সাধারণ তুমি কেমন করে হতে পারলে মিনুদা? ছি ছি ··

এ ধিক্কার মৃন্ময় নীরবেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল। লিলির অনুমান একেবারে মিথ্যা নয়। ইতিপূর্ব্বে সে লিলির সম্বন্ধে বহু কথাই নান্টুকে চিঠিতে জানাইয়াছে।

লিলি পুনরায় বলিতে লাগিল, অত্যন্ত ভুল করেছ তুমি মিনুদা। লিলির আর যত দোষই থাক জেনে শুনে কোন দিনই তোমায়···কথাটা লিলি শেষ না করিয়াই অন্য প্রসঙ্গে আসিল। বলিল, শেষ পর্য্যন্ত তুমিও আমার মর্য্যাদাকে একেবারে হাটের মধ্যে এনে দাঁড় করালে। আমার জীবনের শেষ সম্বলটুকুও তুমি কেড়ে নিলে মিনুদা! এ যে আমার কাছে কতখানি মর্ম্মান্তিক সে তুমি বুঝবে না—

মৃন্ময় আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বলিল, কিন্তু এত কথা ত আমি কোন দিনই ভাবি নি লিলি। এ সব নিয়ে থামোকা তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন?

লিলি যেন জ্বলিয়া উঠিল, তুমি বলতে চাইছ কি? মানুষের চামড়া নেই আমার দেহে, না মানসম্ভ্রম বলেও কোন বস্তু আমার নেই? আজ নান্টুদা মনগড়া একটা কথা ভাববে, কাল লীলা এগিয়ে এসে দশটা প্রশ্ন করবে, পরশু মঞ্জুষা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। এ সব তোমার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমার সইবে না। আর কেনই বা আমি তোমাদের এই সব ভালমন্দর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাব। কি ভেবেছ তুমি বল তো মিনুদা? এমনি করে লিলির দুঃখ লাঘব করবে? এ যদি ভেবে থাক তা হলে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল তুমি জীবনে আর করো নি। কিন্তু লিলির মিনুদা যে এর চেয়ে ঢের ঢের বড়। সে আদর্শ পুরুষ। একনিষ্ঠ প্রেমিক।

লিলির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল এবং তাহাই গোপন করিতে সে দ্রুত প্রস্থান করিল। মৃন্ময় ব্যথিত দৃষ্টিতে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তারপর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় মঞ্জুষার ঘরে আসিয়া তার পরিত্যক্ত আসনে স্থির হইয়া বসিল।

যাহার যাহা মনে আসিতেছে, যাহা প্রাণে চাহিতেছে, বলিয়া চলিয়াছে, মৃন্ময় জোর করিয়া একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না। আশ্চর্য্য। মৃন্ময়ের আজ কি হইয়াছে! এ কথাটাও সে বলিতে পারিল না যে, লিলিকে কেহ তো তাহার ভালমন্দর মধ্যে মাথা গলাইতে বলে নাই—কিসের জন্য সে তাহার সঙ্গে আসিয়াছে, আর কেনই বা এত কথা শুনাইতেছে।...

একটা অস্ফুট আহ্বান মৃন্ময়ের কানে আসিল। তাহার সমস্ত সত্তা উন্মুখ হইয়া উঠিল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের হৃৎস্পন্দন-শব্দ মৃন্ময় যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে।

মঞ্জুষা জাগিয়াছে—তার আচ্ছন্নভাব কাটিয়াছে।

মঞ্জুষার ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান পুনরায় তার কাণে আসিল, বোষ্টমদা—এবারে আর পূর্ব্বের ন্যায় ততটা অস্পষ্ট নয়। মঞ্জুষার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। এক একটি মুহূর্ত্তের ব্যবধানে তাদের অতীত জীবনের এক একটি অধ্যায় মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।...বালিকা মঞ্জুষা একটা খরগোশের কান ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে, কৈশোরে মঞ্জুষা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাহার জন্য জলপদ্ম তুলিতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, যৌবনে মঞ্জুষা তার প্রতিটি দিবসকে স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া তুলিতে সুরু করিয়াছে... এমনি সময় অকস্মাৎ দেখা দিল প্রচণ্ড ঝড়। তার উন্মত্ত দাপটে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোথায় গেল মঞ্জুষা আর কোথায় রহিল সে।...

ঝড় আজ থামিয়া গিয়াছে। তাদের জীবনের গোটাকয়েক অধ্যায়কে একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। আগামী বসন্তের উপরেও আজ আর ভরসা নাই।

ঘরের ম্লান নীল আলো তেমনি ভাবে জ্বলিতেছে। একটা স্নিগ্ধ কমনীয়তা সর্ব্বত্র বিরাজমান। কোথাও আর ঝড়ের চিহ্নমাত্র নাই। শুধু তারই ঝাপটায় বিপর্য্যস্ত দুইটি মানুষকে দেখা যাইতেছে। যাহারা আজও তাহাদের হারানো দিনগুলিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না। এত ভাঙ্গিয়াছে, এত আবর্জ্জনা জড়ো হইয়াছে যে, মুক্ত আনন্দে সহজ গতিতে আর

কিছুতেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতেছে না। যদিও চেষ্টার তাদের বিরাম নাই।

মৃন্ময়ের চোখের সম্মুখ হইতে তার বর্ত্তমান একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। অতীতের মৃন্ময় যেন আজ দীর্ঘদিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ে তার স্নেহপ্রীতির বন্যা নামিয়াছে, চোখে-মুখে তারই আভাস। অন্তরের সবটুকু মাধুর্য্য প্রকাশ পাইল তার কণ্ঠে। মৃন্ময় মঞ্জুষার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মৃদু আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিল, মঞ্জু—

মঞ্জুষা অস্বাভাবিকভাবে চমকাইয়া উঠিল। একবার চোখ মেলিয়া বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের মুখের পানে চাহিয়াই পুনরায় ধীরে ধীরে তাহা বন্ধ করিল।…ঠোঁট দুটি তার থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে রাধুর আহ্বানে মৃন্ময় অলসভাবে চোখ মেলিয়া চাহিল। অধিক রাত পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া শেষ রাত্রের দিকে মৃন্ময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া সে সোজা উঠিয়া বসিল এবং সর্ব্বপ্রথমেই মঞ্জুষার কথা জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে মঞ্জু ভাল ছিল তো বোষ্টমদা?

তার এই ব্যাকুলতায় রাধু মনে মনে খুশী হইল। সে হাসি মুখে কহিল, ঠিক বলতে পারছি না দাদাঠাকুর। তবে মনে হচ্ছে ভালই ছিল নইলে বোষ্টমী আমাকে ঘুমোতে দিত না। বলিয়া রাধু মৃন্ময়ের হাতে একখানি চিঠি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আর কোন প্রশ্ন করিবার অবকাশও সে দিল না।

চিঠিখানি লিখিয়াছে নাস্কু।…

মৃন্ময়—

আবার আমার যাত্রা সুরু হ'লো। জীবনের যে দিকটাকে এতদিন অবজ্ঞা ক'রে লক্ষ্যহারার মত এগিয়ে চলেছিলাম, আজ মনে হচ্ছে তা শুধু আমাকে পিছন দিকেই ঠেলে নিয়ে গেছে। এগোতে পারিনি এক ইঞ্চিও।

এবারে আর পিছন ফিরে তাকাব না। হাতের মুঠোয় যা এসে গেছে তাকেই মূলধন করে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবো।

আজ মনে হচ্ছে মানুষের পক্ষে একলা পথ চলবার যে নেশা ওটা নিছক নেশাই। ঘোর কেটে গেলে উত্তেজনার পরিবর্ত্তে একটা অপরিসীম অবসাদ এসে সমস্ত দেহ আর মনকে পঙ্গু করে ফেলে। তখনই আকুল হয়ে একটা

নির্ভরযোগ্য অবলম্বন চায়।

আমার এই কথাগুলো আমার নিজেরই কানে বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু মন বলছে যে, প্রথম যৌবনের উন্মাদ উত্তেজনা কেটে গেলে প্রায় সব মানুষই এই পথে চিন্তা করে। কিন্তু যাক এসব কথা—

আমার চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছুবে আমরা তখন অন্তত শ'খানেক মাইল দূরে চলে গেছি। আমায় অনুযোগ দিও না। অনেক চেষ্টা করেও থাকা আর সম্ভব হ'ল না। এর কারণ, তোমাকে আজ আর দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করতে পারছি না। শুধু তাই নয়—আমার নিজের উপরও আর আস্থা নেই। মন আমার দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আমার মনের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছে। ভয় হচ্ছিল পাছে একেবারে হারিয়ে যাই, কিন্তু আজ আর তার জন্যে আমার খেদ নেই। হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমি আমার বাঁচার মন্ত্র আবিষ্কার করেছি।

জানি না ভুল করলাম কিনা—আর যদি করেই থাকি তার জন্যেও কোন দিন আমি দুঃখ করব না।

অনেক কথা তোমাকে আমার বলবার ছিল, কিন্তু তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোন কথাই গুছিয়ে বলতে পারি নি, পাছে তোমায় আঘাত করে বসি এই ভয়ে। এখন মনে হচ্ছে সত্যি হোক, মিথ্যে হোক যে কথা আমার মনে জেগেছে তা প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ।

মনে হচ্ছে, যে মিথ্যা অপপ্রচার এক দিন তোমার জীবনের স্বচ্ছন্দ গতিপথে বাধার সৃষ্টি করেছিল সেই মিথ্যাটাই সত্যের ছায়ারূপ ধরে তোমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এ বাধা অপসারণের প্রয়োজন আছে মিনু। নইলে সেদিনের সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মিথ্যাটাই যে তোর জীবনে সত্য হয়ে বেঁচে থাকবে ভাই।

লিলি আজ তোমার চলার পথে এক প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে—চলতে গিয়ে তাই বারে বারে হোঁচট খাচ্ছ। চতুর্দ্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। কিন্তু এই কুয়াশা যে ক্ষণস্থায়ী সে কথাটা একবার ভেবে দেখছ না কেন?

লিলির জন্যে তোমার মনে যে স্নেহ ও প্রীতি জমে উঠেছে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সব কথা আমি জানি না। জানা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়—তবুও বলছি যে, লিলিকে তোমার আরও ভাল করে জানা উচিত ছিল। তাহলে

অনুমান সত্যকে এমনি ভাবে আড়াল করতে পারত না।

তুমি মনে করো না মিনু, আমার আজকের বক্তব্যটা শুধু আমার নিজেরই মনগড়া ভাবনার ফল, তুমি নিজেই যে এ কথা বলবার সুযোগ করে দিয়েছ। চিঠিতে তুমি যে সকল উক্তি করেছিলে তাই আজ আমার কথায় প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এইটেই বড় কথা নয়—আসল কথাটা হচ্ছে লিলিকে তুমি ভুল বুঝেছ, এবং তা যে মুহূর্ত্তে সে উপলব্ধি করেছে তারপরে আর দেরি করে নি। আমার কাছে ছুটে এসেছে।

খোলা মনে স্বীকার করতে পেরে আমি আনন্দ পাচ্ছি এইজন্যে যে, ভুল করে লিলির উপর যে অবিচার করেছিলাম সেই ভুল আমার ভেঙে গেছে। লিলিও আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। লীলার কোন আপত্তি নেই। এই ভব-ঘুরের সঙ্গে লিলিও একটা আশ্রয় পেয়ে গেল।

কোথায় চলেছি তা এখনও জানি না। লীলা আর লিলির নির্দ্দেশ মতই আমার চলার পথ বেছে নিতে হবে। তবে ওয়ালটেয়ারে যে যাব না এ কথা ঠিক।

আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার মত ছন্নছাড়া লোকগুলোর যদি কোন-কিছুর ঠিক থাকে। তোমার নান্টুদার অপূর্ব্ব দায়িত্বজ্ঞান এক দিন লীলার সঙ্গে তার নিজের অদৃষ্টকে জড়িয়ে ফেলেছিল, সেইটেই লিলিকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থাও নির্ব্বিচারে করতে পেরেছে।

যদি পার আমাদের একেবারে মন থেকে মুছে ফেলো—নূতন করে মনে করিয়ে দেবার জন্যে আর কোন দিন তোমার চলার পথে দেখা দেব না। এত-দিন অনেক দুশ্চিন্তা করেছি। বুঝেও করেছি, না বুঝেও করেছি। আজ সকল বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে রেখে বিদায় নিলাম। বড় হাল্‌কা লাগছে। অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে চলেছি। আমার ডাইনে লিলি বাঁয়ে লীলা। এইতো জীবন···বিদায়। ইতি—

নান্টু

চিঠিখানি পড়া শেষ করিয়া মৃন্ময় স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। ব্যাপারটা সে ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। নান্টু চলিয়া যাইবে ইহা জানা কথা। কিন্তু লিলি কেন তাহার সঙ্গে অনির্দ্দেশ্য পথে পা বাড়াইল···

নাম্বু আর লিলি। দুটি নদীর দুটি ধারা। একই লক্ষ্যপথ ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এক দিন হয়তো তাদের আশা সফল হইবে…হয়তো হইবে না, কিন্তু সেকথা তাহারা ভাবিয়া দেখিতে চায় না, প্রয়োজন বোধও করে না—শুধু চলাটা তাদের অব্যাহত থাকে।…